বিষের ধোঁয়া

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচিপত্র

1..3
2..15
3..24
4..36
5..51
6..57
7..71
8..85
9..99
10..107
11..125
12..137
13..152

14..........164
15..........175
16..........191
17..........201
18..........211
19..........222
20..........234
21..........246
22..........258
23..........269

1

তীর্থনাথ ও কিশোরের মধ্যে সম্বন্ধটা ঠিক যে বন্ধুত্ব ছিল, তাহা বলা চলে না। তবে কলেজ-হস্টেলের একই ঘরে থাকিয়া এবং একসঙ্গে সর্বদা ওঠাবসা করিয়া দুইজন সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের মধ্যে যতদূর ঘনিষ্ঠতা হওয়া সম্ভব, তাহা হইয়াছিল।

তীর্থনাথ কিশোর অপেক্ষা বয়সে বছর চারেকের বড় ছিল। তাহার স্বভাবটা ছিল অত্যন্ত মৃদু নির্বিরোধ। কলেজে কয়েক ঘণ্টা ছাড়া সে কোথাও বাহির হইত না, নিজের ঘরটিতে শান্তভাবে বসিয়া বই পড়িত এবং চুরুট টানিত। কিশোরের চরিত্র ছিল ঠিক তাহার বিপরীত। সারা বছর পড়াশুনা করিত না, কিন্তু পরীক্ষা ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িলে ঘরে খিল দিয়া কয়েক দিন এমন পড়াই পড়িত যে বেশ ভাল করিয়া পাস করিয়া যাইত। অপর দিকে ফুটবল-হকি-ক্রিকেটের হুজুগে সে সর্বদাই মাতিয়া থাকিত, সভা-সমিতির হৈ-চৈ ব্যাপারেও সে ছিল একজন বড় পাণ্ডা। থিয়েটার জিনিসটা সে সহ্য করিতে পারিত না,সমস্ত রাত জাগিয়া বসিয়া থাকা তাহার পোষাইত না, কিন্তু বায়োস্কোপ দেখিয়া সে খেদ মিটাইয়া লইত।

দুজনের চেহারাও ভগবান বিপরীত করিয়া গড়িয়াছিলেন। তীর্থনাথ বেঁটে ও কৃশ, মস্ত বড় মাথাটি বহন করিয়া ঘাড়টি যেন অত্যন্ত শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, চোখে মোটা কাচের চশমা। আর কিশোর ছ ফুট লম্বা, দোহারা, অসাধারণ বলবান, গৌরবর্ণ এবং সুশ্রী,

কাচের চশমা পরিয়া তাহার চোখের সহজ তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিকে কোনদিনই তীক্ষ্ণতর করিবার প্রয়োজন হয় নাই। আবার অর্থের দিক দিয়াও তীর্থনাথের ছিল অদ্য ভক্ষ্য ধনুগুণ, বাপ-মা ভাই-বোন কেহই ছিল না, জলপানির টাকায়। কোনও মতে পড়ার খরচ চালাইত। কিশোরের ধনী বাপ জীবিত ছিলেন; কিশোরের মাতার মৃত্যুর পর প্রৌঢ়বয়সে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়া নতুন সংসার পাতিয়াছিলেন বটে এবং প্রথম পক্ষের একমাত্র সন্তানের প্রতি স্নেহের বন্ধন কিছু আলগা হইয়া পড়িয়াছিল তাহাতেও সন্দেহ নাই; কিন্তু কিশোরের প্রয়োজনমত টাকা পাঠাইতে তিনি কোনও দিন কৃপণতা করেন নাই। কলেজের ছুটি হইলে কিশোর বাক্স-বিছানা বাঁধিয়া বাড়ি যাইত, কিন্তু সেখানে ছোট বৈমাত্র ভাই-বোন ও প্রায়। সমবয়স্কা বিমাতার সংসর্গে তাহার মন টিকিত না। ছুটি ফুরাইবার পূর্বেই একটা ছুতা করিয়া সে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিত। তীর্থনাথের দেশ একটা ছিল বটে, কিন্তু বাড়ি বলিতে কিছুই ছিল না, কাজেই সে ছুটির সময়েও হস্টেলে পড়িয়া থাকিত।

সন্ধ্যার পর কিশোর যখন অন্যান্য বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে ফুটবল ম্যাচ কিংবা শরবাবুর আধুনিকতম উপন্যাস সম্বন্ধে সতেজ তর্ক করিত, তীর্থনাথ তখন নিজের কোণটিতে বসিয়া নিবিষ্ট মনে বই পড়িত। এবং খেলো সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘরের বাতাস ভারী করিয়া তুলিত। গল্প শেষ হইলে কিশোর তাহাকে বলিত, তীর্থদা, ধন্য বটে তুমি! আমাদের এত গল্প হয়ে গেল, একটা কথাও কি তোমার কানে গেল না? কখনও যদি তোমার নিমতলা প্রাপ্তি হয় তো সে ঐ পচা সিগারেট আর রাতদিন বই পড়ার গুণে! তীর্থনাথ মুখ তুলিয়া অন্যমনস্কভাবে একটু হাসিয়া আবার পাঠ্যপুস্তকে ডুবিয়া যাইত।

তারপর একদিন তীর্থনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সব পরীক্ষা শেষ করিয়া একটা স্কুলের মাস্টারি পাইয়া দেশে চলিয়া গেল। যাইবার সময় কিশোরকে নিজের ঠিকানা দিয়া বলিয়া গেল, মাঝে মাঝে চিঠিপত্র দিও। বিদায় দিবার সময় কিশোরের মনটা একটু খারাপ হইল বটে কিন্তু তাহা নিতান্তই। স্বাভাবিক। যাহার সহিত তিন বৎসর একই ঘরে কাটাইয়া দিয়াছে, তাহার বিদায়ের সময় মনটা যদি একটু বিষণ্ণও না হয়, তবে তাহাকে ঘোর পাষণ্ড বলিতে হইবে।

মাস ছয়েক পরে গোলাপী খামে একখানা চিঠি আসিল-তীর্থনাথের বিবাহ। ছাপাননা। নিমন্ত্রণপত্রের উল্টা পিঠে তীর্থনাথ নিজের হাতে লিখিয়া দিয়াছে, নিশ্চয় আসিতে হইবে, না। আসিলে চলিবে না। চিঠিখানা একটা বইয়ের মধ্যে রাখিয়া কিশোর ভাবিল, এই তো কাছেই যশোর, তীর্থদা যখন এত করিয়া লিখিয়াছে, তখন একদিনের জন্য যাইতে হইবে। কিন্তু বিবাহের দিনটা তাহার তন্দ্রাভিভূত স্মরণশক্তির উপর দিয়া এমনই লঘু পদে চলিয়া গেল যে, সপ্তাহকাল অতীত হইবার পূর্বে সে কথা আর মনে পড়িল না। যখন পড়িল, তখন সে অনুতপ্তভাবে মার্জনা চাহিয়া একখানা চিঠি লিখিয়া দিল।

ইহার পর আরও বছর তিনেক গত হইয়াছে। কিশোর সম্মানের সহিত এম. এসি পাস করিবার পর আমহার্স্ট স্ট্রীটে একখানা ছোট বাসা ভাড়া লইয়া বেকারভাবে বসিয়া ছিল। পয়সা রোজগারের কোন তাড়া ছিল না, অথচ কিছু না করিয়া বসিয়া থাকিতেও তাহার মন উঠিতেছিল না। অনেক দিন বাড়ি যাওয়া হয় নাই, সেখানেও একবার যাওয়া দরকার, কিন্তু ভিতর হইতে সেদিক পানে কোন তাগিদ ছিল না। একটা কিছু করিতে হইবে, এমনই মনোভাব লইয়া সে গড়িমসি করিতেছিল, এমন সময় হঠাৎ তীর্থনাথের

নিকট হইতে তার আসিল—শীঘ্র এসো, আমি মুমূর্ষ। কিশোর বিলম্ব করিল না, সেই দিন একটা ব্যাগে গোটাকয়েক জামা কাপড় পুরিয়া লইয়া যশোর যাত্রা করিল।

যশোর পৌঁছিয়া হাই স্কুলের মাস্টার তীর্থনাথের বাড়ি খুঁজিয়া লইতে বিলম্ব হইল না। ভাড়াটে বাড়ি, অতিশয় জীর্ণ, উপরে খোলার ছাদ, কিশোর কড়া নাড়িতেই একটি কুড়ি-একুশ বছর বয়সের মেয়ে আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। কিশোর তাহাকে দেখিয়া বুঝিল, তীর্থনাথের স্ত্রী। কিন্তু কী অপরূপ রূপসী এই রমণী! রুক্ষ চুল, ময়লা কাপড়, গহনা না থাকারই মধ্যে, রাত জাগিয়া চোখের কোণে কালি পড়িয়াছে, কিন্তু তাহার মধ্য দিয়াও রূপের জ্যোতি যেন বিচ্ছুরিত হইতেছে। কিশোর একবার চোখ তুলিয়াই সসম্ভ্রমে মাথা নীচু করিয়া ফেলিল।

তীর্থনাথের তখন যক্ষ্মার শেষ অবস্থা, কিশোরকে দেখিয়া তাহার অত্যন্ত নিষ্প্রভ চক্ষু দুটা যেন একটু সজীব হইল। তাহার হাতখানা নিজের কঙ্কালসার অঙ্গুলির মধ্যে টানিয়া লইয়া ক্ষীণস্বরে বলিল, এসেছ?

তীর্থনাথের অবস্থা দেখিয়া কিশোরের চোখে জল আসিয়া পড়িয়াছিল, সে তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া রুদ্ধস্বরে বলিল, শুধু পড়ে পড়ে আর সিগারেট খেয়ে জীবনটা নষ্ট করে ফেললে, তীর্থদা? ঘরের মেঝেয় তখনও এককোণে স্তূপে স্তূপে বই ও সিগারেটের টিন পড়িয়া ছিল।

তীর্থনাথের চর্মসার মুখে যেন একটু ব্যথার ভাব প্রকাশ পাইল; সে বলিল, বড় ভুল করেছি, ভাই। আগে বুঝতে পারিনি, কিন্তু এখন আর ফেরবার পথ নেই। হঠাৎ একদিন মুখ দিয়ে রক্ত উঠল-সাবধান হবার সময় তো দিলে না। কষ্ট আর কিছু নয়— চক্ষু দুটা মাথার শিয়রের দিকে তুলিয়া বলিল, ওর জন্যেই একটু ভাবনা হত। কিন্তু তুমি যখন এই শেষ সময় এসে পড়েছ, তখন আর ভাবনা নেই।

কিশোর বলিল, আর দুদিন আগে আমায় খবর দিলে না কেন, তীর্থদা?

তীর্থনাথ বলিল, তোমার পড়াশুনার সময়, পরীক্ষা সামনে, তাই আর কিছু জানাইনি। আর, জানালেও তো বাঁচাতে পারতে না, ভাই! বরং এই ভাল হল, যাবার সময় তোমায় দেখতে পেলুম।

কিশোরের মনের মধ্যে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা হইতে লাগিল, সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তীর্থনাথ বোধ করি তাহার মনের অবস্থা বুঝিয়া বলিল, ট্রেনে এসেছিস, মুখ হাত-পা ধুয়ে একটু কিছু মুখে দে, কিশোর। তারপর আমার কাছে এসে বসিস, দু-একটা কথা বলব। ওঠ, আর দেরি করিস নে।

দ্বিরুক্তি না করিয়া কিশোর তীর্থনাথের স্ত্রীর পশ্চাতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

আসন করিয়া জলখাবারের থালা কিশোরের সম্মুখে ধরিয়া দিয়া তীর্থনাথের স্ত্রী বিমলা অদূরে মেরে উপর বসিলে কিশোর জিজ্ঞাসা করিল, বাড়িতে আর কি কেউ নেই, বৌদি? আপনি একলাই—

সে মাথা নাড়িয়া বলিল, আত্মীয়-স্বজন তো কেউ নেই, তবে পাড়ার ছেলেরা বড় ভাল, সব সময়ে দেখাশুনা করে। আর, শহরের ডাক্তারবাবুরাও যথেষ্ট করেছেন, তাঁদের ঋণ শোধ দেবার নয়। কিন্তু হাজার হলেও তাঁরা সবাই পর তো, তাঁদের কাছে আর কত প্রত্যাশা করা যায়? ইনিও গছেন প্রায় পাঁচ মাস। তাই এখন বেশীর ভাগ আমাকে একলাই চালাতে হয়।

কিশোর নতমুখে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, ডাক্তাররা কী বলেন?

বিমলা সহজভাবে বলিল, ডাক্তাররা জবাব দিয়ে গেছেন। আজকালের মধ্যেই বোধ হয় সব শেষ হয়ে যাবে।

কিশোর অবাক হইয়া এই অসম্ভব সংযমশালিনী নারীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। এ কি সত্যই সংযম, না শুধু ঔদাস্য?

কিশোরের মনের ভাব বুঝিয়া বিমলা নীরবে একটু হাসিল; কিন্তু তাহার সংশয় দূর করিবার কোন চেষ্টা করিল না।

কিশোর আসিয়া আবার তীর্থনাথের শয্যার পাশে বসিল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, বিমলা ঘরে আলো জ্বালিয়া দিল।

তীর্থনাথ আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, পাস করলি, এবার কী করবি, ঠিক করেছিস? কিশোর চুপ করিয়া রহিল দেখিয়া তীর্থনাথ একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, গেজেট থেকে যতটুকু পাওয়া যায়, ততটুকু খবর তোর বরাবরই নিয়েছি, কিশোর। আমি বলি, তুই প্রফেসারি কর; বাবার পয়সা আছে বলে চুপ করে বসে থাকিস নে। আমার বিশ্বাস, ও পথে তুই উন্নতি করতে পারবি।

কিশোর চুপ করিয়াই রহিল; নিজের প্রসঙ্গ লইয়া এ সময়ে আলোচনা করিতে তাহার ভাল লাগিতেছিল না। কিন্তু অন্য কী প্রসঙ্গ তুলিয়া সে কথা পাল্টাইবে, তাহাও ভাবিয়া পাইল না। অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুকে এত কাছে এমন করিয়া সে আর কখনও দেখে নাই।

তীর্থনাথ বলিল, আচ্ছা থাক, তোর কথা আর বলব না, এবার আমার কথা বলি। কথা বেশী নয়, কিশোর, একটুখানি, কিন্তু তার পেছনে ভার প্রকাণ্ড। তোর কাঁধ যে কতখানি শক্ত, তা ভাল। করে জানি বলেই আজ তোর ওপর হঠাৎ এতবড় বোঝা চাপিয়ে দিতে পারছি। জানি, মাঝে মাঝে ভারী মনে হলেও এ বোঝা তুই ইচ্ছে করে কোন দিন ফেলতে পারবি না।

অজ্ঞাত আশঙ্কায় কিশোরের প্রাণ ভরিয়া উঠিল। কিসের ভার, কোন্ বোঝার কথা তীর্থদা বলিতেছে?

একটু থামিয়া তীর্থনাথ বলিতে লাগিল, ওকে সব কথা বলেছি, ও সব জানে। হস্টেলে থাকতে অত ছেলের মধ্যে তোকেই কেবল মনে মনে স্নেহ করতুম, কিশোর। তুই জানতিস না, একটা বইয়ের পোকা যে মানুষকে ভালবাসতে পারে, এ বোধ হয় তুই কল্পনাও করতে পারিসনি। তারপর আমি যখন চলে এলুম, তখন দুদিনেই তুই আমায় ভুলে গেলি, এমন কি আমার বিয়ের সময় পর্যন্ত এলি না। আমি কিন্তু তোকে চিনতুম, চিনতুম বলেই কোন দিন একটা গ্লানির ছায়া পর্যন্ত আমার মনে পড়েনি। আর আজ শেষ সময়, নির্ভর করতে পারব বলে কেবল তোকেই ডেকেছি।

একবার দম লইয়া তীর্থনাথ আবার আরম্ভ করিল, পৃথিবীতে আর একটি লোককে এমনই ভালবেসেছিলুম, সে ঐ মাথার শিয়রে দাঁড়িয়ে আছে। আমারই মত অভাগা ও, তিন কুলে আপনার বলতে কেউ নেই। আমরা দুজনে পরস্পরকে পেয়ে কী পরম আশ্রয়ই না পেয়েছিলুম। দারিদ্র্য হয়তো ছিল, কিন্তু অভাব ছিল না। কিন্তু আমি নির্বোধ, নিজের পায়ে কুড়ল মারলুম, ওরও সর্বনাশ করলুম।—সে যাক, ও ভেবে আর এখন কোন লাভ নেই। শরীরের যত্ন তো কোন দিনই করতে। শিখিনি, চিরদিন তাকে অবহেলার বস্তুই মনে করে এসেছি। কিন্তু আজ ওকে ছেড়ে যেতে যে কী কষ্ট হচ্ছে তা তোকে বোঝাতে পারব না, ভাই। শুধু এইটুকু সান্ত্বনা যে, ওকে তোর হাতে দিয়ে যাচ্ছি।

কিশোরের বাঙ্‌নিষ্পত্তি হইল না। সে একবার চোখ তুলিয়া দেখিল, তীর্থনাথের স্ত্রী খাটের বাজু ধরিয়া পাথরের প্রতিমার মত দাঁড়াইয়া আছে; মুখে ক্রন্দনের চিহ্নমাত্র নাই, চক্ষু দুটি স্থির, ওষ্ঠাধর এমন দৃঢ়ভাবে সম্বদ্ধ, যেন আর কিছুতেই খুলিবে না।

তীর্থনাথ পুনশ্চ বলিল, আমার কথা বুঝতে পেরেছিস, কিশোর? ওর ভার সম্পূর্ণভাবে তোর উপর দিয়ে গেলুম। তুই দেখিস-শুনিস, নিজের কাছে রাখিস। টাকা আমি কিছু রেখে যাব, যাতে একলা বিধবার কষ্টে-সৃষ্টে চলে যায়। কিন্তু টাকাই তো বড় জিনিস নয়, ভাই; ও এখনও ছেলেমানুষ, একজন পুরুষ অভিভাবক চাই, তা নইলে সংসার চারিদিকে রাক্ষসের মত হাঁ করে আছে যে।

তীর্থনাথ চুপ করিল। স্তব্ধ হইয়া কিশোর ভাবিতে লাগিল, এতখানি বিশ্বাস তাহাকে তীর্থদা করিতে পারিল কি করিয়া? মাত্র তিন বৎসর তাহারা একসঙ্গে কাটাইয়াছে, কিন্তু এই তিন বৎসরের মধ্যে এক দিনের জন্যও সে জানিতে পারে নাই যে, তীর্থনাথ তাহাকে এতখানি শ্রদ্ধা-বিশ্বাস করে। কেমন করিয়াই জানিবে? তীর্থনাথ থাকিত বই লইয়া, আর সে থাকিত জীবনের সমস্ত উত্তেজনা-উদ্দীপনার মাঝখানে। ইহার মধ্যে কখন আপনার কোণে থাকিয়া তীর্থনাথ তাহাকে নিজের বুকের অন্তরতম স্থানে টানিয়া লইয়াছিল, তাহা সে অনুভবেও জানিতে পারে নাই।

কিশোরের নিশ্চল মূর্তির দিকে চাহিয়া তীর্থনাথের মুখে উদ্বেগের ছায়া পড়িল, কি রে, পারবি না মনে হচ্ছে? বড্ড ভারী লাগছে?

ব্যাকুল হইয়া কিশোর বলিল, না দাদা, ভারী লাগছে না। কিন্তু ও-সব কথা এখন থাক, তুমি সেরে ওঠো।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া তীর্থনাথ বলিল, অঃ, বড় আরাম দিলি, কিশোর। তোর সম্বন্ধে ভয় আমার কোন কালেই ছিল না। কিন্তু তবু কত দিন দেখাশুনা নেই—অবস্থার ফেরে মানুষের মনও তো বদলে যায়। তুই কিন্তু ঠিক তাই-ই আছিস কিশোর, তেমনি সোজা আর মজবুত। তোকে দেখলে তৃপ্তি হয়। বলিয়া সস্নেহে কিশোরের গায়ে কম্পিত শীর্ণ হাতখানা বুলাইয়া দিল।

অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া তীর্থনাথ আবার বলিল, আমাকে মিছে আশ্বাস দেবার চেষ্টা করিস নে, কিশোর। আমি জানি, আমার হয়ে এসেছে, আজকালের মধ্যেই যাব। একটা উইল করে রেখেছি, আরও যা-কিছু কাগজপত্র—ওর কাছেই পাবি। আমার যা-কিছু সব ওর কাছে। ভাল কথা, বিয়ে করেছিস?

কিশোর ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না, করে নাই।

কিছুকাল শুন্যের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া তীর্থনাথ বলিল, করিস। এমন নিশ্চিত শান্তি আর কিছুতে নেই! নির্ভর করবার, ভালবাসবার, সান্ত্বনা দেবার একটি লোক সর্বদা কাছে থাকা যে কত সুখ, তা তোকে কি করে বোঝাব? গায়ে কখনও একটা আঁচ লাগতে দেয় না রে, সব তারা নিজেরা গা পেতে নেয়। আর শাসনের ঘটা যদি দেখিস, যেন আমরা পুরুষমানুষগুলো সবতেই অক্ষম—কিছুই করতে পারি না—ওরাই যেন আমাদের সারথি বলিয়া খুব আহ্লাদে হাসিবার চেষ্টা করিতেই প্রবল কাশির ধাক্কায় তাহার সব আহ্লাদ লুপ্ত হইয়া গেল।

কাশি থামিলে তীর্থনাথ আর কথা কহিতে পারিল না। তাহার অব্যক্ত যন্ত্রণার দৃশ্য সহ্য করিতে পারিয়া কিশোর সেখান হইতে উঠিয়া গেল।

রাত্রিকালে পাশের ঘরে শুইবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া এবং দরকার হইলেই ডাকিবে বলিয়া বিমলা স্বামীর কাছে গিয়া বসিল। শুইবার আগে কিশোর দেখিয়া গেল, তীর্থনাথের আচ্ছন্ন অবস্থা, কখন জ্ঞান আছে, কখন নাই, কিশোর পূর্বে কখন যক্ষ্মারোগী দেখে নাই-মৃত্যু যে একেবারে আসন্ন, তাহা সে বুঝিতে পারিল না।

রাত্রিতে একবার উঠিয়া আসিয়া কিশোর রোগীর ঘরের দরজার নিকট হইতে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, কেমন আছেন এখন?

ভিতর হইতে উত্তর আসিল—ভাল আছেন।

কিশোর আশ্বস্ত হইয়া শুইতে গেল। স্থির করিল, শেষ রাত্রিতে গিয়া ক্লান্ত শুশ্রূষাকারিণীকে বিশ্রাম করিবার অবকাশ দিবে।

ভোর হইতে না হইতে কিশোর তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া দেখিল, মেঝের উপর স্বামীর দেহ কোলে লইয়া তীর্থনাথের স্ত্রী স্থির হইয়া বসিয়া আছে। কিশোরের মাথার ভিতর একটা প্রবল হাতুড়ির আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে যেন চারিদিক অন্ধকার হইয়া গেল। তারপর দৃষ্টি পরিষ্কার হইলে টলিতে টলিতে মৃতের পাশে গিয়া দাঁড়াইল। মৃতের মুখে সংশয় বা ক্লেশের চিহ্নমাত্র নাই, আছে। কেবল অপরিসীম যন্ত্রণার অবসানে নিশ্চিন্ত বিশ্রাম।

আমায় একবার ডাকলে না, বৌদি! কখন শেষ হল? স্থির, দৃঢ় কণ্ঠে তীর্থনাথের বিধবা উত্তর করিল, রাত্রি তিনটের সময়। তোমাকে জাগিয়ে তো কোন লাভ হত না, ঠাকুরপো। শেষ সময়টা আমি একলাই তাঁর কাছে থাকতে চেয়েছিলাম। আর কেন, এবার লোকজন ডাকো; মৃতদেহ বেশীক্ষণ ফেলে রাখা তো ঠিক নয়।

তাহার অটল ধৈর্য দেখিয়া কিশোর ক্ষিপ্তের মত বাহির হইয়া গেল। কেবল তাহার মাথার মধ্যে। ঘূর্ণি হাওয়ার মত ঘুরিতে লাগিল, এমন হইল কেন? তীর্থদা অমন স্ত্রী ফেলিয়া যাইতে পারিল কিরূপে?

পাড়ার লোক আসিয়া যখন তীর্থনাথের কঙ্কালখানা তাহার স্ত্রীর হাত ছাড়াইয়া বাঁধিয়া-ছাঁদিয়া হরিধ্বনি করিয়া লইয়া চলিয়া গেল, তখন একবার মা গো বলিয়া সদ্যোবিধবা মাটিতে মূর্ছিত হইয়া পড়িল। সমস্ত দিন আর তাহার সংজ্ঞা হইল না।

দশদিন পরে তীর্থনাথের প্রেতকৃত্য সমাধা করিয়া এগারো দিনের দিন বিধবা তাহার স্বামীর খানকয়েক পুঁথিপত্র ও একটা টিনের ট্রাঙ্ক লইয়া কিশোরের সহিত কলিকাতায় চলিয়া আসিল। ব্যাঙ্কে তীর্থনাথের হাজার তিনেক টাকা ছিল। তাহা সে মৃত্যুর পূর্বে কিশোরের নামে নিঃশর্তে উইল করিয়া গিয়াছিল।

2

তারপর কিশোরের আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাসায় ন্যূনাধিক ছয় মাস কাটিয়া গিয়াছে।

কিশোর একখানা টেলিগ্রাম পড়িতে পড়িতে রান্নাঘরের সম্মুখে গিয়া ডাকিল, বৌদি, একখানা। তার এল।

জ্বলন্ত উনানের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বিমলা বলিল, কিসের তার, ঠাকুরপো? কোত্থেকে এল?

কিশোর বলিল, বাবা করেছেন। তিনি আজ আসছেন, এই সাড়ে নটার গাড়িতে।

বিমলা দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, কৈ, তাঁর তো আসার কোন কথা ছিল না।

উদ্বিগ্নস্বরে কিশোর বলিল, না। হঠাৎ–। যাই আমি হাওড়ায়, নটাও তো বাজে। বলিয়া জুতা-জামা পরিবার জন্য উপরে উঠিয়া গেল।

বিমলা কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর উনান হইতে কড়াটা নামাইয়া হাত ধুইয়া, কিশোরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ উপরে গেল। কিশোর তখন পাঞ্জাবি পরিয়া হাতে ঘড়ি বাঁধিতেছিল, চৌকাঠের উপর দাঁড়াইয়া বিমলা সঙ্কুচিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, আমি যে এখানে আছি, সে কথা তাঁকে লেখা হয়েছিল?

কিশোর একটু কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, না, লিখব-লিখব করে আর লেখা হয়ে ওঠেনি। কিন্তু সেজন্যে ভেব না, বৌদি।–বলিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

ট্রামে যাইতে যাইতে কিশোর ভাবিতে লাগিল, বাবাকে খবর না দেওয়াটা ভাল হয় নাই। তিনি সেকেলে লোক, হয়তো এটাকে ভাল চোখে দেখিবেন না। উপরন্তু যদি অন্য সূত্রে খবর পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে মন্দ ভাবিয়া বসাও বিচিত্র নহে। বিশেষ, সে যখন নিজে কোন খবরই দেয়। নাই, তখন সব দিক দিয়াই ব্যাপারটা অত্যন্ত সন্দেহজনক প্রতীয়মান হয়।

কিশোর জোর করিয়া নিজেকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল, সন্দেহজনকই বা কিসে? নিজের বিধবা অনাথা বৌদিদিকে লইয়া এক বাড়িতে থাকা কি এতই নিন্দনীয়? অবশ্য, বিমলা তাহার সত্যিকার বৌদিদি নহে; কিন্তু তাহাতেই বা কী? সে তো বিমলাকে আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধুর মতই শ্রদ্ধা করে। আর, এটা কীই বা এমন মহামারী ব্যাপার যে দেশসুদ্ধ লোককে সংবাদ না দিলেই নয়?

বাপকে লইয়া ফিরিবার পথে, গাড়িতে কিশোর দুই-একবার কথাটা উত্থাপন করিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু কী বলিবে, কেমন করিয়া কথা তুলিবে, ভাবিয়া না পাইয়া কিছুই বলা হইল না। তা ছাড়া, তাহার পিতা পশুপতিবাবু গোড়া হইতেই এমন গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলেন যে, দুই-একটা সাধারণ কুশল প্রশ্ন ছাড়া ভালমন্দ কোন কথাই সে বলিতে পারিল না।

গাড়ি হইতে নামিয়া বাড়ির ভিতর পা দিবামাত্র বিমলা আসিয়া গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিল।

পশুপতিবাবু গাম্ভীর্যের সহিত বিস্ময় মিশ্রিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এটি কে?

কিশোর দুইবার ঢোক গিলিয়া বলিল, উনি—উনি আমার বৌদি?

পাকা ভ্রূযুগল ঊর্ধ্বে তুলিয়া পশুপতিবাবু বলিলেন, বৌদিদি?

পলকের জন্য বিমলার ভাবলেশহীন মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কিশোর নিজেকে সামলাইয়া লইল। নিজের দুর্বলতাকে মনে মনে ধিক্কার দিয়া সহজ সংযত স্বরে বলিল, হ্যাঁ, বৌদিদি। ওপরে চলুন, সব কথা বলছি।

পুত্রের অনুবর্তী হইয়া পশুপতিবাবু উপরে কিশোরের ঘরে গিয়া বসিলেন। জুতা-জামা ত্যাগ করিবার কোন চেষ্টা না করিয়া জিজ্ঞাসুভাবে পুত্রের মুখের দিকে চাহিলেন, যেন পুরা কৈফিয়ত না শুনিয়া তিনি কোন কাজই করিবেন না।

কিশোর সংক্ষেপে ও সরলভাবে বিমলার আগাগোড়া ইতিহাস বলিয়া গেল।

সমস্ত শুনিয়া পশুপতিবাবু বলিলেন, হুঁ। আমাকে জানাওনি কেন?

জানাব জানাব করে জানানো হয়নি। আমার ভারি অন্যায় হয়ে গেছে।

হুঁ। পশুপতিবাবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, তারপর হঠাৎ বলিলেন, আমি তোমার বিয়ের সম্বন্ধ করেছি।

কিশোর চমকাইয়া উঠিয়া বলিল, বিয়ের সম্বন্ধ? কিন্তু এখন তো

হাত নাড়িয়া বাধা দিয়া পশুপতিবাবু বলিলেন, কিন্তু তার আগে আজই তুমি ঐ মেয়েমানুষটিকে বিদেয় করে দাও। ওর পয়সাকড়ি থাকে ভালই; না থাকে, নিজের পথ ও নিজে দেখে নেবে।

কিশোর প্রস্তরমূর্তির মত দাঁড়াইয়া রহিল।

পশুপতিবাবু বলিলেন, তোমার নামে নানারকম কুৎসা আমার কানে উঠেছিল, তাই নিজের চোখে দেখতে এলুম। তা দেখছি, কথাটা নেহাত মিথ্যে নয়। কিন্তু এ-সব কানাঘুষো বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। তুমি ছেলেমানুষ, যা করে ফেলেছ তার আর চারা নেই, কিন্তু ঐ স্ত্রীলোকটিকে আর বাড়িতে রাখা চলবে না। আজই ওকে যেতে বলে দাও।

তবু কিশোর ঘাড় গুঁজিয়া নীরব হইয়া রহিল। পশুপতিবাবু একটু নরম হইয়া পুনরায় বলিলেন, আমি তোমাকে দোষ দিচ্ছি না। কলকাতা শহর, তোমার এই উঠতি বয়স, চোখের মোহে অনেকের অমন সর্বনাশ হয়। কিন্তু সময়ে সামলে নেওয়া চাই। তোমার বিয়ের আমি সমস্ত ঠিক করে এসেছি—-মেয়েটি বেশ সুন্দরী

আমি এখন বিয়ে করব না।

আচ্ছা সে না হয় পরে দেখা যাবে। এখন তুমি ঐ মেয়েমানুষটিকে দূর করো তো দেখি। তোমার চোখের নেশা বই তো নয়। দু-দিন পরেই দেখবে—

বার বার বাপের এই কদর্য ইঙ্গিতে লজ্জায়, ক্রোধে, অপমানে কিশোরের নিজের চুল ছিড়িতে ইচ্ছা হইতেছিল। সে অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া ধীরভাবে বলিল, আমি পারব না।

পশুপতিবাবু ধমক দিয়া বলিলেন, পারবে না আবার কী? নিজের মুখে না বলতে পার, আমি বলে দিচ্ছি। এসব বিষয়ে চক্ষুলজ্জা মহাপাপ। না হয় দু-পাঁচ টাকাও যদি লাগে। —

ব্যাকুল হইয়া কিশোর বলিল, বাবা, কি বলছেন আপনি। উনি ভদ্রমহিলা বিধবা, শুদ্ধাচারিণী, ওঁর সম্বন্ধে এসব কথা মনে আনাও পাপ।

পশুপতিবাবু ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, দেখো, আমি তোমার বাপ, একষট্টি বছর বয়স হয়েছে, আমাকে বোকা বোঝাবার চেষ্টা কোরো না।

হতাশ হইয়া কিশোর বলিল, তবে আর কী বলব বলুন! আমার চরিত্রেও কি আপনার বিশ্বাস হয়?

পশুপতিবাবু কহিলেন, বলছি তো, তোমার দোষ কি? পাল্লায় পড়ে অসৎসঙ্গে মিশে অমন কত চরিত্রবান ছেলে নষ্ট হয়ে যায়। সংসার দেখে দেখে আমার চুল পেকে গেল। কিন্তু তোমাকে তো আমি এভাবে অধঃপাতে যেতে দিতে পারি না, শেষ পর্যন্ত বিষয়-আশয় কিছুই যে থাকবে না। ও সব মেয়েমানুষ কালকেউটের জাত, একবার পেয়ে বসলে

কথা শেষ হইবার পূর্বেই কিশোর মাথার একটা প্রবল ঝাঁকানি দিয়া বলিল, ওঁর কথা থাক। আপনি যখন আমাকেও বিশ্বাস করবেন না, তখন আর উপায় কী! কিন্তু আমি ওকে নিরাশ্রয় করে পৃথিবীতে একলা ছেড়ে দিতে পারব না, এই আমার শেষ কথা।

পশুপতিবাবু ক্রোধে অগ্নিবর্ণ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, পারবে না? বটে! —আচ্ছা তবে আমারও শেষ কথা শুনে রাখো। আজ থেকে তোমার সঙ্গেও আমার কোন সম্পর্ক রইল না। তোমার দুনামের জ্বালায় আমার লোকের কাছে মুখ দেখানো ভার হয়ে উঠেছে, তোমার মত দুশ্চরিত্র কুপুত্রকে আমি ত্যাগ করলুম। আজ থেকে তুমি আমার বাড়িতে মাথা গলিও না। আর তোমাকে মাসোহারাও আমি বন্ধ করে দিলুম। আমার পয়সায় এই সব নির্লজ্জ ব্যভিচার হতে পারবে না।

পশুপতিবাবু কাঁপিতে কাঁপিতে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া চলিলেন। আজ দুই মাস হইতে নিজের কলেজে অধ্যাপকের চাকরি পাইবার পর কিশোর যে আপনা হইতেই মাসোহারা লওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে রাগের মাথায় সে কথা তিনি স্মরণ করিতে পারিলেন না।

পশুপতিবাবু বাড়ির বাহির হইয়া একেবারে ফুটপাথে গিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, কিশোর ছুটিয়া তাঁহার কাছে গিয়া ব্যগ্র মিনতির কণ্ঠে বলিল, বাবা, আপনার পায়ে পড়ি, এখনই যাবেন না। কাল সমস্ত রাত ট্রেনে এসেছেন–

একখানা খালি ট্যাক্সি যাইতেছিল, পশুপতিবাবু সেটাকে ইঙ্গিতে ডাকিয়া তাহার উপর উঠিয়া বসিলেন।

কিশোর গাড়ির মধ্যে ঝুঁকিয়া তাঁহার পা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, বাবা, আপনার পা ছুঁয়ে বলছি—

প্রত্যুত্তরে পশুপতিবাবু কড়া সুরে ট্যাক্সিচালককে বলিলেন, হাঁকো হাওড়া স্টেশন।

ট্যাক্সি বাহির হইয়া গেলে পাংশু-শুষ্কমুখে কিছুক্ষণ ফুটপাথে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কিশোর আস্তে আস্তে বাড়ি ঢুকিল। বাপ তো তাহার চরিত্রের উপর একটা জঘন্য সন্দেহ করিয়া সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু এদিকে বিমলার কাছে সে মুখ দেখাইবে কি করিয়া? আর এরূপ একটা কুৎসিত ব্যাপারের পর বিমলা যদি আত্মমর্যাদা

রক্ষার জন্য তাহার সংসর্গ ত্যাগ করিতে চায়। এ অপমান যদি সে সহ্য করিতে না পারে!

নিজের ঘরে ফিরিয়া কিশোর দেখিল, মেঝের উপর বাম বাহুতে ভর দিয়া বিমলা হেঁট হইয়া বসিয়া আছে। সে প্রবেশ করিতেই মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, রইলেন না? চলে গেলেন?

হ্যাঁ, চলে গেলেন। কিশোর শ্রান্তভাবে একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বিমলা বলিল, ঠাকুরপো, আমার জন্য আজ তোমার বাপের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হল। তুমি না হয়ে অন্য আর কেউ হলে আমি এ মনোমালিন্য হতে দিতুম না—নিজে সরে দাঁড়াতুম। কিন্তু তোমাকে তো আমি এ অপমান করতে পারব না। তোমার বাবা বিষয়ী লোক, আমার সম্বন্ধে তিনি যা খুশি ভাবতে পারেন, আমাকে তো তিনি চেনেন না। কিন্তু তোমার মত ছেলেকে বাপ হয়ে তিনি চিনলেন না, মিথ্যে কলঙ্কের বোঝা মাথায় চাপিয়ে দিয়ে গেলেন, এই বড় আশ্চর্য। যাক, তাঁর বিষয়-আশয়ের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হোক, তোমার মত ছেলে তিনি হারালেন, এই বোধ হয় তাঁর সবচেয়ে বড় লোকসান।

কিশোর দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া অবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, বৌদি, বাবা মিথ্যে সন্দেহ করে ছেড়ে গেলেন, তুমিও আমায় ছেড়ে যেও না।

বিমলা উঠিয়া আসিয়া তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল, না। আমি তোমায় ছেড়ে যাব না। তুমি আর আমি আমরা সাধারণ দুর্বল মানুষ নই, নিজেরা মুখে বললেও এ কথা সত্যি। আমরা দুজনে মিলে দেখাব যে, অপরাধ আমাদের মধ্যে নেই, অপরাধ আছে সমাজের মনে। অন্যান্য সামান্য ছোট মানুষের পক্ষে সতর্কতার যে বিধিনিয়ম আছে, আমাদের বেলায় তা খাটে না। এ কথা সমাজ যদি দেখতে পায় ভালই, না পায় তাতেই বা ক্ষতি কী! আমরা তো জানি, আমরা খাঁটি আছি!–নাও, এখন ওঠো। স্নান করবে চলো, তোমার কলেজের বেলা হয়ে গেছে। বলিয়া বিমলা দ্রুতপদে নীচে নামিয়া গেল।

3

কলেজে চাকরি লইবার পর কিশোর নিজের বাসায় দ্বিতলের একটা ঘরে আপনার প্রয়োজনের উপযোগী একটি ছোটখাটো ল্যাবরেটরি করিয়াছিল। সত্যকার কোন কাজ করিতে পারিবে এমন আশা তাহার ছিল না, কিন্তু বিজ্ঞানের ঐ দিকটাতে নাকি তাহার অসাধারণ ঝোঁক ছিল, তাই প্রত্যহ রাত্রিকালে এবং ছুটিছাটার দিনে প্রায় অহোরাত্র সেই ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া বুনসেন বানার জ্বালিয়া টেস্ট টিউব গরম করিয়া নানা প্রকার বিকট দুর্গন্ধ বাহির করিয়া বাড়ির হাওয়া দূষিত করিয়া তুলিত। মাঝে মাঝে বিমলা কৌতূহলী হইয়া তাহার ম্যাজিক দেখিতে আসিয়া ক্রমে আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল। কিশোর হাসিয়া বলিত, বৌদি, তুমি হলে আমার ছাত্রী, তোমাকে কর্ক বোরিং থেকে আরম্ভ করে যা কিছু জানি, সব শেখাব। দেখবে তখন কী বিচিত্র এক শক্তিময় জগৎ এই সব কলকজার ভিতর দিয়ে ধরা পড়বে। বিমলাও হাসিয়া উত্তর দিত, কলেজে এত ছাত্র পেয়েও তোমার তৃপ্তি নেই, আবার বাড়িতেও ছাত্রী চাই? কিন্তু আমি কি সব বুঝতে পারব? কিশোর দুঃখ করিয়া বলিত, বৌদি, তোমার সিকি বুদ্ধি আর অধ্যবসায় যদি কলেজের ছেলেগুলোর থাকত, তাহলে কি আর ভাবনা ছিল!

যে দিনের কথা গত অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে, সেইদিন রাত্রিকালে এই ল্যাবরেটরি ঘরে বসিয়া কিশোর কিছু একটা করিবার চেষ্টা করিতেছিল। দিনের বেলাটা কাজকর্মে কোন রকমে কাটিয়াছিল, কিন্তু রাত্রিতে আহারের পর সময়টা আর কিছুতেই কাটিতে চাহিতেছিল না। সকাল-সকাল আহারাদি শেষ করিয়া অনেক রাত্রি পর্যন্ত ল্যাবরেটরিতে কাজ করা তাহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল, বারোটার পূর্বে কোনমতেই ঘুমাইতে পারিত

না। কিন্তু আজ সন্ধ্যা হইতেই সময়টা যেন ভারী হইয়া তাহার স্কন্ধের উপর চাপিয়া ছিল। কাজেও মন বসিতেছিল না, কেবল সেই অত্যন্ত অরুচিকর ব্যাপারটা নাছোড়বান্দা ভিক্ষুকের মত তাহার মনের পশ্চাতে লাগিয়াছিল। পাশের একটি বাড়ি হইতে উচ্চ কলহাস্য ও বাদ্যযন্ত্র সহযোগে গানের সুর ভাসিয়া আসিয়া তাহার অস্থির চিত্ত আরও বিভ্রান্ত করিয়া দিতেছিল। দূরের একটা গির্জার ঘড়িতে সশব্দে এগারোটা বাজিয়া গেল। তখন কিশোর বিরক্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল। ঘরের আলো নিভাইয়া চোখেমুখে জল দিয়া ভিতরকার বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইতেই তাহার চোখে পড়িল, বারান্দার অপর প্রান্তে বিমলার শয়নঘরের ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়া আলো আসিতেছে। প্রায় দুঘণ্টা আগে বিমলা শুইতে গিয়াছে, তাই কিছু আশ্চর্য হইয়া কিশোর দ্বারের কাছে গিয়া মৃদুস্বরে ডাকিল, বৌদি, জেগে আছ?

ভিতর হইতে শ্রান্তস্বরে উত্তর আসিল, হ্যাঁ, এসো। ধীরে ধীরে দরজা ঠেলিয়া কিশোর ঘরে ঢুকিল। ঘরের কোণে পিলসুজের উপর প্রদীপ জ্বলিতেছিল, শয়নঘরে বিমলা বৈদ্যুতিক বাতি ব্যবহার করিত না। প্রবেশ করিয়াই কিশোর সচকিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, এ কি বৌদি, মাটিতে শুয়ে যে।

বড্ড মাথা ধরেছে, ঠাকুরপো; আর ভারি বুক ধড়ফড় করছে। বলিয়া শীতল মেঝের স্পর্শ আরও ভাল করিয়া পাইবার জন্য উপুড় হইয়া শুইল।

বুক ধড়ফড় করা বিমলার পূর্ব হইতেই ছিল, মাথা ধরার উপসর্গও নুতন নহে। তাহার উপর সে পূজা-অর্চনায় আহারের অনিয়ম করিতে ছাড়িত না, অনশন উপবাস লাগিয়াই

ছিল। এই লইয়া কিশোরের কাছে অনেকবার বকুনি খাইয়াছে। কিন্তু আজ তাহার এই অসুস্থতার মুলে যে অনেকখানি মানসিক ক্লেশ নিহিত আছে, তাহা বুঝিয়া কিশোর তিরস্কারের কথা মুখে আনিতেও পারিল না। তবু সে জানিত না যে, আজ সমস্ত দিন বিমলার নিরুম্ব উপবাস গিয়াছে।

কিশোরের একটা হোমিওপ্যাথি বাক্স ছিল, তাহারই সাহায্যে সে জগতের যাবতীয় রোগ আরাম করিত। সে তাহারই ভিতর হইতে একটা ঔষধ খুঁজিয়া আনিতে গেল। পাশের বাড়িতে গানের সুর ও অগানের বাজনা তখন উচ্চ হইতে আরও উচ্চে উঠিতেছে।

ঔষধ লইয়া ফিরিয়া আসিতেই বিমলা ব্যাকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, আমায় এমন কোন জায়গায় পাঠিয়ে দিতে পার ঠাকুরপো, যেখানে গোলমাল চেঁচামেচি নেই? যেখানে শান্তিতে দুদণ্ড ভাবতে পারা যায়? বলিয়া দুই বাহু দিয়া মাথাটা চাপিয়া ধরিয়া যেন বাহিরের শব্দ নিরোধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

কিশোর প্রথমে কথাটা বুঝিতে পারিল না, তারপর বুঝিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ঝি কোথায়?

বাহুর ভিতর হইতে বিমলা বলিল, তার মার অসুখ, আমি তাকে ছুটি দিয়েছি। দাসীটা প্রায় প্রত্যহই কার্যের অছিলা করিয়া রাত্রিকালে বাড়ি চলিয়া যাইত।

আচ্ছা আমিই দেখছি। বলিয়া ঔষধ খাওয়াইয়া খালি গায়ের উপর একটা চাদর ফেলিয়া কিশোর নামিয়া গেল।

কিশোরের বাসার পাশ দিয়া একটা গলি গিয়াছিল। যে বাড়ি হইতে গানবাজনার আওয়াজ আসিতেছিল সেটা গলির অপর পাশে, কিন্তু সদর রাস্তার উপরই। দুইটা বাড়ির মধ্যে কেবল সংকীর্ণ গলির ব্যবধান। দ্বিতল বাড়িখানা এতদিন খালি পড়িয়া ছিল, মাত্র তিন-চারদিন পূর্বে একটি নূতন পরিবার এটি ভাড়া লইয়াছিলেন।

এই পরিবারে আজ একটি ক্ষুদ্র উৎসব ছিল। ইহারা হিন্দু বটে কিন্তু স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে সাধারণ হিন্দুদের অপেক্ষা অগ্রগামী ছিলেন; পদা-প্রথা, বাল্যবিবাহ সম্বন্ধেও প্রচলিত কুসংস্কার ছাড়াইয়া উঠিয়াছিলেন। আজ এই বাড়ির একমাত্র কন্যা সুহাসিনীর অষ্টাদশ জন্মতিথি উপলক্ষে কয়েকজন বন্ধু নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে অধিকাংশই স্ত্রীলোক। আহারাদির পর সকলে মিলিয়া ড্রয়িংরুমে গল্পগুজব করিতেছিল। সুহাসিনী অগানে বসিয়া গান গাহিতেছিল এবং একটি ইংরাজী বেশধারী গোঁফ কামানো যুবক চিবুকের নীচে বেহালা চাপিয়া ছড় টানিতেছিল।

কিশোর বাড়ির বাহির হইতে দুই-একবার ডাকাডাকি করিয়া কোন সাড়া না পাইয়া ড্রয়িংরুমের পর্দা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

চাদর গায়ে নগ্নপদ দীঘাকৃতি একজনকে সহসা প্রবেশ করিতে দেখিয়া অর্ধপথে গান থামিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে সকলের দৃষ্টি এই অপরিচিত আগন্তুকের উপর গিয়া পড়িল। রাত্রি অনেক হইয়াছিল, তাই আকস্মিক আবিভাবে সকলের মুখেই একটা উদ্বেগের ছায়া পড়িল। এ পাড়ায় সবে নূতন আসা হইয়াছে, পাড়া-পড়শীর সহিত

এখনও আলাপ হয় নাই,—এ কে, হঠাৎ খবর না দিয়াই অসঙ্কোচে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল?

কিশোর ঘরের মাঝখান পর্যন্ত গিয়া সম্মুখে যে বৃদ্ধগোছের লোকটি বসিয়াছিলেন, তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, আমাকে মাপ করবেন। পাশের বাড়িতে আমি থাকি। আমার বৌদিদির শরীর বড় অসুস্থ, আপনাদের গানবাজনায় তাঁর বিশ্রামের ব্যাঘাত হচ্ছে।

সকলে স্তব্ধ হইয়া বক্তার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল, কেহ যেন কিছু বুঝিতেই পারিল না। বাড়ির কর্তা বিনয়কৃষ্ণবাবু কী একটা বলিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দুইবার হাঁ করা ছাড়া কোন কথাই বাহির করিতে পারিলেন না। যে যুবকটি বেহালা বাজাইতে ছিল, সেই কেবল উপস্থিত বুদ্ধি হারায় নাই, একটু বিরক্তভাবে বলিল, না বলে কয়ে তো ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন, আপনি কে, জানতে পারি কি?

কিশোর বলিল, বললুম তো, পাশের বাড়িতে আমি থাকি।

যুবকটি বলিল, তা আমরাও শুনেছি, কিন্তু সে তো আর পরিচয় হল না। যাকগে, আপনি এখন কী চান?

কিশোর কী চায়, পূর্বে বলিয়াছিল, এখন আবার পুনরুক্তি করিল।

গম্ভীরমুখে কিশোরের বক্তব্য শুনিয়া যুবক বলিল, তা আপনি যদি নিজের বাড়ির জানলাগুলো বন্ধ করে দেন, তাহলে সুবিধা হতে পারে।

কিশোর বলিল, এত কাছে থেকে জানলা বন্ধ করে দিলে কোন সুবিধাই হবে না। বরঞ্চ যেটুকু হাওয়া যাচ্ছে, তাও বন্ধ হয়ে যাবে।

যুবক আরও গভীর হইয়া ও বলিয়া বেহালাখানা আবার হাতে তুলিয়া লইল।

সুহাসিনী মিউজিক টুলের উপর বসিয়া এতক্ষণ একদৃষ্টে কিশোরের দিকে তাকাইয়াছিল। তাহার একাগ্র দৃষ্টির দ্বারাই আকৃষ্ট হইয়া যেন কিশোর সেই দিকে ফিরিল, অনুনয়ের কণ্ঠে বলিল, রাতও অনেক হয়েছে, সাড়ে এগারোটা বাজে। এখন যদি আপনারা–

যুবকটি কিশোরের কথা শেষ হইতে দিল না, ভ্রূভঙ্গি করিয়া বলিল, রাত অনেক হয়েছে, এ কথার মানে কি? আপনি কি আমাদের পুলিসের ভয় দেখাচ্ছেন?–তাহলে এও আপনি জেনে রাখুন যে, আমার মামা এই কলকাতা শহরের একজন ডেপুটি পুলিস কমিশনার।

কিশোর মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল, না, আমি পুলিসের ভয় দেখাইনি। আর, মামা ডেপুটি পুলিশ কমিশনার হলে আইন ভঙ্গ করবার অধিকার জন্মায় কিনা, তাও আমার জানা নেই। সুহাসিনীর দিকে ফিরিয়া বলিল, পাশের বাড়িতেই একটি অসুস্থ মহিলা কষ্ট পাচ্ছেন, তাই আপনাদের অনুরোধ করছি। অকারণে আপনাদের আমোদ-প্রমোদে বাধা দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়—আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন–

খোঁচা খাইয়া যুবক মনে মনে ভারি চটিয়াছিল, সুহাসিনীকে কোন কথা বলিবার অবকাশ না দিয়াই সেই আবার কথা কহিল। রুক্ষস্বরে বলিল, আপনিও আমাদের ক্ষমা করবেন, কিন্তু কোথায় কোন মহিলা কষ্ট পাচ্ছেন, সেজন্য আমরা আমোদ-প্রমোদ বন্ধ করব কেন, তা তো বুঝতে পারছি না। ও সব হবে-টবে না, আপনি যেতে পারেন।

কিশোরের চোখে যুদ্ধ ঘনাইয়া উঠিল, সে অন্য সকলের দিকে ফিরিয়া কঠিন স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, আপনাদের সকলেরই কি তাই মত? গান বাজনা বন্ধ করবেন না? বলিয়া স্খলিত চাদরের প্রান্তটা কাঁধে তুলিয়া লইল।

যুবকের গলার শিরা আবার উচু হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু বিনয়কৃষ্ণবাবু এতক্ষণে তাঁহার হারানো কণ্ঠস্বর ফিরিয়া পাইলেন, তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিলেন, না না, অনুপম, তুমি চুপ করো, গোলমাল করে কাজ নেই,নতুন পাড়া, উনি যখন বলছেন বাড়িতে অসুখ,কাউকে এখানে চিনি না, বুঝলে না?—আমরা গান বাজনা এখনই বন্ধ করে দিচ্ছি,অনুপম, তুমি থামো-হাঙ্গামায় দরকার নেই, অনেক রাত হয়েছে—আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে যেতে পারেন, আর গানবাজনা হবে না। বলিয়া থপ করিয়া আবার চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন।

আচ্ছা, ধন্যবাদ বলিয়া একবার মাথাটা আনত করিয়া কিশোর ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

সে চলিয়া গেলে ঘর কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। তারপর অনুপম প্রথম কথা কহিল; ঠক করিয়া বেহালাখানা বাক্সে বন্ধ করিয়া বলিল, আপনি ভাল করলেন না। কোথাকার কে তার ঠিক নেই, খবর না দিয়েই বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল, তাকে এরকমভাবে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হয়নি। বদমায়েস লোক ওতে মাথায় চড়ে বসে।

ঘরে যে কয়টি প্রৌঢ়া রমণী উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মুখে এতক্ষণ বাক্যস্ফুর্তি হয় নাই। এইবার একজন কথা কহিলেন, ইনি অনুপমের জননী। বলিলেন, লোকটা যেন চোয়াড়। পায়ে। জুতা নেই, গায়ে আবার একটা চাদর। আর কাঠখোট্টার মত কথা কইবার বা কী ধরন, যেন মারতে। এল। কী জানি বাপু, আমার তো একটুও ভাল বোধ হল না। তিনি মুখখানা বিকৃত করিলেন।

বিনয়কৃষ্ণবাবু আমতা-আমতা করিয়া বলিলেন, কী জানি, কিছুই তো বলা যায় না। বললে যখন বাড়িতে অসুখ, তখন কী বলে আর–

অনুপম বলিল, একদম বাজে কথা। আমি নিশ্চয় বলতে পারি, লোকটার অন্য কোন মতলব ছিল। হয়তো ঐ ছুতো করে বাড়ির ভেতরটা দেখে গেল।

অত্যন্ত ভীত হইয়া বিনয়কৃষ্ণবাবু বলিলেন, না না, অনুপম, তুমি ভুল করছ; চোর-ছ্যাঁচড়ের মত চেহারা তো নয়, বরং ভদ্রলোক বলেই–

অনুপম বলিল, ভদ্রলোক ওর সাত গুষ্ঠিতে নেই। ভদ্রলোকের কখনও অমন আখাম্বা ষণ্ডা চেহারা হয়? আমার বিশ্বাস, ও একটা গুণ্ডা। আজকাল সব ভদ্রবেশী গুণ্ডা হয়েছে জানেন না? কাছেই ঐ মেছোবাজারে তাদের আচ্ছা।

বিনয়কৃষ্ণবাবু একেবারে ফ্যাকাসে হইয়া গেলেন, বলিলেন, বল কী অনুপম! আমি একলা মেয়ে নিয়ে থাকি, শেষে কি গুণ্ডার হাতে—এ পাড়ায় ছাই কাউকে চিনিও না।

অনুপম হাত উল্টাইয়া বলিল, আমি আর কী করব বলুন, আমি তো হাঁকিয়েই দিচ্ছিলুম, আপনি মাঝ থেকে ডেকে প্রশ্রয় দিলেন। যাক, কাল এ বিষয়ে অনুসন্ধান করা যাবে। আর মামাকেও না হয় খবরটা–

বিনয়কৃষ্ণবাবু বলিলেন, সে তো কালকের কথা; কিন্তু আজ রাত্তিরটা—

সুহাসিনী আসিয়া বাপের চৌকির পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছিল, সে ভৎসনার সুরে বলিল, কেন বাবা ম মিছে ভয় পাচ্ছ? বাড়িতে দারোয়ান রয়েছে, বদ্রী রয়েছে, তা ছাড়া মগের মুল্লুক তো নয়–কলকাতা। চারিদিকে প্রতিবেশীরা রয়েছেন। মনে কর, যদি গুণ্ডাই হয়, তাতেই বা এত ভয় কসের?

অনুপম বিজ্ঞভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, ভয় যদি না-ও থাকে, তবু খুব সাবধানে থাকার দরকার।

সুহাসিনী হাসিয়া বলিল, আচ্ছা, আমরা খুব সাবধানেই থাকব।

অনুপমের মাতা বলিলেন, অনুপম, তাহলে আমাদের আর রাত করে কাজ নেই। বারোটা প্রায় বাজে, কাল আবার তোমাকে সকালেই আফিস যেতে হবে। বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

বিনয়বাবু কন্যার কথায় কিছু আশ্বস্ত হইয়াছিলেন, অতিথিদের উঠিতে দেখিয়া আবার ভীত হইয়া পড়িলেন, তা-তা—অনুপম, তোমরা না হয় আজ রাত্রিটা এখানেই-আমার দুটো শোবার ঘর বালি আছে-

ক্ষুব্ধ লজ্জায় সুহাসিনী বলিয়া উঠিল, কী তুমি পাগলের মত করছ, বাবা! ওঁরা থাকতে পারবেন নে? না না, মাসীমা, আপনারা বাবার কথা শুনবেন না— অনুপমের মাতার কাছে গিয়া গলা খাটো করিয়া বলিল, মা যাবার পর থেকে বাবা কি রকম হয়ে গিয়েছেন জানেন তো? একটুতেই উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। বলিতে বলিতে তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল। অনুপমের মাতা ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, সে তো জানিই।

বস্তুত বিনয়বাবুর স্ত্রী যতদিন জীবিত ছিলেন, তিনিই এই স্বামীটির সর্বকার্যের ও সর্বচিন্তার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, নিজের বা অন্যের কোন ভাবনাই বিনয়বাবুকে কোনদিন ভাবিতে হয় নাই। তাই, বছর তিনেক আগে স্ত্রী যখন মারা গেলেন, তখন সকল বিষয়েই বিনয়বাবু যেন নিতান্ত অসহায় হইয়া পড়িলেন; একটু সামান্য কারণেই অতিশয় ব্যস্ত ও বিচলিত হইয়া পড়িতেন।

অভ্যাগত অতিথিরা একে একে বিদায় লইলেন। অনুপমের ইচ্ছা ছিল, সুহাসিনীর সহিত আড়ালে দুই-একটা কথা কয়; কিন্তু আজ আর তাহার সুবিধা হইল না দেখিয়া মাতাকে লইয়া প্রস্থান করিল।

সকলে চলিয়া গেলে, সদর দরজা নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া বন্ধ করাইয়া, বিনয়বাবুকে শান্ত করিয়া বছানায় শোয়াইয়া দিয়া ঘরের আলো নিভাইয়া সুহাসিনী নিজের শয়নকক্ষে গেল। দর্পণের সম্মুখে নড়াইয়া জামা কাপড় খুলিতে খুলিতে সে অন্যমনস্কভাবে বিগত ঘটনার কথাই চিন্তা করিতে লাগিল।

সুহাসিনী মেয়েটির গায়ের রং কালো, গৌরাঙ্গী তাহাকে কোনমতেই বলা চলে না। কিন্তু এমনই সুন্দর তাহার মুখের শ্রী ও দেহের গঠন যে, একবার তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে তাহার বর্ণের কথা আর মনে থাকে না। চোখ দুটি বেশ বড়, পাতলা দুটি ঠোঁট; গ্রীবার রেখাটি এমনই চমৎকার নিটোল যে, কোথায় গ্রীবা শেষ হইয়া চিবুক আরম্ভ হইয়াছে, ধরা যায় না। কিন্তু এ সব ছাড়াইয়া সর্বাপেক্ষা মধুর তাহার মুখের হাসি, যেমন সুমিষ্ট তেমনি অকুণ্ঠিত। এই পূর্ণ-যৌবনা মেয়েটির হৃদয়ের নির্মল সহজতাটুকু যেন অকৃত্রিম হাসির ভিতর দিয়া ধরা পড়ে।

কাপড় ছাড়িয়া সাদা শাড়ি পরিয়া বেণী খুলিতে খুলিতে সুহাসিনী যখন শুইতে গেল, তখনও সে সেই কথাই ভাবিতেছে। ঐ নগ্নপদ দীর্ঘদেহ লোকটির সম্বন্ধে সকলে মিলিয়া অনেক সন্দেহই তাহার মনে ধরাইয়া দিয়াছে, কিন্তু তবু সে যে একটা দুর্দান্ত দস্যু,

ভদ্রতার মুখোস পরিয়া আসিয়াছিল, একথা সুহাসিনী মনে মনে কিছুতেই স্বীকার করিয়া লইতে পারিল না এবং লোকটির প্রকৃত পরিচয় জানিবার কৌতূহলও বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। বিছানায় শুইয়া লোকটি কে, শিক্ষিত কি অশিক্ষিত, কী করে, এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে অবশেষে সে ঘুমাইয়া পড়িল।

4

ছয়-সাত বৎসর পূর্বে বিনয়কৃষ্ণবাবু বেহার অঞ্চলের কোন বড় শহরের এক প্রসিদ্ধ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। সেই সময়ে বাঙ্গালী-বেহারীর মধ্যে অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা কিছু তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিতেছিল। বেহার যে বেহারীদের জন্যই, আর কাহারও জন্য নহে, এই সনাতন সত্য নুতন করিয়া আবিষ্কৃত হইবার পর বেহারের আদিম এবং ন্যায্য অধিবাসিগণ বাঙ্গালীদের আড়ালে বাঙ্গালিয়া উপাধিতে সমোধিত করিয়া অবজ্ঞা ও নিজেদের আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বিনয়কৃষ্ণবাবুর বেহারী সহকর্মীরা—যাঁহারা এতদিন তাঁহাকে দেবতার মত ভক্তি করিতেন, তাঁহারা ভিতরে ভিতরে বিনয়বাবুর নানা দোষ-ত্রুটি ধরিয়া উপরওয়ালার কাছে পাঠাইতে লাগিলেন। নিজেদের মধ্যেও তাঁহার অযোগ্যতা সম্বন্ধে বিবিধ আলোচনা চলিতে লাগিল; এবং একজন বাঙ্গালী যে হাজার বারোশ টাকা মাহিনার একটা উচ্চ-পদ অধিকার করিয়া উহা হইতে আদিম অধিবাসীদিগকে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে, এ মনস্তাপের উষ্ম দুই-একখানা প্রাদেশিক সংবাদপত্রেও বাহির হইয়া পড়িল।

তাঁহার সম্বন্ধে এই সমস্ত গোপন ও প্রকাশ্য রুিদ্ধতার খবর পাইবামাত্র বিনয়কৃষ্ণবাবু কাজে ইস্তফা দিলেন। কলেজটি গভর্নমেন্টের প্রসাদলি,—তাই তাহার শাসক-সমিতি উপরের কোন উপদেবতার কটাক্ষ ইঙ্গিত অনুসরণ করিয়া একজন ইংরাজকে বিনয়বাবুর শূন্যপদে বহাল করিলেন। ইহাতে আদিম অধিবাসিগণ কোন প্রকার আপত্তি করিলেন কি না, তাহা বাহিরের কেহ জানিতে পারিল না।

কর্মত্যাগ করিয়া বিনয়কৃষ্ণবাবু কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি পূর্বেই কলিকাতা পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল। দুই-তিনটা কলেজ হইতে অধ্যাপনা করিবার জন্য তাঁহার নিমন্ত্রণ আসিল; কিন্তু তিনি গ্রহণ করিলেন না। অর্থোপার্জনের কোন প্রয়োজন ছিল না, সারা জীবনে তিনি অনেক অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার স্ত্রী তাহার অধিকাংশ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তাই তিনি অতঃপর নিরবচ্ছিন্ন বিশ্রামে বিদ্যাচচা করিয়া বাকী জীবনটা কাটাইয়া দিতে মনস্থ করিলেন।

তারপর হঠাৎ একদিন তাঁহার স্ত্রী মারা গেলেন। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় তাঁহার নিশ্চিন্ত প্রশান্ত জীবনযাত্রা যেন ছন্নছাড়া হইয়া গেল। মনের অবস্থা এমনই হইল যে এক বাড়িতে দীর্ঘকাল থাকিতে মন টিকিত না, কলিকাতার মধ্যেই এবাড়ি ওবাড়ি করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। কয়েকদিন পূর্বে শ্যামবাজারের বাড়িখানা অসহ্য মনে হওয়ায় আমহার্স্ট স্ট্রীটে কিশোরের পাশের বাড়িতে আসিয়া উঠিয়াছিলেন।

সে রাত্রির ঘটনার পরদিন প্রভাতে বিনয়কৃষ্ণবাবু দুই পাশের বাড়িতে সতর্কভাবে খোঁজ-খবর লইলেন, কিন্তু কেহই কিছু বলিতে পারিল না। গলির অপর পাশের বাড়িতে অবশ্য তিনি খোঁজ করেন নাই, সুতরাং গতরাত্রির লোকটার উপরে সন্দেহ আরও ঘনীভূত হইল। সন্ধ্যার পর অনুপম আসিয়া সমস্ত শুনিয়া বলিল, দেখলেন তো, আগাগোড়া ধাপ্পাবাজি। আপনি তখন একেবারে করুণায় গলে গেলেন। আমি একনজর দেখেই বুঝেছিলুম, একেবারে পাকা বদমায়েস। ভুরু দেখে লোক চিনে নিতে পারি, সে ক্ষমতা আছে। বলিয়া ক্ষুদ্র নয়ন-যুগলে আত্ম-প্রীতি ভরিয়া সুহাসিনীর দিকে চাহিল।

সুহাসিনী মুখ নীচু করিল। সকলে প্রথম হইতেই যাহাকে বদলোক বলিয়া চিনিতে পারিয়াছে, দারুণ অনভিজ্ঞতার দোষে কেবল সে-ই যে তাহাকে ভদ্রলোক বলিয়া সন্দেহ করিয়াছিল, মানুষ চিনিবার এই অক্ষমতায় সে মনে মনে ভারি লজ্জা পাইল। গতরাত্রির আগন্তুকের স্বাভাবিক মন্দচরিত্র। ও উপস্থিত দুরভিসন্ধিতে কাহারও সংশয় রহিল না। বিনয়বাবু এ বাড়ি ছাড়িয়া অন্য কোথাও উঠিয়া যাইবেন কি না, উদ্বিগ্নভাবে তাহাই আলোচনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু অনুপম তাঁহাকে ভরসা দিয়া গেল যে, ভয়ের কোন কারণ নাই; পুলিসের ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত লোক এখানে যাতায়াত করে জানিবার পর সে লোকটা খুব সম্ভব এদিকে আর ঘেঁষিবে না।

কিন্তু এত কাছাকাছি থাকিয়া দেখাশুনা না হওয়া অসম্ভব। দিন দুই পরে একদিন সন্ধ্যার সময় বিনয়কৃষ্ণবাবু বাড়ি হইতে বাহির হইয়া দারোয়ানকে ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিবার হুকুম দিয়া পদব্রজে হ্যারিসন রোডের চৌমাথার দিকে কিছুদুর অগ্রসর হইয়াছেন, এমন সময় সম্মুখ হইতে একজন লোক হাত তুলিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিল। প্রথমটা ঠাহর করিতে পারেন নাই, কিন্তু চিনিতে পারিয়াই বিনয়বাবু একেবারে কাঠ হইয়া গেলেন। এ আর কেহ নহে—সেই গুণ্ডা।

কিশোর কাছে আসিয়া বলিল, সেরাত্রে আপনাদের ওপর বড় উৎপাত করেছিলুম। একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকের জুলুম আপনারা নিতান্ত ভদ্রলোক বলেই সহ্য করেছিলেন, আর কেউ হলে করত না।

জল হইতে সদ্য ডাঙ্গায় তোলা কাতলা মাছের মত বিনয়বাবু তিনবার খাবি খাইলেন, কিন্তু কোন প্রকার বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না।

কিশোর বলিল, সেদিন বড় উপকার করেছিলেন। একদিন গিয়ে আপনাদের সঙ্গে ভাল করে আলাপ করব ইচ্ছে ছিল কিন্তু নানা কারণে হয়ে ওঠেনি।

বিনয়বাবু খলিতকণ্ঠে বলিলেন, অ্যাঁ—তা—আপনাকে আমি কখনো কি বলে—আপনার সঙ্গে–

ওঃ, চিনতে পারেননি বুঝি? কিশোর হাসিয়া উঠিল, তা না পিরবারই কথা। গত শুক্রবার রাত্রিতে আপনাদের গান বাজনার মজলিসে গিয়ে যজ্ঞ-বিঘ্ন করেছিলুম। —তা চলুন না, আপনার যদি বিশেষ কাজ না থাকে তো আমার বাড়াতে গিয়েই একটু বসবেন। আপনি যখন প্রতিবেশী হলেন, তখন আলাপ-পরিচয় হওয়া চাই তো।

আবার আলাপ-পরিচয়। কম্পিত-কলেবরে বিনয়বাবু একবার পুলিস বলিয়া চেঁচাইবার চেষ্টা করিয়া, যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথে উঠি কি পড়ি করিয়া ফিরিয়া চলিলেন।

কিশোর অবাক হইয়া কিছুক্ষণ তাকাইয়া রহিল, বৃদ্ধের এরূপ অদ্ভুত আচরণের কোনই কারণ খুঁজিয়া পাইল না। তারপর জোরে পা চালাইয়া সে তাঁহার পশ্চাদ্বর্তী হইল। তাহার ধারণা হইল, পথের মধ্যে বৃদ্ধ নিশ্চয় সহসা গুরুতর রকম অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন।

বিনয়বাবু নিজের গৃহসম্মুখে পৌঁছিয়া রুদ্ধ দরজায় ধাক্কা দিতে দিতে চেঁচাইতে ছিলেন, দারোয়ান, বরি, কে আছিস, শিগগির দরজা খোল।

এমন সময় কিশোর আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কী হয়েছে বলুন তো। শরীর খারাপ মনে হচ্ছে কি?

বিনয়বাবু ঘাড় বাঁকাইয়া দেখিলেন, ডাকাতটা একেবারে তাঁহার পিঠের কাছে দাঁড়াইয়া আছে। তিনি নিশ্চয় একটা সাংঘাতিক কিছু করিয়া ফেলিতেন, কিন্তু ঠিক সেই সময় নিতান্ত পরিচিত কণ্ঠে কে একজন বলিল, কে ও, কিশোর না? তাই তো হে, বিনয়বাবুর সঙ্গে কবে আলাপ হল?

রাস্তায় তখন গ্যাস জ্বলিয়া উঠিতেছিল, কিশোর ফিরিয়া দেখিল, তাহার কলেজের সিনিয়র প্রফেসর এবং তাহার ভূতপুর্ব শিক্ষক দীনবন্ধুবাবু মোটা লাঠিটা হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

বিনয়বাবু এই জনাকীর্ণ শহরের মধ্যে এই প্রথম যেন একটিমাত্র মানুষ দেখিতে পাইলেন, সাগ্রহে টিয়া গিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন, এই যে দীনবন্ধু এসেছ—এসো এসো এসো! তোমাকে দেখে যে কত খুশি হলুম—

দীনবন্ধুবাবু তাঁহার ভাব দেখিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, কী ব্যাপার, বলুন তো? আপনাকে বড় বিচলিত দেখছি।–কিশোর, তুমি কিছু জান?

কিশোর বলিল, আজ্ঞে, কিছু বোঝা যাচ্ছে না। বোধ হয় ওঁর শরীরটা খারাপ হয়েছে।

দীনবন্ধু বলিলেন, তাই না কি? কিন্তু তাহলে এরকমভাবে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকবার প্রয়োজন কী, তা তো বুঝতে পারছি না। বাড়ির ভেতর গেলে ক্ষতি কি?

বিনয়বাবু একবার ইহার মুখ, একবার উহার মুখ দেখিয়া শেষে বলিলেন, দীনবন্ধু, তুমি এই–এঁকে চেন না কি?

দীনবন্ধু বলিলেন, বিলক্ষণ, কিশোরকে চিনি না। ও হল গিয়ে আমার ছাত্র—অর্থাৎ এককালে ছাত্র ছিল, এখন কলীগ। ওর কথাই তো সেদিন আপনাকে বলছিলুম যে, আপনার নতুন পাড়াতে আমার একটি ছাত্র থাকে। ভেবেছিলুম, আমিই আজ আলাপ করিয়ে দেব, তা আলাপ তো হয়ে গেছে দেখছি।

বিনয়বাবু হতবুদ্ধি হইয়া বলিলেন, আলাপ! তা—হ্যাঁ কিন্তু অনুপম যে বললে

ইতিপূর্বে বাড়ির দরজা খোলা হইয়াছিল এবং সুহাসিনী পিতার হাঁক-ডাকে সন্ত্রস্ত হইয়া নীচে নামিয়া আসিয়াছিল, এতক্ষণ অর্ধমুক্ত দ্বার-মুখে দাঁড়াইয়া ইহাদের কথাবার্তা শুনিতেছিল।

দীনবন্ধু তাহাকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, এই যে সুহাস-মায়ী, তোমার বাবার কী হল বল দেখি? রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এমন করছেন কেন?

প্রত্যুত্তরে সুহাসিনী খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, তারপর মুখে আঁচল খুঁজিয়া হাসি চাপিতে চাপিতে বলিল, আপনারা ভেতরে আসুন; ফুটপাথে দাঁড়িয়ে অমন করলে রাস্তার লোকে পাগল মনে করবে যে।

আমিও তো সেই কথাই বলছি-দীনবন্ধুবাবু অগ্রে অগ্রে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বিনয়বাবু তাঁহার পশ্চাতে অসংলগ্নভাবে বলিতে বলিতে চলিলেন, সবাই মিলে আমাকে বুঝিয়ে দিলে,–অনুপমটা একটা আস্ত ইয়ে,–আমি গোড়া থেকেই—ইত্যাদি।

কিশোরও একবার একটু ইতস্তত করিয়া ভিতরে অনুসরণ করিল। এই মেয়েটিকে সেদিনও সে দেখিয়াছিল বটে, কিন্তু ভাল করিয়া লক্ষ্য করে নাই। আজ তাহার ভিতরে আসিবার আহ্বানের মধ্যে সে-ও অন্তর্ভুক্ত কি না, তাহা ঠিক বুঝিতে না পারিলেও বিনয়বাবুর অদ্ভুত ব্যবহারের আড়ালে যে একটা মজার রহস্য লুকাইয়া আছে এবং সে নিজেও যে এই রহস্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, তাহা এই মেয়েটির উচ্ছ্বসিত দমকা হাসি শুনিয়া টের পাইয়াছিল। তা ছাড়া এই সহসা উদ্বেলিত হাসির মধ্যে এমন একটি আশ্চর্য মাদকতা ছিল যে, ক্ষণকালের জন্য তাহাকে আবিষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল। তাই, একরকম যন্ত্রচালিতের মতই সে সকলের পিছু পিছু বারান্দা পার হইয়া ড্রয়িংরুমে গিয়া উপস্থিত। হইল।

সকলে উপবিষ্ট হইলে দীনবন্ধু বলিলেন, একটা কিছু হয়েছে, আমি ধরতে পারছি না। সুহাস-মায়ী, তুমিই বল তো ব্যাপারখানা কী?

সুহাস মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, বাবাকে জিজ্ঞাসা করুন না।

বিনয়বাবু অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়া আমতা-আমতা করিয়া বলিলেন, আমরা ভারি ভুল করে ফেলেছি, দীনবন্ধু। সেদিন রাত্রিতে উনি হঠাৎ,–কিশোরবাবু, আমাদের অপরাধ আপনাকে মাপ করতে হবে, ভারি অন্যায় হয়ে গেছে। আমারই বোকামি—বোঝা উচিত ছিল। কিন্তু সবাই মিলে, বিশেষ অনুপম—এমন করতে লাগল যে, আমারও সন্দেহ হল, হয়তো—বলিতে বলিতে লজ্জায় থামিয়া গেলেন।

দীনবন্ধু বলিলেন, নাঃ, এরা খোলসা করে কিছু বলবে না দেখছি। কিশোর, তুমিই বলো হে, শুনি।

কিশোর কহিল, আমি তো কিছুই জানি না।

সুহাসিনী আবার উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল; কিশোরের দিকে একটা পরিহাস-তরল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, উনি কোত্থেকে জানবেন? আমি বলছি, শুনুন। বলিয়া সকৌতুকে ব্যাপারটা আগাগোড়া বিবৃত করিল।

গল্প শুনিয়া দীনবন্ধুবাবু হো হো করিয়া খুব হাসিতে লাগিলেন; কিশোরও সে হাসিতে যোগ দিল।

দীনবন্ধুবাবু কিশোরের উপর একবার চোখ বুলাইয়া বলিলেন, তা গুণ্ডার মত চেহারাখানা বটে, রাত-বিরেতে হঠাৎ দেখলে ডরিয়ে ওঠা বিচিত্র নয়। আরে, আমি যে সেদিন সায়েটিকার জন্যে

আসতেই পারলুম না, নইলে এ সব কোন ফ্যাসাদই হত না।

কিশোর সুহাসিনীর দিকে তাকাইয়া বলিল, আচ্ছা, সত্যি আপনারা সবাই আমাকে গুণ্ডা ভেবেছিলেন?

সুহাসিনী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, হ্যাঁ।

করুণভাবে কিশোর জিজ্ঞাসা করিল, আপনিও?

সহাস্যে সুহাসিনীও বলিল, হ্যাঁ—আমিও।

মস্ত একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কিশোর বলিল, আমার কপালই খারাপ দেখছি। অপরিচিত লোকে আমাকে দেখবামাত্র যদি গুণ্ডা মনে করেন, তাহলে আমার চেহারায় নিশ্চয়

মারাত্মক কোন দোষ আছে। বলিয়া দুঃখিতভাবে নিজের হস্ত-পদাদির দিকে দৃষ্টিপাত করিল।

সকলে হাসিয়া উঠিলেন।

দীনবন্ধু বলিলেন, কিশোর, দেখছ তো, বলবান হবারও অসুবিধা আছে। এ কথা আগে জানলে বোধ হয় ফুটবল হকি খেলে, জিমন্যাস্টিক করে সময়ের অপব্যয় করতে না।

কিশোর মাথা নাড়িয়া বলিল, আজ্ঞে না, কখনই করতুম না। কিন্তু এখন তো আর শোধরাবারও উপায় নেই, চিরজীবন এই ভয়াবহ শরীরটাকে বহন করে বেড়াতে হবে।

এই সব হাসি-তামাশার মধ্যে বিনয়বাবু আবার বেশ সুস্থ বোধ করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, কেন, কিশোরবাবুর তো বেশ ভাল চেহারা, পুরুষোচিত চেহারা! বাঙালীর ছেলের ঐ রকম শরীরই তো হওয়া চাই। কাঠির মত লিলিকে চেহারা আমি ভালবাসি না। যারা জীবন-যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে যাচ্ছে, যুদ্ধের উপযোগী স্বাস্থ্য না হলে তাদের চলবে কেন? যেমন লম্বা, তেমনই চওড়া—যাকে বলে ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুমহাভুজঃ। সেই রকম হওয়া চাই।

দীনবন্ধু বলিলেন, সে তো ঠিক কথা। কিন্তু আমাদের দেশের বাপ-মায়েদের ছেলেকে বিদ্বান করে তোলবার আগ্রহ এত বেশী যে, তার স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টি দেওয়া আর ঘটে ওঠে না।

এটি বিনয়বাবুর প্রিয় প্রসঙ্গ, তিনি উদ্দীপ্ত হইয়া বলিলেন, তুমি যথার্থ বলেছ, দীনবন্ধু! অথচ জা এই যে, শরীর ভাল রকম পুষ্ট না হলে মস্তিষ্ক কিছুতেই পুষ্টিলাভ করতে পারে না। শরীর থেকেই তো মস্তিষ্ক তার সারবস্তু আহরণ করবে। সেই শরীরই যদি পঙ্গু হয়ে রইল, তাহলে মস্তিষ্ক সর পাবে কোত্থেকে? এই কথাটা আমি বরাবর প্রচার করে এসেছি যখন কাজে ছিলুম, তখন সর্বদাই করতুম—যে, শরীর এবং বুদ্ধি দুইয়েরই সমান পুষ্টি হওয়া চাই, নইলে পরিপূর্ণ আস্ত মানুষটি তৈরি হয় না, একটিমাত্র পাল্লা-বিশিষ্ট তরাজুর মত অকর্মণ্যভাবে কেবল একদিকেই ঝুঁকে থাকে।

দীনবন্ধুবাবু কিশোরের পৃষ্ঠে হাত রাখিয়া বলিলেন, আপনি যে সত্য কথা প্রচার করেছেন, তার উদাহরণ আপনার সামনেই হাজির রয়েছে। এই ছেলেটির বাহিরটা যেমন নিরেট এবং প্রচুর পরিমাণে দৃষ্টিগোচর, ভিতরটিও তেমনি সবল ও সুগঠিত। ক্রমশ পরিচয় পাবেন।

উপর্যুপরি প্রশংসায় কিশোর লজ্জিত হইয়া পড়িতেছিল, তাই তাড়াতাড়ি বলিল, যে পরিচয় ওঁরা গোড়াতেই পেয়েছেন, তার বেশী পরিচয়ের বাসনা বোধ হয় নেই।

বিনয়বাবু বলিলেন, না না, সে কী কথা! ভুল তো আমাদেরই হয়েছিল, সেজন্যে আমরাই অপরাধী হয়ে আছি। এখন তো সত্যিকার পরিচয় হয়ে গেল, এখন মাঝে মাঝে আসলে আমি বড় খুশি হব।

গম্ভীরমুখে সুহাসিনীর দিকে ফিরিয়া কিশোর জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কী বলেন?

মৃদু হাসিয়া সুহাসিনী উত্তর করিল, আমিও তাই বলি।

অতঃপর একথা-সেকথায় আরও কিছুক্ষণ কাটিবার পর সকলে উঠিয়া পড়িলেন। বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া কিশোর সম্মুখে বিমলাকে দেখিয়া বলিল, সাবধান! আমি একজন গুণ্ডা!

বিমলা বলিল, সে কী। গুণ্ডা হলে আবার কবে থেকে?

কিশোর কহিল, সম্প্রতি হয়েছি। তোমার কাছে টাকাকড়ি যা আছে শিগগির বার করো, নইলে বিপদ ঘটবে।

বিমলা গম্ভীর হইয়া বলিল, তা বার কচ্ছি, কিন্তু মাসের বাকি কটা দিন আমার চলবে কী করে তা বলে দাও।

কিশোর হতাশ হইয়া বলিল, নাঃ, তোমার কাছে আমার গুণ্ডা হওয়া চলল না। গুণ্ডার সঙ্গে বুঝি অমনি করে কথা কয়?

বিমলা বলিল, তা কী করব, গুণ্ডার সঙ্গে এই প্রথম পরিচয়, ক্রমশ শিখে নিতে হবে তো?

কিশোর হাসিয়া বলিল, আজ ভারি মজা হয়েছে, ওপরে চলো, বলছি।

বিমলা তাহা বুঝিয়াছিল। উপরে গিয়া কাহিনী শুনিয়া সে রাগিয়া উঠিল, যা নয় তাই। না হয় খালি গায়ে খালি পায়েই ছিলে, তাই বলে কি সত্যি চোর-ডাকাতের মত চেহারা! কেমন ধারা তোক ওরা? চোখে কি দেখতে পায় না! বুড়োর না হয় ছানি পড়বার বয়স হয়েছে, কিন্তু ঐ যে মেয়েটার কথা বললে, সে-ও কি চোখের মাথা খেয়েছে না কি?

কিশোর বলিল, উঁহু, চোখ আছে–বেশ বড় বড়। তবে?

বিমলা হাসিয়া ফেলিল, না, ঠাট্টা নয়, সত্যি বলো তো ওরা কী রকম লোক? উদোমাদা নয় তো? আচ্ছা, মেয়েটার বয়স কত হবে বলো দেখি?

ঘাড় চুলকাইয়া কিশোর বলিল, তা সতেরো-আঠারো হবে—

বিয়ে হয়েছে?

বোধ হয় না। কপালে সিঁদুর দেখলাম না।

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বিমলা বলিল, অত বড় আইবুড়ো মেয়ে তোমার সামনে বেরুল? হ্যাঁ ঠাকুরপো, হিন্দু বটে তো?

কিশোর বলিল, কী জানি ভাই, ঠিক বুঝতে পারলুম না। তবে যে রকম ড্রয়িংরুম সাজাবার ঘটা, ব্রাহ্ম হওয়াও বিচিত্র নয়।

বিমলা বিজ্ঞভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, ঐ ঠিক বলেছ—বেম্মই হবে। বেম্মরা শুনেছি কেউ কেউ ঐ রকম হয়, সাদা কথা বুঝতে পারে না, চোখ খুলে দেখতে পায় না, আরও কত কী তোমার দাদা তামাশা করে বলতেন—

অকস্মাৎ তীর্থনাথের কথা অজ্ঞাতসারে বিমলার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়াতে তাহাদের প্রফুল্ল রহস্যালাপ যেন হেঁচকা দিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। যদিও কিশোর মনে মনে জানিত যে, দিবারাত্রির মধ্যে অন্তত কুড়ি ঘণ্টা স্বামীর চিন্তা সকল কাজকর্মের অন্তরালে বিমলার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, তবু কলিকাতায় আসিয়া অবধি সে ইঙ্গিতেও কখনও স্বামীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করে নাই। স্বামীর কথা সে আলোচনা করিতে চাহে না, একান্ত নিজস্ব করিয়া রাখিতে চায়, তাহা কিশোর বুঝিয়াছিল, তাই সে-ও কখনও তীর্থনাথের কথা তোলে নাই। কিন্তু আজ সকল আলোচনার উৰ্দ্ধস্থিত এই অন্তরতম কথাটি যখন বিমলারই মুখ দিয়া অতর্কিতে বাহির হইয়া পড়িল, তখন কিশোর যেন বিস্ময়ে ব্যথায় চমকিয়া উঠিল!

বিমলা ম্লানমুখে জানালার কাছে গিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিল।

কিশোর বিষণ্ণভাবে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া শেষে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, ভাত দেবে চলো, বৌদি! খিদে পাচ্ছে।

সে রাত্রিতে তাহাদের মধ্যে আর কোন কথা হইল না।

5

পরদিন কলেজ হইতে ফিরিবার পর জলযোগ করিতে বসিয়া কিশোর বলিল, ওরা ব্রেহ্ম নয়—হিন্দু।

বিমলা বলিল, কারা?—ওঃ, পাশের বাড়ির কথা বলছ? তা এরি মধ্যে খবর পেলে কোত্থেকে?

দীনবন্ধুবাবু বললেন বুঝি?

এক টুকরা লুচি মুখে পুরিয়া কিশোর বলিল, হুঁ।

অল্প হাসিয়া বিমলা জিজ্ঞাসা করিল, তা আর কী কী খবর নিলে? শুধু হিন্দু হলে তো চলবে না, কী জাত?

কিশোর লুচি চিবাইতে চিবাইতে কহিল, জাত বামুন-মুখুজ্জে।

বিমলা হাসিয়া বলিল, যাক, তবে তো সবই ভাল। এখন আমি গিয়ে একবার দেখেশুনে এলেই হয়।

সন্দিগ্ধভাবে বিমলার মুখখানা নিরীক্ষণ করিয়া কিশোর বলিল, তার মানে কী হল?

বিমলা বলিল, ঐ দেখো, চোরের মন বোঁচকার দিকে। মানে আবার কী হবে? নতুন প্রতিবেশী এসেছেন—সেদিন অত ভদ্রতা করলেন—ওঁদের বাড়ি গিয়ে ভাব-সাব আলাপ-পরিচয় করতে হবে না? সেই কথাই তো বলছি, একদিন গিয়ে দেখা-শুনা করে আসব।

উঁহু, কৈফিয়ত খুব জোরালো শোনাচ্ছে না। কথার মধ্যে কী একটা ইশারা ছিল, এবার সেটা সামলে নিলে।

কিছু সামলে নিইনি। তোমার মনে সন্দেহ, তাই ওকথা ভাবছ।

আর তোমার মনে সন্দেহের নামগন্ধও নেই?

না, তুমি আমার লক্ষ্মণ দেওর, তোমাকে কি সন্দেহ করতে পারি? বলিয়া সস্নেহ-কৌতুক-তরল দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিল।

কিশোর আহারে মন দিল।

দু-একটা অন্য কথার পর বিমলা জিজ্ঞাসা করিল, তোমার মুখ থেকে শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে, আচ্ছা ঠাকুরপো, মেয়েটি দেখতে কেমন?

এবার কিশোরের পালা, সে বলিল, কোন্ মেয়েটি?

কোন মেয়েটি আবার—পাশের বাড়ির মেয়েটি?

ও, কিশোর বিবেচনা করিয়া বলিল, কালো।

কার মত গায়ের রং হবে—আমার মত?

বললুম না কালো? তুমি কি কালো?

আচ্ছা, তবে আমাদের ঝির মত?

না, অতটা নয়। এই ধরো, আমার ওপর আরও দু পোঁচ।

বিমলা বিচারকের মত মুখ করিয়া বলিল, তাহলে কালো বলা চলে না–শ্যামবর্ণ।

বেশ, তবে শ্যামবর্ণই।

উজ্জ্বল শ্যামবর্ণও হতে পারে।

তা পারে, আশ্চর্য নয়।

আচ্ছা। আর মুখ-চোখ?—গড়ন?

কিশোর যেন চিন্তা করিতে করিতে বলিল, মুখ-চোখ—আছে। আর গড়ন যতদুর মনে পড়ছে—

না ঠাট্টা নয়। সত্যি বলো, মুখ-চোখ ভাল নয়?

কিশোর একটু গম্ভীর হইয়া বলিল, কি জানি বৌদি, আমি অত ভাল করে দেখিনি।

বিমলা বলিল, তুমি বড় লাজুক, ঠাকুরপো; ভাল করে মুখের পানে তাকাতেও পারনি বুঝি?

কিশোর তাড়াতাড়ি বলিল, না না, তাকাব না কেন? দেখতে মন্দ নয়—চলনসই। কিন্তু বৌদি, পারের বাড়ির মেয়ের সম্বন্ধে এসব আলোচনা করা কি উচিত? তোমার সম্বন্ধে যদি কেউ এভাবে। আলোচনা করত, আমার কিন্তু একটুও ভাল লাগত না।

আমরা মুখ মেয়েমানুষ, অমন আলোচনা করে থাকি। তাহলে মেয়েটি চলনসই?

অনিচ্ছাভরে কিশোর বলিল, হ্যাঁ।

বিমলা ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, ঠাকুরপো, আজ মেয়েটিকে আমি দেখেছি। আমার ঘরের গলির দিকের জানলা দিয়ে ওর শোবার ঘর দেখা যায়।

কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কিশোর বলিল, তবে আমাকে এত জেরা করলে কেন?

দেখছিলুম, সত্যি কথা বল কিনা।

আশ্চর্য হইয়া কিশোর বলিল, সত্যি কথা বলব না কেন?

কী জানি, যদি লুকোও।

তোমার মনের কথাটা কী বলল তো,বৌদি?

বিমলা বলিল, আমার মনের কথা আবার কী? তোমার মনের কথাই জানতে চেয়েছিলুম।

আমার মনের কথা হচ্ছে এই যে, একটি ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপ হয়েছে, কিন্তু তার নাক, মুখ, চোখ, রঙ, গড়ন কেমন—এ নিয়ে আমি মনে মনেও কোনরকম আলোচনা করিনি।

মনে মনে হাসিয়া বিমলা বলিল, তা তো দেখতেই পাচ্ছি–নইলে আর চলনসই বলতে না। রঙ ময়লা হোক–কিন্তু মেয়েটি সত্যিই সুন্দরী, ঠাকুরপো। মহাভারত পড়েছ তো?

স্বয়ংবরসভা মনে আছে—যে বিন্ধিবে লভিবে সে কৃষ্ণা গুণবতী! ওকে একবার দেখেই মনে হল ও সেই কৃষ্ণা গুণবতী, যার জন্যে আর্যাবর্তের রাজারা সব উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন। সে-ও কালো ছিল, ঠাকুরপো।

কিশোর কোন উত্তর না দিয়া গম্ভীর মুখে উপরে উঠিয়া গেল। ভ্রমণোপযোগী জামা কাপড় পরিয়া, ছড়ি হাতে সে নামিয়া আসিতেই বিমলা বলিল, এই নাও, পান ধরো। আর মুখগোমড়া করে থাকতে হবে না। মেয়েমানুষ মেয়েমানুষের সম্বন্ধে অমন জিজ্ঞেস করে—ওতে দোষ হয় না। নাও, এবার হাসো তো দেখি।

কিশোর হাসিয়া ফেলিল, না বৌদি, এ ভারি অন্যায়—

আচ্ছা, আচ্ছা, অন্যায়। কিন্তু তুমিও এবার থেকে আমার কাছে সত্যি কথা বোলোলুকিও না।বলিয়া হাসিতে হাসিতে কলঘরের দিকে প্রস্থান করিল।

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

6

দিন আট-দশ পরের কথা। হঠাৎ গুমট গরম শেষ হইয়া বর্ষা নামিয়াছে। কদিন ধরিয়া মেঘগুলা আকাশের চারিপাশে ঘুরিয়া জটলা পাকাইয়া ষড়যন্ত্র করিতেছিল, আজ দ্বিপ্রহরে সকলে একজোট হইয়া প্রবলবেগে বর্ষণ শুরু করিয়া দিল। সেইসঙ্গে ঠাণ্ডা বাতাস দিয়া শহরের তাপক্লিষ্ট অর্ধসিদ্ধ মানুষগুলার অঙ্গে যেন অমৃত সিঞ্চন করিয়া দিতে লাগিল।

কিশোর ভিজিতে ভিজিতে কলেজ হইতে বাড়ি ফিরিল। বিমলা জানিত, সে ছাতা লইয়া যায় নাই, তাই আগে হইতেই জামাকাপড়, তোয়ালে ইত্যাদি ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। সে বলিল, খুব ভিজেছ তো? নাও, এখন তাড়াতাড়ি ওগুলো ছেড়ে ভোয়ালে দিয়ে গা মোছছ। ছাতা নিয়ে। বেরুলে বুঝি কোট-প্যান্টুলুনের অপমান হয়?

ভিজা জুতা-মোজা খুলিতে খুলিতে অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সহিত কিশোর বলিল, আজ খুব ভিজেছি। কিন্তু আশা মেটেনি, খালি গায়ে বিষ্টিতে ভিজতে না পারলে আরাম হয় না। বলিয়া

কোট ও কামিজ খুলিয়া মাটিতে ফেলিল।

বিমলা বলিল, আচ্ছা, আর একদিন ভিজো। এখন আগে শুকনো তোয়ালে নিয়ে গা-মাথা মুছে। ফেলো তো। আমি এইখানেই তোমার খাবার নিয়ে আসছি।

খালি গায়ে প্যান্টুলুন পরিয়া কিশোর হঠাৎ লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, বৌদি, চলো, দুজনে তেতলার ছাদে উঠে খানিক ভিজি গে।

বিমলা বলিল, অ্যা। আবার ভিজবে। এই না সারাটা পথ ভিজে এসেছ? না না, আর ভিজলে অসুখ করবে।

কিশোর আবদার করিয়া বলিল, লক্ষ্মীটি বৌদি, একবার চলল। বেশী নয়—পাঁচ মিনিট। প্রথম বর্ষা নেমেছে, আজ ভিজলে কি অসুখ করে? অন্তত আমার করবে না। ভিজতে ভারি ইচ্ছে করছে বৌদি, চলো!

বিমলার চক্ষু দিয়া সস্নেহ কৌতুক ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, সে বলিল, কী ছেলেমানুষী বলো তো! তুমি কি স্কুলের ছেলে যে, ক্লাস পালিয়ে জলে ভিজতে যাবে?

গলায় প্যান্টুলুন দিয়ে বলছি বৌদি, চলো।

কিন্তু আমার যদি ভিজে চুলে থেকে অসুখ করে—

না করবে না বলিয়া মহানন্দে হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে বিমলাকে উপরের খোলা ছাদে সে ইয়া চলিল।

খালি গা, খালি পা, কেবল প্যান্টুলুন-পরা কিশোর বিমলাকে টানিয়া মুক্ত ছাদের বৃষ্টিধারার মধ্যে র্পণ করিয়াই সোল্লাসে উচ্চকণ্ঠে আরম্ভ করিল—

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভরভসে
ঘন গৌরবে নবযৌবনা—

হঠাৎ কিশোর থামিয়া গেল।

থামলে যে— বলিয়া কিশোরের ত্রস্ত দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া বিমলা দেখিল, গলির অপর পারের হর একটি বাড়ির ছাদের উপর দাঁড়াইয়া শ্যামশ্রীমতী বর্ষার মতই আর-একটি নবযৌবনা তরুণী চুল খুলিয়া দিয়া উর্ধ্বমুখী হইয়া যেন এই নববারিধারা সর্বাঙ্গ দিয়া গ্রহণ করিতেছে।

কিশোরের কাব্যোস্ফস কানে যাইতেই সুহাসিনী চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল। ক্ষণেকের জন্য কিশোর হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু পরক্ষণেই একবার নিজের অর্ধনগ্ন মূর্তির দিকে সত্রাস দৃষ্টিপাত করিয়া বিমলাকে ছাড়িয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে সিঁড়ি দিয়া পলায়ন করিল।

বিমলা নিজের ঘরে গিয়া ভিজা থান ও শেমিজ বদলাইয়া আসিয়া দেখিল, কিশোর শুষ্ক জমা কাপড় পরিয়া আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া চুল আঁচড়াইতেছে।

সে মুখ টিপিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কী? পালিয়ে এলে যে?

কিশোর বলিল, দেখ বৌদি, আজ রাত্তিরে কিন্তু খিচুড়ি রাঁধতে হবে। মুসুর ডালের খিচুড়ি আর হাঁসের ডিম, আর কিছু নয়।

বিমলা বলিল, আচ্ছা খিচুড়ি না হয় হবে, কিন্তু অমন উর্ঠিকী পড়ি করে পালিয়ে এলে কেন, সেটা তো আগে বলো।

পালিয়ে আবার কখন এলম? তোমার যেমন কথা। আমি তো আস্তে আস্তে নেমে এলুম।

তাই বুঝি? ওর নাম আস্তে আস্তে নেমে আসা? আমি ভাই সেটা বুঝতে পারিনি, মনে করেছিলুম, বুঝি পালিয়ে এলে।

কিশোর লজ্জিত মুখে বলিল, আচ্ছা, তুমিই বলো বৌদি, লজ্জা হয় না? কী বেশে আমি ছিলুম। বলো তো? শুধু একটা প্যান্টুলুন। ঐ বেশে ভদ্রমহিলার কাছে ধরা পড়লে সঙ্কোচ হয় না?

কিন্তু আমিও তো একজন ভদ্রমহিলা, আমাকে দেখে তো একটুও লজ্জা হল না। হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেলে!

হ্যাঁ, তুমি আবার ভদ্রমহিলা হতে গেলে কোন দুঃখে? তুমি তো বৌদি।

বৌদির বুঝি ভদ্রমহিলা হতে নেই?

না। বৌদি স্রেফ বৌদি।

কিশোর নিজ মনে কিছুক্ষণ যেন গবেষণা করিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, কী আশ্চর্য, বৌদি! তুমি হাজ বললে বলে খেয়াল হল কিন্তু তোমার কাছে যে সঙ্কোচ করে সম্ভ্রম করে চলা দরকার, এ কখনও আমার মনেই হয়নি। এক দিনের জন্যও ভাবিনি যে, তুমি আমার পর, তোমার কাছ থেকে সন্তর্পণে নিজেকে ঢেকে রাখা উচিত। আচ্ছা, কেন এমন হল? আমি তো ভেবেচিন্তে কিছুই করিনি।

বিমলা কথা কহিতে পারিল না, তাহার দুই চক্ষু সহসা জলে ভরিয়া উঠিল।

কিশোর কতক নিজমনেই বলিতে লাগিল, আর তাই বা আশ্চর্য কেন? আপনার লোকের কাছে। আবার লজ্জা সঙ্কোচ কে করে থাকে! যারা পর, যাদের সঙ্গে শুধু মুখের আলাপ, তাদের জন্যেই না ঐ সব! তোমাকে তো প্রথম দিন থেকেই পর বলে মনে করতে পারিনি। কী জানি কী করে মনে বসে গিয়েছিল যে, তুমি আমার নিতান্ত আপনার। আমার নিজের বড় দিদি বা ছোট বোন নেই, মাকেও ভাল করে মনে পড়ে না, কিন্তু তাঁরা যদি থাকতেন, তা হলেও বোধ হয়, তাঁদের তোমার চেয়ে বেশী আপনার বলে মনে করতে পারতুম না। এই বলিয়াই একটা গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

বিমলার গণ্ড বহিয়া ঝরঝর করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, ঠাকুরপো, লোক-দেখানো কথা নয়, সত্যিই আমি তোমার দিদি—আমি তোমার ছোট বোন। তুমি আমার আপনার মার পেটের ভাই। উঃ তোমাকে না পেলে আমি যে কী করতুম! বলিয়া নিজেকে আর সংবরণ করিতে না পারিয়া বিমলা অঞ্চলে চক্ষু আবৃত করিয়া দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বিমলার অন্তরের নিগুঢ় আবেগকে এমন করিয়া নাড়া দিয়া জাগাইয়া তুলিবার ইচ্ছা কিশোরের ছিল না এবং কেন যে তাহার মত স্বভাবত চাপা লোক এতগুলা মনের অন্তরতম কথা ঝোঁকের মাথায় বলিয়া ফেলিল, তাহাও সে বুঝিতে পারিল না। কিন্তু আজ এই আকস্মিক বর্ষাগমে তাহার মনের মধ্যে কী এক বিপর্যয় ঘটিয়াছিল, তাই বিমলার স্নেহোগত চোখের জল তাহাকে দুঃখ না দিয়া যেন কানায় কানায় ভরিয়া দিয়া গেল। সে জানালা খুলিয়া দিয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া পরিপূর্ণ হৃদয়ে ভাবিতে লাগিল, কী অদ্ভুত বস্তু এই নারীর হৃদয়। ইহার ভালবাসার পরিধির মধ্যে আত্মপর বিচারের এতটুকু স্থান নাই। ভগিনীরূপে-মাতৃরূপে-পত্নীরূপে যখনই সে ভালবাসিয়াছে, তখনই সম্ভব-অসম্ভবের গণ্ডী ছাড়াইয়া, শত বাধাবিঘ্ন মাড়াইয়া স্বচ্ছন্দে অবহেলে চলিয়া গিয়াছে, দেহ দিয়াছে, প্রাণ দিয়াছে, ইহকাল-পরকাল দিয়াছে, তবু ভালবাসার এক বিন্দু লাঘব করে নাই। শৈশব হইতেই নারীর স্নেহ-ভালবাসা পাইবার সুযোগ কিশোরের হয় নাই, কিন্তু এতকাল এ অভাব সে ভাল করিয়া অনুভব করিতে পারিত না। আজ তাহার পূর্ণ-যৌবনের ভরা আকাঙক্ষার দিনে কোথা হইতে এই একান্ত নিঃসম্পর্কীয়া রমণী আসিয়া ভাই বলিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইল এবং ভগিনীর অপরাজেয় দাবি জানাইয়া দুটি অর্ধস্ফুট অবরুদ্ধ কথায় নিজের বুভুক্ষিত অন্তর উদঘাটিত করিয়া দেখাইয়া দিল! নিজের দিক হইতে

কিশোর যে বিমলাকে পরমাত্মীয়ের দৃষ্টিতে দেখিয়াছে, তাহাকেও ছাপাইয়া ভাসাইয়া তাহার প্রতি বিমলার এই বিপুল স্নেহের পরিচয় কিশোরের হৃদয়কে একেবারে প্লাবিত করিয়া দিল। পুলকিত রসাপ্লুত অন্তরে সে ভাবিতে লাগিল বৌদিদি তাহাকে এত ভালবাসেন। —ঠিক নিজের ভাইয়ের মত! সে-ও তো তাঁহাকে আপনার ভগিনীর মতই দেখে কিন্তু ওঁর তুল্য ভালবাসা তাহার দ্বারা সম্ভব নহে। সমস্ত মন প্রাণ ঢালিয়া এমন করিয়া ভালবাসা, পুরুষ তো দূরের কথা কয়জন স্ত্রীলোকই বা পারে? কি রূপে, কি গুণে, তাহার এই বৌদিদি একেবারে অদ্বিতীয়, কোথাও তাঁহার দোসর নাই। একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, কী স্ত্রী-ই তীর্থদা হারাইয়াছে!

কিশোরবাবু, আজ আর কোথাও বেরুবেন নাকি? তার চেয়ে আসুন না, এইখানে বসেই গল্পসল্প করা যাক।

কিশোরের চিন্তার জাল ছিন্ন হইয়া গেল, সে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, বিনয়কৃষ্ণবাবু নিজের বাড়ির জানালায় দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছেন।

এই কয়দিনের মধ্যে তাঁহাদের সহিত কিশোরের বেশ ঘনিষ্ঠতা হইয়া গিয়াছিল। বালকের মত সরল বৃদ্ধটিকে সে মনে মনে বড় শ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এতখানি পাণ্ডিত্যের সহিত এতটা ছেলেমানুষী যেমন তাহার কৌতুকপ্রদ বোধ হইত, তেমনই তাঁহার নিরহঙ্কার সহজ শিষ্টতা এবং ছোট বড় নির্বিশেষে সকলের সহিত সমান ব্যবহার তাহার প্রীতিও আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিল।

সে হাসিয়া বলিল, যেতে পারি, কিন্তু আজকের দিনে গরম গরম মুড়ি চালভাজা খাওয়ানো চাই।

বিনয়বাবু মুখখানা নিরাশ করিয়া বলিলেন, এত বড় আশ্বাস কি আমি আপনাকে দিতে পারব? আর দিলেও যদি কথা না রাখতে পারি। সংসারের ঐ বিভাগটি আমার এলাকায় নয়। একটু হাসিয়া বলিলেন, আর বাকি সব বিভাগই যেন আমার এলাকায়। তা যাক, সুহাসকে জিজ্ঞাসা করে দেখি। শেষে রোখের মাথায় কথা দিয়ে ফেলে অপদস্থ হব।

সুহাসিনী বোধ হয় ঘরের মধ্যেই ছিল, তাহার কণ্ঠস্বর শুনা গেল, উনি আসুন তো। তারপর দেখা যাবে।

বিনয়বাবু বলিলেন, শুনতে পেলেন তো? এরকম ভাসা-ভাসা অনিশ্চিতের উপর নির্ভর করে যদি আসতে রাজী থাকেন তো বলুন।

আচ্ছা, ওতেই হবে বলিয়া কিশোর নামিয়া গেল। কিশোরের জুতার শব্দ শুনিয়া বিমলা রান্নাঘর হইতে ডাকিয়া বলিল, ঠাকুরপো, খাবার খেয়ে বেরোও।

বিনয়বাবুর কাছ থেকে এইমাত্র নিমন্ত্রণ পেলুম। এখন আর কিছু খাব না, বৌদি! বলিয়া কল বাহির হইল।

বিনয়বাবুর ড্রয়িংরুমে বসিয়া তাঁহার সহিত একথা-সেকথা আলাপ করিতে করিতে মিনিট পনেরো কাটিবার পর, থালার উপর একরাশ চিড়াভাজা, মাড়োয়ারীর দোকানের ডালমুট ও পাঁপরভাজা লইয়া সুহাসিনী প্রবেশ করিল। টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল, আপনার ফরমাশ-মত হল না, কিন্তু ঘরে আর কিছু ছিল না।

কিশোর খাদ্যদ্রব্যগুলির উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, একেই বলে, পিপাসিত হয়ে চাহিলাম বারি, এনে দিল মকরন্দ! কোথায় চেয়েছিলুম মুড়ি চালভাজা, এল কিনা পাঁপরভাজা ডালমুট!–কিন্তু একটা পাত্রেই কি সকলের চলবে।

সুহাসিনী বলিল, বাবা তো খাবেন না, ওঁর সহ্য হয় না।

কিশোর চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, তবে কি আমি একাই এতগুলো খাব? আমার শরীরের আয়তন আর একটু বড় হলে কি আপনি আমাকে রাক্ষস মনে করলেন? আমি কি ফাঁপা?

না না, আপনি আরম্ভ করুন না। খেতে না পারেন পড়ে থাকবে।

বেশ, কিন্তু নষ্ট হলে দোষ দেবেন না।

আপনি বোধ হয় চা খান, কিন্তু ঐ জিনিসটা দিতে পারলুম না। আমরা কেউ চা খাইনে।

মাথা নাড়িয়া কিশোর বলিল, আমিও না। ওটা কোন কালেই বরদাস্ত হয় না।

খাওয়া এবং গল্প চলিতে লাগিল।

বিনয়বাবু বাহিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, জল থেমেছে দেখছি। পুরো চার ঘণ্টা একদমে বৃষ্টি হল।

কিশোর চকিতের ন্যায় একবার সুহাসিনীর দিকে চোখ তুলিয়া আবার চিড়াভাজায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিল, হ্যাঁ, এ বৃষ্টিটার দরকার হয়ে পড়েছিল, গরম যেন আর সহ্য হচ্ছিল না।

বিনয়বাবু বলিলেন, দেখো, আমাদের দেশে এই বর্ষার আগমন একটা অদ্ভুত জিনিস, অন্য কোথাও এমনটি পাবে না। সেই প্রাচীনকাল থেকে কত কবিই না এর কথা লিখে গেছেন, কিন্তু আজও তার শেষ হয়নি। অসহ্য গরমে মানুষ পুড়ে যাচ্ছিল, গাছপালা শুকিয়ে উঠেছিল, নদী কেবল বালুসার হয়ে পড়েছিল, এমন সময় কোথা থেকে মেঘ এসে আকাশ অন্ধকার করে দিল, প্রবল জলধারায় পৃথিবী ঠাণ্ডা হয়ে গেল। এই দ্রুত পট পরিবর্তনে মানুষের মনে এমন একটি খুশির ভাব জেগে উঠে যে, তার আত্মার উল্লাস শত শত কাব্যে গানে প্রকাশ হয়ে পড়ে। আরও কত বাবে যে এই সহসা-মুক্ত মানব-মন আত্মপ্রকাশ করে তার ইয়ত্তা নেই।

ঠিক কথা বলিয়া কিশোর এবার আর সুহাসিনীর দিকে তাকাইল না। তাহার নিজের সহসা-মুক্ত মানব-মন সম্প্রতি যে কিভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল তাহা যদি সুহাসিনী ছাদের উপর হইতে দেখিয়া ফেলিয়া থাকে তবে আপাতত তাহার সহিত চোখাচোখি হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে।

বিনয়বাবু বলিতে লাগিলেন, সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে আমার ভাল পরিচয় নেই, কিন্তু যেটুকু আছে তা থেকে বুঝতে পারি যে, তার ঋতুবর্ণনার মধ্যে বর্ষা ঋতুই চৌদ্দ আনা স্থান জুড়ে আছে। সেকালের কবিরা যেন সব ঋতুকে ছেড়ে বর্ষাকেই বেশী করে বুকে টেনে নিয়েছিলেন। আর শুধু সেকালে কবিই বা বলি কেন? একালের রবীন্দ্রনাথের কথাই ধরো—তাঁর গানে কি বর্ষার সুর বেশী করে বাজেনি?

কিশোর বলিল, রবীন্দ্রনাথকে একেলে কবি বলবেন না, আমাদের দেশের তরুণরা তাহলে ভয়ঙ্কর চটে যাবে।

বিস্মিত হইয়া বিনয়বাবু বলিলেন, চটে যাবেন কেন?

ওর মধ্যে কেন নেই। চটে যাওয়াই তাঁদের স্বভাব।

বিনয়বাবু বুঝিতে পারিলেন না। তখন কিশোর তরুণদের মনোভাব তাঁহাকে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া বলিল। বৃদ্ধের মনে সত্যকার কাব্যরসবোধ ছিল, তিনি ব্যথিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, না না, ও হতেই পারে না, কিশোরবাবু। আমাদের দেশের নূতন

সাহিত্যিকরা রবীন্দ্রনাথের কাব্য উপভোগ করতে পারেন না এ কথা আমি ভাবতেই পারি না। রবীন্দ্রনাথ আর বঙ্কিমবাবুকে বাদ দিলে আমাদের ভাষায় কি থাকে বলুন দেখি?

কিছু না—বলিয়া কিশোর সহসা নিজের সম্মুখস্থ থালার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, কিন্তু এ দিকেও যে কিছু নেই দেখছি! এ কী রকম হল? সত্যিই কি সব খেয়ে ফেললুম নাকি?

মৃদু হাসিয়া সুহাসিনী বলিল, হ্যাঁ, অন্যমনস্ক হয়ে খেয়ে ফেলেছেন। কিশোর দুঃখিতভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, ভেবেছিলুম কম খেয়ে আপনাদের কাছে প্রশংসা অর্জন করব! কিন্তু আমার ভাগ্যই খারাপ, নিজের প্রকৃত স্বরূপ আমি চেপে রাখতে পারি না, অসাবধানে প্রকাশ হয়ে পড়ে।

চাকর আসিয়া শূন্য থালা-গেলাস লইয়া যাইবার পর কিশোর রুমালে মুখ-হাত মুছিতে মুছিতে বলিল, এবার তাহলে মধুরেণ সমাপয়েৎ করুন—একটা গান হোক। সেদিন অধপথে আপনার গানে বাধা দিয়ে অবধি মনের গ্লানি কিছুতেই মুছে ফেলতে পারছি নে।

সুহাসিনী বলিল, তাই গান শুনে বুঝি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চান?

কিশোর উত্তর করিল, এমনও তো হতে পারে গঙ্গাস্নান করে পাপ ধুয়ে ফেলতে চাই।

বিনয়বাবু বলিলেন, বেশ তো, বেশ তো, একটা গাও না, সুহাস।

সুহাস অগানের কাছে গিয়া বসিল। কিছুক্ষণ লঘুস্পর্শে পদাগুলির উপর আঙ্গুল চালাইতে চালাইতে হঠাৎ পূর্ণকণ্ঠে গাহিয়া উঠিল—

আমার নিশীথরাতের বাদলধারা
এসো হে–গোপনে—

কিশোরের মন আজ পূর্ব হইতেই নানা কারণে ছায়ানিবিড় ও রসঘন হইয়া ছিল, সুহাসিনীর কণ্ঠস্বর তাহার মধ্যে যেন তড়িবিকাশের মত চমকিয়া চমকিয়া উঠিতে লাগিল। সে মুখ নীচু করিয়া একাগ্র তন্ময় হইয়া শুনিতে লাগিল—

একলা ঘরে চুপে চুপে
এসো কেবল সুরের রূপে–
দিয়ো গো, দিয়ো গো,
আমার চোখের জলের দিয়ে সাড়া ॥

গান থামিলে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কিশোর যেন কোন স্বপ্নলোক হইতে ফিরিয়া আসিল। তন্দ্রাবিষ্ট কণ্ঠে বলিল, কি সুন্দর আপনার গলা! আমি ডুবে গিয়েছিলুম।

ইহা যে মামুলি চাটুবাক্য নহে, মুগ্ধ হৃদয়ের স্বতরুৎসারিত স্তুতি, তাহা বুঝিতে পারিয়া সুহাসিনীর মুখখানি রাঙা হইয়া উঠিল। কোনমতে লজ্জা দমন করিয়া সে বলিল, এবার আপনি একটা গান। করুন।

চমক ভাঙ্গিয়া কিশোর বলিল, আমি গান করব? আমি তো গাইতে জানি না।

ছদ্ম গাম্ভীর্যের সহিত সুহাসিনী বলিল, জানেন বৈকি। তখন যে ছাদের উপরে গাইছিলেন।

এবার কিশোরের লাল হইবার পালা, সেকার্য সে ভাল করিয়াই করিল। কর্ণমূল পর্যন্ত রক্তবর্ণ হইয়া কোন রকমে বলিল, অ্যাঁ–ও—আপনি শুনেছিলেন বুঝি? তা সে তো গান নয়। কী মনে হল তাই একটা কবিতা আওড়াচ্ছিলুম—আজ এই হঠাৎ বৃষ্টি হয়ে—আপনিও তো ছাদে দাঁড়িয়ে ভিজছিলেন–বাদলার ছোঁয়াচ তো আপনারও–

তাহাকে এই বিপন্ন অবস্থা হইতে মুক্তি দিবার জন্যই যেন এই সময় সাহেববেশী অনুপমচন্দ্র ঘরে প্রবেশ করিল।

ওয়াটারপ্রুফ ও টুপি বাহিরে টাঙ্গাইয়া ঘরে ঢুকিতেই সম্মুখে কিশোরকে দেখিয়া অনুপম মুখখানা অন্ধকার করিয়া বিনয়বাবুর পাশে গিয়া বসিল। চেষ্টা করিয়া মুখে একটু শুষ্ক হাসি আনিয়া বলিল, একটা কাজে এদিকে এসেছিলুম, তাই ভাবলুম দেখা করে যাই।

7

সেই প্রথম দিনের সাক্ষাতের পর, ইতিমধ্যে এই বাড়িতেই কিশোরের সহিত অনুপমের আরও দুই তিনবার দেখা হইয়াছে। কিশোর যে চোর-ডাকাত নহে, সত্য সত্যই একজন ভদ্রলোক, ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইয়া যাইবার পর অনুপমকে অনেক হাসি তামাশা, বিদ্রূপ ও গঞ্জনা সহ্য করিতে হইয়াছিল। সর্বাপেক্ষা বেশী খোঁচা দিয়াছিল সুহাসিনী। তাহার ভুরু দেখিয়া মানুষ চিনিবার ক্ষমতা সম্বন্ধে চোখাচোখা দুই-চারিটি কথা বলিয়া তাহার সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরাইয়া দিয়াছিল। এই কারণে কিশোরের উপর অনুপম প্রসন্ন ছিল না। গুণ্ডার পরিবর্তে কলেজের প্রফেসর বনিয়া গিয়া কিশোর। যে তাহাকে সুহসিনী ও তাহার পিতার কাছে অত্যন্ত খেলো করিয়া দিয়াছে, এ আক্রোশ সে কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিল না। সর্বোপরি আরও একটা কারণ হইয়াছিল—যাহাতে কিশোরের বিরুদ্ধে তাহর মন একেবারে বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

কয়েক বৎসর পূর্বে বিনয়বাবু যখন প্রথম কলিকাতায় আসিয়া হাতিবাগান অঞ্চলে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার স্ত্রীর সহিত নিকট প্রতিবেশিনী অনুপমের মাতা হেমাঙ্গিনীর শীঘ্রই আলাপ জমিয়া উঠিয়াছিল। ইহারাও আলোকপন্থী হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিলেও পর্দাপ্রথার ধার রিতেন না। তাহার উপর হেমাঙ্গিনী বিধবা হইলেও খুব জবরদস্ত স্ত্রীলোক, অপরিণতবয়স্ক পুত্রের উ নির্ভর না করিয়া নিজেই স্বর্গীয় স্বামীর বিষয় সম্পত্তি পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। সুত্রং সুহাসিনীর মাতার সহিত তাঁহার আলাপ বন্ধুত্বে পরিণত হইতে বিলম্ব হইল না। সেই সুত্রে অনুপম এ বাড়িতে যাতায়াত

শুরু করিল। কিন্তু বন্ধুর পুত্র হইলেও বিনয়বাবুর স্ত্রী তাহাকে হাসিনীর কাছে বেশী ঘেঁষিতে দিতেন না। এই অকালপক্ক নিরতিশয় জ্যাঠা ছোকরাকে তিনি গোড়া হইতেই দেখিতে পারিতেন না; এবং এই জন্যই পাছে পরে কোনরূপ গোলমাল হয়, সুহাসিনীকে তাহার সংস্পর্শ হইতে দূরে দূরে রাখিতেন।

কিন্তু ঠিক সঙ্কট সময়েই তিনি হঠাৎ মারা গেলেন। সুহাসিনীর বয়স তখন পনেরো বছর; অনুপমের তেইশ। অনুপম ঘন ঘন যাতায়াত আরম্ভ করিয়া দিল এবং সুহাসিনীকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করিবার বিধিমত চেষ্টা করিতে লাগিল। সে তখন আইন পাস করিয়াছে এবং পিতৃবন্ধু এক অ্যাটর্নির অফিসে কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সুতরাং সে যে সুহাসিনীর যোগ্য পাত্র, সে বিষয় কি তাহার মনে, কি তাহার মাতার মনে কোন সন্দেহ ছিল না। বিনয়কৃষ্ণবাবুর কিন্তু ওদিকে দৃষ্টি ছিল না, পত্নীর মৃত্যুতে তিনি দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। এইভাবে বছরখানেক কাটিবার পর শোকের প্রথম ধাক্কাটা কিছু প্রশমিত হইলে, হেমাঙ্গিনী আসিয়া কথায় কথায় যখন তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিয়া গেলেন যে, সুহাসিনীর বিবাহের বয়স হইয়াছে,এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অনুপমচন্দ্র আসিয়া ভাবে ভঙ্গিতে জানাইয়া দিল যে, এই কন্যাটির পাণিগ্রহণ করিতে সে অনিচ্ছুক নহে, এমন কি বিশেষ ইচ্ছুক, তখন বিনয়বাবু চমকিত হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। জগতে এই এক কন্যা ছাড়া তাঁহার আর কেহ নাই, সেই কন্যাকেও যে শীঘ্রই বিবাহ দিয়া পরের হাতে তুলিয়া দিতে হইবে, তাহা স্মরণ করিয়া এর বুক প্রায় ভাঙিয়া গেল। কিন্তু নিজের সুখ-সুবিধার জন্য কন্যাকে তো চিরকাল কুমারী করিয়া রাখা যায় না! তাই একদিন ভারাক্রান্ত বুকে তিনি কন্যার সম্মুখে কথাটা পাড়িলেন। কিন্তু বিবাহের নাম শুনিয়াই সুহাসিনী তাঁহার বুকের উপর পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে

আরম্ভ করিল এবং অস্ফুটভাবে যাহা বলিল, তাহা হইতে এইটুকুই বুঝা গেল যে, পিতাকে ছাড়িয়া সে কোনমতেই কোথাও যাইতে পারিবে না।

সেই অবধি পিতাপুত্রীর মধ্যে ও প্রসঙ্গ আর উঠে নাই। কিন্তু অনুপম তিলমাত্র হতাশ না হইয়া অপরিসীম ধৈর্য সহকারে লাগিয়া আছে। সম্প্রতি তাহার মনে একটা আশাও জাগিয়াছিল যে, শীঘ্রই ইহার একটা নিষ্পত্তি হইতে পারে। সুহাসিনীর জন্মতিথির রাত্রিতে সে একটা সঙ্কল্প মনে মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল।

এমন সময় কোথা হইতে পাপগ্রহের মত কিশোর আসিয়া উদয় হইল, তখন আশঙ্কায় দুর্ভাবনায় অনুপমের মনে তিলমাত্র সুখ রহিল না। এতদিন সে, সুহাসিনী তাহারই বাগদত্তা, এমন একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়া অন্যান্য সম্ভব অসম্ভব প্রতিদ্বন্দ্বীকে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিল; কিন্তু কিশোরকে সে কী করিয়া ঠেকাইবে, কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। কিশোর সুহাসিনীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াই যে ইহাদের সহিত মেলামেশা আরম্ভ করিয়াছে, এ কথা বলা চলে না। বরং অপরপক্ষ হইতেই মিশিবার আগ্রহটা যেন একটু বেশী। গোবেচারা বিনয়বাবু গায়ে পড়িয়া তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে উৎসুক, এবং সুহাসিনীও—

সুহাসিনীর ব্যবহারই অনুপমকে সর্বাপেক্ষা বেশী আঘাত করিয়াছিল। কয়েক বৎসর ধরিয়া সে সুহাসিনীর পাশে পাশে ফিরিতেছে এবং নানা কৌশলে তাহাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। সুহাসিনীও তাহার সহিত বাড়ির লোকের মত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছে, কিন্তু এত মাখামাখি সত্ত্বেও কোথায় যে একটা অলক্ষ্য সীমারেখা

রহিয়া গিয়াছিল, অনুপম তাহা অতিক্রম করিতে পারে নাই। সুহাসিনীর মনের অলঙ্ঘনীয় কৌমার্যের গণ্ডীর মধ্যে সে কোনদিন পা বাড়াইতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু এখন সে সন্দেহের দূরদৃষ্টি দিয়া দেখিল যে, এতদিনে সে যাহা পারে নাই, আর একজন লোক দুই হপ্তার মধ্যে সেই গণ্ডীর মধ্যস্থলে ন্যায্য অধিকার স্থাপন করিবার বন্দোবস্ত করিতেছে। সে দেখিতে পাইল, যে দ্বার তাহার কাছে চিরদিন রুদ্ধ ছিল, সেই দ্বারে দাঁড়াইয়া সুহাসিনী সলজ্জ স্মিতহাস্যে আর একজনকে ভিতরে পদার্পণ করিবার জন্য আহ্বান করিতেছে। ইহাতে সে উদ্বেগ ও ঈর্ষার জ্বালায় নিরন্তর ছটফট করিতে লাগিল, কিন্তু বাহিরে তাচ্ছিল্য দেখাইয়া এমন ভাব প্রকাশ করিতে লাগিল, যেন তাহার দীর্ঘ-প্রতিষ্ঠিত প্রভাব অক্ষুণ্ণই আছে, কোন নবাগত উমেদার তাহার উপর আঁচড়টি কাটিতে পারে নাই।

আজ এই বাদল সন্ধ্যায় হঠাৎ একটা আশঙ্কা মনে উদয় হওয়াতে সে ঝড়বৃষ্টি ভেদ করিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছিল এবং এ বাড়িতে প্রবেশ করিবামাত্র যখন সে কিশোরের গলা শুনিতে পাইল, তখন একপ্রকার মরিয়া হইয়াই স্থির করিল যে, আর বিলম্ব নহে, আজই একটা হেস্তনেস্ত সে করিয়া ফেলিবে।

অনুপম আসন গ্রহণ করিলে বিনয়বাবু সরলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই দুযোগে কী এমন কাজ ছিল যে বেরুতে হল?

প্রশ্নটা এড়াইয়া গিয়া অনুপম মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, বিষ্টি পড়ে কলকাতা শহরটা হয়ে দাঁড়িয়েছে যেমন নোংরা, তেমনই প্যাচপেচে। এখন থেকে দুমাস ধরে এই কাদা আর বিষ্টি চলল। রেনি সীজনের মত এমন যাচ্ছেতাই ন্যাস্টি সীজন আর নেই।

যে ব্যক্তি দুমাইল পথ জল ভাঙিয়া ও ধাবমান মোটরের ছিটা খাইয়া আসিয়াছে, সে এ কথা বলিতে পারে; কিন্তু এই ঘরে কিছু পূর্বেই এই বর্ষাঋতু লইয়া আর এক প্রকারের আলোচনা হইয়া গিয়াছে। রেনি সীজন যে বেশ উঁচুদরের সীজন, তাহা গান ও বক্তৃতার ভিতর দিয়া উপস্থিত তিনজন একমত হইয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। ইতিমধ্যে বাহির হইতে আসিয়া অনুপম যখন। বিরক্তভাবে সেই রেনি সীজনের নিন্দাবাদ আরম্ভ করিল, তখন ঘরের মধ্যে মনের ঐক্য ও সহানুভূতিতে যে একটি আবহাওয়া সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা ছিড়িয়া যাইবার উপক্রম হইল। পলকের জন্য কিশোর ও সুহাসিনীর চোখাচোখি হইল কিন্তু দুজনেই তৎক্ষণাৎ যেন পরস্পরের মনের ভাব বুঝিয়া ঈষৎ লজ্জিতভাবে দৃষ্টি সরাইয়া লইল।

অনুপমের কথার বেসুরা ভাবটা সারিয়া লইবার অভিপ্রায়ে কিশোর বলিল, আপনি সারাটা পথ কাদা ঘেঁটে আসছেন বলেই ওরকমটা মনে হচ্ছেনইলে বর্ষা ঋতুটা আমাদের তো ভালই লাগে।

অনুপম তাচ্ছিল্যভরে বলিল, সিলি সেন্টিমেন্ট! ও-সব স্কুলমাস্টারি ঢঙ!

কিশোর হাসিতে হাসিতে বলিল, তা হবে। এখানে কিন্তু স্কুল মাস্টারই দলে ভারী। সে যাক, কিন্তু কাজের লোক হবার কত বিপদ দেখুন! আপনাকে এই দুর্যোগ মাথায় করে বেরুতে হয়েছে, আর আমরা বেকার লোক কেমন আরামে বসে বসে গল্প করছি।

এ কথার মধ্যে আপত্তিজনক কিছুই ছিল না, কিন্তু অনুপম মনে করিল, কিশোর তাহাকে বক্র। কটাক্ষ করিয়া আসিতেছে। তাই সে-ও কণ্ঠস্বরে তীব্র শ্লেষ পুরিয়া নীরসভাবে বলিল, তাই তো দেখছি। সন্ধ্যাটা আজকাল আপনার মন্দ কাটছে না। বলিয়া ভ্রূভঙ্গি করিয়া একবার সুহাসিনীর দিকে তাকাইল।

কিশোর কিন্তু সে ইশারার ধার ঘেঁষিয়াও গেল না, সহাস্যে বলিল, তা বলতে নেই—একরকম ভালই কাটছে। অন্তত উদরের দিক দিয়ে আমার অনুযোগ করবার কিছু নেই।

তা তো বটেই! ভদ্রসমাজে মেশবার সুযোগটা ঘাড়ে চেপে আদায় করে নিচ্ছেন—চক্ষুলজ্জার বালাই নেই। কথাটা এত রূঢ় যে, বলিয়া ফেলিয়া অনুপমও যেন আড়ষ্ট হইয়া গেল। তারপর কাষ্ঠ-হাসি হাসিয়া কথাটা লঘু করিবার চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু কৃতকার্য হইল না।

সুহাসিনী তাহার দিকে বিস্ময়মিশ্রিত একটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আরক্তিমমুখে তাহার দিকে সম্পূর্ণ পশ্চাৎ ফিরিয়া বসিল। কিশোর কিন্তু এ কথাও গায়ে না মাখিয়া পূর্ববৎ হাসিমুখে বলিল, চক্ষুলজ্জা থাকলেই ঠকতে হয়। আর ভদ্রসমাজে মেশবার সুযোগ পেয়েও যদি ছেড়ে দিই, তাহলে আমার মত অভাগা আর কে আছে?

অনুপমের দিকে পিছু ফিরিয়া বসিতেই সুহাসিনীর চৌকিখানা ঠিক কিশোরের মুখোমুখি হইয়া পড়িয়াছিল। সুহাসিনী তাহার দিকে ঝুঁকিয়া বসিয়া বলিল, আমাদের যে কথা হচ্ছিল, তাই হোক। আপনার সঙ্গে যাঁকে ছাদে দেখলুম, তিনিই বুঝি আপনার বৌদি?

অনুপমের অশিষ্ট ও যারপরনাই ইতর ইঙ্গিতে যদি সে অপমানিত বোধ করিয়া থাকে, তাহারই সংশোধনের অভিপ্রায়ে যে সুহাসিনী এতটা কাছে সরিয়া আসিয়া এমন আগ্রহভরে কথা আরম্ভ করিয়াছে কিশোর তাহা বুঝিল, বলিল, হ্যাঁ, উনিই আমার বৌদিদি।

অনুপমের মুখের উপর কে যেন কালির উপর কালি ঢালিয়া দিতে লাগিল। সে কেবল বিদ্বেষপূর্ণ চক্ষু মেলিয়া অন্তরঙ্গভাবে কথোপকথননিরত দুজনের প্রতি চাহিয়া রহিল।

সুহাসিনী প্রশ্ন করিল, ওঁরই বুঝি সেরাত্রে মাথা ধরেছিল?

হ্যাঁ।

কিন্তু কী সুন্দর দেখতে আপনার বৌদিকে চোখ যেন ফেরানো যায় না। আজ কতটুকুর জন্যেই বা দেখেছি, কিন্তু মনে হচ্ছে, ওঁর মত সুন্দরী আর কোথাও দেখিনি।

আপনি ঠিক বলেছেন, আমার বৌদিদির মত সুন্দরী বড় একটা দেখা যায় না। বলিয়া কিশোর নিশ্বাস ফেলিল।

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া গভীর সহানুভুতিভরা দুই চোখ তুলিয়া সুহাসিনী বলিল, বয়স তো বেশী হয়নি, কতদিন ওঁর এ রকম হয়েছে?

এ রকম–? ও বৈধব্য! তা ছমাসের বেশী হতে চলল।

তেমনিই অনুচ্চকণ্ঠে সুহাসিনী জিজ্ঞাসা করিল, ওঁর স্বামী কি আপনার নিজের দাদা ছিলেন?

কয়েক ঘণ্টা পূর্বের ঘটনা স্মরণ করিয়া কিশোর আর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, তার চেয়েও বোধ হয় বেশী আপনার ছিলেন।

কথাটা ঠিক বুঝিতে না পারিলেও এ প্রসঙ্গ লইয়া সুহাসিনী আর প্রশ্ন করিতে পারিল না। কিশোরের পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে আরও অনেক কথা জানিবার জন্য তাহার মন উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু জিজ্ঞাসা করা শিষ্টতা-বিগর্হিত হইবে বলিয়া প্রশ্নগুলা তাহার ওষ্ঠাগ্রে আসিয়াও সসঙ্কোচে ফিরিয়া গেল।

ঘরের অপর প্রান্তে অনুপম ইহাদের অনুচ্চ কথাবার্তা কিছুই শুনিতে পাইতেছিল না। উপরন্তু কী একটা কথা বিনয়বাবু তাহার কানের কাছে অনবরত বলিয়া চলিয়াছিলেন, অনুপম মাঝে মাঝে তাহার সংক্ষিপ্ত জবাব দিতেছিল বটে, কিন্তু তাহার মন ও চক্ষু অন্যত্র পড়িয়াছিল।

দুইজন যুবক-যুবতী পরস্পরের খুব কাছাকাছি বসিয়া নীরব হইয়া থাকার মধ্যে এমন একটি নিবিড় বাণীহীন অন্তরঙ্গতা প্রকাশ পায়—যাহা কাহারও চক্ষু এড়াইবার কথা নহে।

তাই দূর হইতে এই দুইজনকে সেইভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া অনুপম অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। সে কিছুক্ষণ ছটফট করিয়া হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া সুহাসিনীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, তোমার সঙ্গে দু-একটা কথা কইতে চাই, একবার ও ঘরে শুনে যাও।

বিস্মিত দৃষ্টিতে ঘাড় ফিরাইয়া সুহাসিনী দেখিল, তাহারই উদ্দেশে অনুপম কথাগুলা বলিয়াছে। অনুপমের কণ্ঠস্বরে, তাহার অজ্ঞাতসারেই বোধ করি, এমন একটা আদেশের ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল যে, মুহূর্তমধ্যে সুহাসিনীর মুখ কঠিন হইয়া উঠিল। এই হাস্যময়ী মেয়েটি যে প্রয়োজন হইলে স্ফটিকখণ্ডের ন্যায় কঠিন হইতে পারে, আজ তাহা প্রথম লক্ষ্য করিয়া কিশোর মনে মনে যেমন আশ্চর্য হইয়া গেল, তেমনই একটু পরিতৃপ্তিও অনুভব করিতে লাগিল। তাহার মনে হইল, নারীচরিত্রের একটি অপরূপ বিকাশলীলা সে দেখিতেছে। এ ক্ষেত্রে অনুপমচন্দ্র যে এই বিকাশলীলার আঘাতে ধূলিসাৎ হইবার উপক্রম করিয়াছে, তাহাতে তাহার পরিতৃপ্তির তিলমাত্র ব্যাঘাত ঘটিল না।

সুহাসিনীকে নিশ্চেষ্ট দেখিয়া অনুপম আবার বলিল, শুনতে পেলে? একবার এ ঘরে এসো।

সুহাসিনী দুই চোখে বিদ্রোহ ভরিয়া শক্তভাবে বলিল, আপনি কী বলতে চান এ ঘরেই বলুন, আমি শুনছি।

যাবে না?

না।

অনুপমের মুখ দেখিয়া মনে হইল, সে বুঝি এবার বারুদের মত ফাটিয়া পড়িবে। সুহাসিনী তাহ গ্রাহ্য না করিয়া মুখ ফিরাইয়া বসিল; কিন্তু অনুপমের দৃষ্টি তাহাকে অতিক্রম করিয়া কিশোরের নিরপরাধ মস্তকের উপর অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল। সুহাসিনী তাহাকে অপমান করিয়াছে বটে, কিন্তু এই লোকটা বসিয়া বসিয়া সেই লাঞ্ছনা দেখিতেছে এবং সম্ভবত উপভোগ করিতেছে। তাই আর সকলকে ছাড়াইয়া এই লোকটার উপরেই তাহার ক্রোধের শিখা গগনস্পর্শী হইয়া জ্বলিতে লাগিল।

অনুপমের মুখ দেখিয়া কিশোরের ভয় হইল হয়তো এখনই সে একটা লজ্জাকর বিশ্রী কাণ্ড বাধাইয়া বসিবে। তাহার মত বাহিরের লোকের সম্মুখে পুরাতন বন্ধুদের মধ্যে পাছে একটা অশোভন। কলহ বাধিয়া যায়, তাই সে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। উপায় থাকিলে একটা ছুতা করিয়া সে পৃষ্ঠপ্রদর্শন। করিতেও দ্বিধা করিত না। কিন্তু এ সময় বিদায় লইবার চেষ্টা করিলে সেটা যে নিতান্তই পলায়নের মত দেখাইবে, তাহা বুঝিয়া সে উঠিতে পারিল না।

নিজের উপস্থিতির জন্য কুণ্ঠিত হইয়া সে চুপি চুপি সুহাসিনীকে বলিল, অনুপমবাবু বোধ হয় অসন্তুষ্ট হচ্ছেন, আপনি একবার ও-ঘরে গেলে পারতেন।

অধর দংশন করিয়া সবেগে মাথা নাড়িয়া সুহাসিনী শক্ত হইয়া চেয়ারে বসিয়া রহিল, উঠিল না।

অনুপম অসীম বলে নিজেকে সংবরণ করিয়া বিনয়বাবুর দিকে ফিরিল, আপনিই চলুন তাহলে। আপনার সঙ্গেও কথা আছে।

ভিতরে ভিতরে কী একটা গোলমাল পাকাইয়া উঠিতেছে তাহা স্পষ্টভাবে না বুঝিলেও বিনয়বাবু উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছিলেন।

পাশের ঘরটা বিনয়বাবুর লাইব্রেরি। সেখানে ঢুকিয়া দরজা ভেজাইয়া দিবার পর কিশোর ও সুহাসিনী আগের মতই মৌন হইয়া রহিল। খানিক পরে কিশোর নড়িয়া-চড়িয়া অনুতপ্ত স্বরে বলিল, আমার বোধ হয় উঠে যাওয়া উচিত ছিল। আমি বাইরের লোক—আমার সামনে কথা বলতে ওঁর অসুবিধা হচ্ছিল–

সুহাসিনী তীক্ষকণ্ঠে বলিল, আপনি যেমন বাইরের লোক, উনিও তো তাই।

তা হলেও কিশোর দুঃখিতভাবে ঘাড় নাড়িল।

আরও কিছুক্ষণ নির্বাকভাবে বসিয়া থাকিবার পর সুহাসিনীর হঠাৎ খেয়াল হইল যে, এ ঘরে তাহারা দুজন ছাড়া আর কেহ নাই এবং তাহারা পরস্পরের অত্যন্ত ঘেঁষাঘেঁষি হইয়া বসিয়া আছে। সুহাসিনীর শরীরের উপর দিয়া লজ্জার একটা ঢেউ বহিয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল এবং ঘরময় এটা-ওটা নাড়িয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়া শেষে দূরের একটা চেয়ারে গিয়া বসিল।

বিনয়বাবু ও অনুপম ফিরিয়া আসিতেই কিশোর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আজ তাহলে উঠি। রাতও অনেক হল, প্রায় সাড়ে নটা বাজে। বলিয়া একবার দুই করতল একত্র করিয়া ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

সুহাসিনী বাপের দিকে তীক্ষ্ দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল তাঁহার মুখ গম্ভীর এবং তাহার উপর একটা বিষণ্নতার ছায়া পড়িয়াছে। কিন্তু তিনি কোন কথা না বলিয়া আস্তে আস্তে নিজের কেদারায় গিয়া বসিলেন, অনুপমও বোধ করি আবার বসিবার উপক্রম করিতেছিল, কিন্তু সুহাসিনীকে অধীরভাবে ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিতে দেখিয়া সে আর বসিতে পারিল না; অনিশ্চিতভাবে কিছুকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া অবশেষে হঠাৎ একটা শুভ নিশি জানাইয়া প্রস্থান করিল।

ইহারা চলিয়া যাইবার পর আরও খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, গলাটা একবার সাফ করিয়া বিনয়বাবু বলিলেন, তোমার মা আজ বেঁচে থাকলে এ-সব ভাবনা কিছুই আমাকে ভাবতে হত না, তিনিই সব করতেন। কিন্তু তিনি যখন নেই তখন যেমন করে তোক আমাকে করতে হবে। অথচ সংসারের এ সমস্ত ব্যাপারে আমি একেবারেই–

কথাটা সমাপ্ত হইল না। বিনয়বাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন।

অনুপম তাঁহার কাছে সুহাসিনীর সহিত বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিল। প্রস্তাবটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত না হইলেও, এমন খোলাখুলিভাবে স্বয়ং পাত্রের নিকট হইতে তিনি প্রত্যাশা

করেন নাই। অভিনবপন্থী হইলেও বিনয়বাবু হিন্দুতাই বিবাহের প্রস্তাব কন্যাপক্ষের দিক হইতে আসাই তাঁহার কাছে শোভন ও সুষ্ঠু ঠেকে। অথচ কন্যাপক্ষের দিক হইতে কন্যার আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত তিনি যে বিন্দুমাত্র উদ্যোগ বা চেষ্টা করেন নাইপ্রমক্রমেও সৎপাত্রের অনুসন্ধান করেন নাই—এ আত্মগ্লানিও প্রচ্ছন্নভাবে তাঁহার অন্তরে বিদ্যমান ছিল। তাই অনুপমের প্রস্তাব নেহাত নির্লজ্জ বলিয়া প্রতিভাত হইলেও, তাঁহার নিজের দিক হইতে যখন কোন উদ্যোগই নাই, তখন অন্যের উদ্যোগে দোষ ধরিতে তিনি কুণ্ঠিত হইলেন। কিন্তু সহসা অনুপমকে কথা দিতেও পারিলেন না। অনুপমের চেয়ে সুপাত্র যে বঙ্গদেশে বিরল নহে, এ জ্ঞান বিনয়বাবুর মত ভাল মানুষেরও ছিল; তাই নিজের অক্ষমতার দোষে, যে ব্যক্তি প্রথম পাণিপ্রার্থনা করিল তাহারই হস্তে কন্যাসমর্পণের প্রতিশ্রুতি দিতে পারিলেন না। অনুপমকে বলিলেন, আচ্ছা, আমি সুহাসের মন বুঝে তোমাকে বলব। মনে মনে ভাবিলেন, সুহাস বড় হইয়াছে, সে যদি স্বেচ্ছায় পছন্দ করিয়া রাজী হয়, তবে তাঁহার আর, ক্ষোভ করিবার কিছু থাকিবে না।

কিন্তু তবু তাঁহার সঙ্গিহীন পিতৃহৃদয় কন্যার সহিত আসন্ন বিচ্ছেদের চিন্তায় ম্রিয়মাণ ও ব্যথাতুর হইয়া উঠিল।

সুহাসিনীও তাঁহার অসম্পূর্ণ ভূমিকার কোন অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া আশঙ্কায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, কী হয়েছে, বাবা? অনুপমবাবু কী বলে গেলেন?

বিনয়বাবু কন্যার দিকে না তাকাইয়া চুলের মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে বলিলেন, অনুপম তোমার সঙ্গে তার বিবাহের প্রস্তাব করে গেল। তা—আমি তাকে বলেছি, এ বিষয়ে তোমার মতামত জেনে–

অজ্ঞাতে সাপের ঘাড়ে পা দিয়া মানুষ যেমন চমকাইয়া উঠে, সুহাসিনী তেমনই করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। আজ এ বাড়িতে প্রবেশ করিয়া অবধি অনুপম অনেক ধৃষ্টতা করিয়াছে বটে, কিন্তু এই শেষ ধৃষ্টতা সুহাসিনীর কাছে যেন তাহার সকল স্পর্ধাকে লঙ্ঘন করিয়া গেল।

এ হতে পারে না। তুমি—তাঁকে বলে দিও-এ অসম্ভব। বলিয়া উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া সে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

৪

কাব্যশাস্ত্র ও গল্প-উপন্যাসের সরস পৃষ্ঠা হইতে প্রণয়রূপী দেবতাটির পরিচয় আমাদের সকলেরই অল্পবিস্তর জানা আছে। বাস্তব-জগতে এই ধনুর্ধর দেবতা যখন আমাদের পরিচিত কাহারও উপর অত্যাচার উৎপীড়ন আরম্ভ করেন, তখন তাঁহাকে চিনিতে আমাদের তিলার্ধ বিলম্ব হয় না। কিন্তু পরিহাস এই যে, ইনি যখন একদিন সহসা হাস্যমুখে আমাদেরই দ্বারে আসিয়া দাঁড়ান, তখন অনেকেই তাঁহাকে চিনিয়া লইতে পারি না।

পুরুষ—বিশেষ করিয়া যুবাপুরুষ সম্বন্ধে সুহাসিনীর মন এতদিন একপ্রকার উদাসীন নিষ্ক্রিয় হইয়াই ছিল। তাহাদের চালচলন কথাবার্তা মাঝে মাঝে বৈচিত্র্যপূর্ণ ও কৌতুকাবহ মনে হইলেও কোনদিন ইহাদের প্রতি একটা স্থায়ী আকর্ষণ সে অনুভব করে নাই। জগতের অন্যান্য বহু কোটি প্রাণবন্ত জীবের মত এগুলিকেও সে ভগবানের একপ্রকার সৃষ্টি বলিয়া নিরুৎসুক চিত্তে ও বিনা আপত্তিতে স্বীকার করিয়া লইয়াছিল, সম্প্রদায়-হিসাবে ইহাদের প্রতি বিরাগ বা অনুরাগ কিছুই অন্তরে। পোষণ করে নাই। অনুপমকেও সে সহজভাবে সরল চিত্তে এই যুবকজাতির পঙক্তিভুক্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিল।

কিন্তু এতদিন পরে কিশোর নামক একটি যুবক আসিয়া তাহার পূর্বধৃত সমস্ত ধারণা ওলট-পালট করিয়া দিল। সর্ববিষয়ে যুবসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়াও লোকটি যেন নিজের কোন বৈশিষ্ট্যের প্রভাবে একেবারে শ্রেণীমুক্ত হইয়া পৃথকভাবে দেখা দিল। যুবক বটে—তবু যেন সে সাধারণ যুবক নহে। অন্যান্য সকলের সহিত তাহার যেন মস্ত একটা

স্বাতন্ত্র্য আছে। সুহাসিনীর কৌমার্যের নির্বিকার যোগনিদ্রা ভাঙিয়া গেল। প্রথমে বিস্ময়, তারপর কৌতূহল এবং সর্বশেষে অদম্য আগ্রহ তাহার দেহ-মনকে অহরহ কিশোরের দিকে দুর্বার শক্তিতে টানিতে লাগিল।

দুইটি মানুষের মধ্যে পরিচয়ের একটা অবস্থা আছে যখন পরস্পর সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় ও জানিবার স্পৃহা দুইই নিঃশেষ হইয়া যায়; তখন তাহাদের মধ্যে সত্যকার সম্বন্ধ স্থাপিত হয়—তা সে শত্রুতা, বন্ধুত্ব বা নির্লিপ্ততা যাহাই হউক। কিন্তু যেখানে তাহা হয় না, যেখানে জানিবার তৃষ্ণা জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে আরও বাড়িয়া উঠিতে থাকে, কিছুতেই নিবৃত্ত হইতে চায় না, সেখানে জিজ্ঞাসু ব্যক্তিটির মনোভাব লইয়া সতর্কভাবে অনুসন্ধান করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

কিন্তু জাহাজের দিগদর্শন যন্ত্রের কাঁটার মত যাহার মন সকল কাজে অকাজে পাশের একখানা বাড়ির পানে স্থির-নিশ্চল হইয়া আছে, আর একজনের কলেজ যাইবার ও সেখান হইতে ফিরিবার সময়টাতে যাহাকে কোন অদৃশ্য শক্তি ঘাড় ধরিয়া আনিয়া শয়নঘরের জানালার পাশে দাঁড় করাইয়া দেয়, একজনের সহসা শ্রুত কণ্ঠস্বর যাহার বুকে মুগুরের মত ঘা মারিয়া নিশ্বাস রোধ করিয়া দিবার। উপক্রম করে এবং প্রভাতে শয্যাত্যাগের পর হইতেই যে উৎকণ্ঠিতা সন্ধ্যার একটি মধুময় প্রহরের জন্য উৎসুক প্রতীক্ষায় উন্মনা হইয়া থাকে, তাহার তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে যাওয়া নিতান্তই একটা অনাবশ্যক বাহুল্য বলিয়া মনে হয়।

মনের এইরূপ অবস্থার কথা সুহাসিনী কিন্তু কিছুই জানিতে পারে নাই। নিজের চিত্ত বিশ্লেষণ করিবার তাহার বয়স নহে, অপরূপ অনুভূতির আনন্দেই সে বিভোর হইয়াছিল। তাই আর কাহারও চক্ষু দিয়া সে যদি আজ নিজের মনটা দেখিতে পাইত, তাহা হইলে বোধ করি লজ্জায় মরিয়া যাইত। বাড়িতে অন্য স্ত্রীলোক বা সমবয়স্কা মেয়ে থাকিলেও হয়তো হাসিঠাট্টার ভিতর দিয়া সে নিজের কাছে ধরা পড়িয়া যাইত। কিন্তু সেরূপ কেহ না থাকায়, জীবনের এত বড় পরিবর্তনটা তাহার কাছে। অজ্ঞাত রহিয়া গেল।

সেদিন দুপুরবেলা আহারাদির পর বিনয়বাবু নিজের ঘরে বিশ্রাম করিতেছিলেন, সুহাসিনী একা এই দীর্ঘ অলস বেলাটা কি করিয়া কাটাইবে ভাবিতে ভাবিতে নিজের ঘরের শয্যার উপরে বুকের তলায় একটা বালিশ দিয়া শুইয়া একখানা বই লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল, এমন সময় দরজার বাহির হইতে ঝির গলা শুনিতে পাইল, এই যে মা, এ দিকে আসুন। দিদিমণি নিজের ঘরে রয়েছেন।

কে আগন্তুক আসিয়াছে, দেখিবার জন্য সুহাসিনী বই ফেলিয়া উঠিয়া বসিতেই পর্দা সরাইয়া বিমলা প্রবেশ করিল। সাদা থান ও শেমিজ, মাথার চুলগুলা টান করিয়া পিছনদিকে জড়ানো, গলায় কেবল ইষ্টকবচযুক্ত একগাছি সরু সোনার হার,—তাহাকে দেখিয়া সুহাসিনী কিছুক্ষণ মুগ্ধের মত বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, সম্ভাষণ করিতেও ভুলিয়া গেল। তারপর তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল, আসুন। আপনাকে আমি চিনতে পেরেছি, আপনি কিশোরবাবুর বৌদিদি।

কথাটা বলিতে বলিতে পলকের জন্য সুহাসিনীর চোখ দুটি যেভাবে অবনত হইয়া পড়িল, তাহা বিমলার চক্ষু এড়াইল না। সে বলিল, আমার বড় অন্যায় হয়ে গেছে, ঢের আগেই আমার আসা উচিত ছিল। কিন্তু আমার দেওরটি তোমাদের ওপর যে রকম উৎপাত আরম্ভ করেছেন, তার সঙ্গে আমিও যদি আবার যোগ দিই, তাহলে তোমাদের পাড়া ছেড়ে পালাতে হবে, এই ভয়ে এতদিন আসিনি।

হাত ধরিয়া তাহাকে নিজের বিছানায় বসাইয়া সুহাসিনী মৃদুহাস্যে বলিল, এ রকম উৎপাত যদি মাঝে মাঝে করেন তবেই আপনাদের পাড়ায় থাকব, নইলে সত্যিই উঠে যেতে হবে।

বিমলা জিজ্ঞাসা করিল, পাড়ার আর কারুর সঙ্গে আলাপ হয়নি বুঝি?

না। এসে পর্যন্ত একেবারে একলা পড়ে গেছি।

অতঃপর সহজেই আলাপ জমিয়া উঠিল। কারণ, দুইদিকেই ভাব করিবার আগ্রহ সমান। সুহাসিনী লক্ষ্য করিয়া দেখিল, বিমলা শুধু অসামান্য রূপবতী নয়, অতিশয় সুশিক্ষিত এবং কথাবার্তায় বিশেষ রকম পরিমার্জিত। তাহার কথার মধ্যে বুদ্ধির এমন একটি অনাড়ম্বর অথচ সহজ স্বাতন্ত্র আছে যে, সুহাসিনী বিস্মিত না হইয়া পারিল না। ঘণ্টাখানেক গল্পসল্প করিবার পর তাহার দৃঢ় ধারণা জন্মিল যে, এত সুন্দরী, এরূপ বুদ্ধিমতী এমন মধুর প্রকৃতির স্ত্রীলোক সে আর কখনও দেখে নাই।

ইহাদের কথাবার্তা খুব সাধারণ গোছেরই হইল। প্রায় সমবয়স্কা দুটি যুবতী একত্র হইলে যেরূপ আলাপ সাধারণত হইয়া থাকে, এখানেও তাহার ব্যতিক্রম হইল না। লেখাপড়ার কথা, সেলাইয়ের কথা, সংসারের কথা, সুহাসিনীর মাতার মৃত্যুর কথা ইত্যাদি নানা প্রকার বিশ্রম্ভ আলোচনার মধ্য দিয়া দুজনেরই দুজনকে এমন ভাল লাগিয়া গিয়াছিল যে, পাশের ঘরের ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া দুটা বাজিতেই বিমলা চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, আর তো ভাই বসতে পারব না, ঠাকুরপোর আসবার সময় হল।

হ্যাঁ, আজ বিদ্যুত্বর, আজ তো তিনটের সময়–এই পর্যন্ত বলিতেই কে যেন সুহাসিনীর জিভ চাপিয়া ধরিল। বিমলা লক্ষ্যই করে নাই এমনই ভাবে বলিল, হ্যাঁ, আজ ওঁকে শেষের একটা ক্লাস নিতে হয় না, তিনটের মধ্যেই ফেরেন। —আচ্ছা ভাই, আসি তাহলে। আমাদের গল্প শেষ হল না, আর একদিন হবে। এবার কিন্তু তোমায় যেতে হবে। পালটা না দিলে আসব না, তা বলে দিচ্ছি!

কেবলমাত্র একটা আচ্ছা ছাড়া সুহাসিনী আর কিছু বলিতে পারিল না, বেফাঁস কথাটা বলিয়া অবধি তাহার বুক ধড়াস ধড়াস করিতেছিল।

নীচে সদরের বারান্দা পর্যন্ত গিয়া হাসিমুখে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বিমলা বলিল, আচ্ছা চললুম, মনে থাকে যেন, সুহাস।

সুহাসিনী একটু লাল হইয়া, একটু ইতস্তত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমি আপনাকে কী বলে ডাকব?

তাহার অবনত মুখের পানে চাহিয়া বিমলা বলিল, তুমি আমাকে দিদি বলে ডেকো।

পথে তখন বেশী লোক-চলাচল ছিল না, মাথায় আচঁলটা একটু টানিয়া দিয়া বিমলা ত্বরিতপদে রাস্তাটুকু পার হইয়া নিজের বাড়িতে গিয়া ঢুকিল।

তাহাকে বিদায় দিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় শয্যার উপর বসিবার উপক্রম করিতেই সম্মুখেই বড় আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বখানা সুহাসিনীর চোখে পড়িল। সেইদিকে তাকাইয়া নিজের অজ্ঞাতসারে সে একটা নিশ্বাস ফেলিল। তাহার মনে হইল, তাহার মত কুৎসিত কুরূপা পৃথিবীতে বুঝি আর দ্বিতীয় নাই।

সন্ধ্যার পর নিত্য-নৈমিত্তিক বৈঠক বসিয়াছিল। বর্তমান বিজ্ঞানের ধারা লইয়া কিশোর ও বিনয়বাবুতে তর্ক এবং গবেষণা চলিতেছিল, অদূরে একখানা চৌকিতে করতলে চিবুক রাখিয়া সুহাসিনী চুপ করিয়া বসিয়া শুনিতেছিল। কিন্তু যত না শুনিতেছিল, একজন তার্কিকের বলিষ্ঠ দেহ, সুযুক্তিপূর্ণ বাক্য, বহুবিস্তৃত জ্ঞান ও নির্মল অন্তঃকরণের কথা ভাবিতে ভাবিতে বিভোর তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিল।

কী একটা তকাধীন কথার কোনরূপ নিষ্পত্তি ও মতের ঐক্য না হওয়ায় কিশোর হঠাৎ তাহার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কী বলেন?

চটকা ভাঙিতেই সুহাসিনীর জ্ঞান হইল যে, সে এতক্ষণ আত্মবিস্মৃত হইয়া কিশোরের মুখের পানে তাকাইয়া বসিয়াছিল, একটা কথাও শুনিতে পায় নাই। লজ্জা ঢাকিবার জন্য তাড়াতাড়ি ঘাড়টা অন্যদিকে ফিরাইয়া সে বলিল, আপনাদের কী তর্ক, আমি তাই বুঝতে পারছি না।

কেন বুঝতে পারছেন না? কিশোর চেয়ারের মুখ তাহার দিকে ফিরাইয়া বসিয়া বলিল, এ তো খুব সহজ কথা। উনি বলছেনবলিয়া আলোচ্য বিষয়টা আবার বিশদ করিয়া বিবৃত করিতে যাইবে, এমন সময় দরজার কাছে গাড়ি থামার একটা শব্দ শুনা গেল এবং অনতিকাল পরে অনুপমের মাতা হেমাঙ্গিনী দেবী প্রবেশ করিলেন।

কুঁচাইয়া পরা গরদের সরু পাড় ধুতি, গায়ে অনুরূপ ব্লাউজ এবং পায়ে বনাতের চটিজুতা পরিয়া হেমাঙ্গিনী হিন্দু বিধবার আচার ও আধুনিক শিষ্ট সমাজের সভ্যতা এই দুয়ের মধ্যে একটা রফা করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি আসিতেই সকলে সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সুহাসিনী কাছে আসিয়া প্রণাম করিল, তিনি তাহার গণ্ডে একটি লৌকিক চুম্বন দিয়া বলিলেন, ওঁর নাকি আবার শরীর খারাপ হয়েছে? বলিয়া ইঙ্গিতে বিনয়বাবুকে দেখাইলেন।

সুহাসিনী বিস্মিত হইয়া বলিল, কৈ, না। বাবা তো বেশ ভালই আছেন।

বিনয়বাবু সে কথার সমর্থন করিয়া বলিলেন, এখানে এসে অবধি হাঁপানিটা আর চাগায়নি।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া একটা চেয়ারে বসিয়া হেমাঙ্গিনী বলিলেন, তবু ভাল। কে যেন বললে—তাই শুনে পর্যন্ত মনটা ছটফট করছিল। নানান কাজে আসতে পারিনি। আজ আর থাকতে পারলাম না, ভাবলুম, একবারটি গিয়ে দেখে আসি, কচি মেয়েটা একলা না জানি কত কষ্টই পাচ্ছে। আর তো সুজাতা নেই— বলিয়া তিনি আর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

সুজাতা সুহাসিনীর মায়ের নাম।

এই সময় সম্মুখে কিয়দ্দূরে উপবিষ্ট কিশোরের উপর দৃষ্টি পড়ায় তিনি সুহাসিনীকে নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, চিনি-চিনি মনে হচ্ছে—ছেলেটি কে বলো তো?

নিজের ত্রুটি এতক্ষণে চোখে পড়ায় বিনয়বাবু তাড়াতাড়ি উঠিয়া দুজনের পরিচয় করাইয়া দিলেন। কিশোর কপালে হাত ঠেকাইয়া নমস্কার করিল। হেমাঙ্গিনী খুব জোরে হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, আপনি কিশোরবাবু? সেদিন রাত্রে মিছিমিছি কী ভয়টাই আমরা পেয়েছিলুম। অনুপমের মুখে আপনার সব কথা শুনেছি। বড় খুশি হলাম।

কিশোর বিনীতভাবে চুপ করিয়া রহিল, কিন্তু তাহার মনটা হঠাৎ কেমন খারাপ হইয়া গেল। প্রথম-দর্শনেই কাহারও সম্বন্ধে কোন প্রকার ধারণা করিয়া লওয়া অনুচিত, কিন্তু এই স্ত্রীলোকটির গোঁফ কামানো পুরুষের মত মুখ ও উগ্র হসি তাহার আদৌ ভাল লাগিল

না। মনমরা হইয়া সে ভাবিতে লাগিল, ইহার সহিত পরিচয়ের সুযোগ না হইলেই বোধ হয় ভাল হইত।

বিনয়বাবু কিন্তু হাঁফ ছাড়িয়া আবার প্রফুল্ল হইয়া উঠিলেন। বস্তুত হেমাঙ্গিনীকে সহসা আবির্ভূত হইতে দেখিয়া তিনি অতিমাত্রায় উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। সেই যে অনুপম বিবাহের প্রস্তাব করিয়া চলিয়া গিয়াছিল, তারপর আর আসে নাই; বিনয়বাবু চিঠি লিখিয়া তাহাকে সুহাসিনীর অমত জানাইয়া দিয়াছিলেন। তারপরও কয়েক দিন গত হইয়াছে। কিন্তু ওদিক হইতে কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায় নাই। তাই আজ হেমাঙ্গিনীকে দর্শনমাত্র তাঁহার মনে একটা অনির্দিষ্ট আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল। স্বর্গগতা স্ত্রীর এই বান্ধবীটিকে তিনি মনে মনে ভয় করিতেন। কিন্তু যখন দেখিলেন যে, হেমাঙ্গিনী বেশ সহজভাবে হাসিমুখে কথা কহিতেছেন, তখন তাঁহার স্বাভাবিক প্রফুল্লতা আবার ফিরিয়া আসিল।

সাধারণভাবে আবার কথাবার্তা আরম্ভ হইল, শুধু সুহাসিনী তাহাতে যোগ দিতে পারিল না; আস্তে আস্তে সরিয়া গিয়া কোণের একটা চৌকিতে মৌন হইয়া বসিয়া রহিল।

ক্রমশ দেখা গেল যে, বিনয়বাবুও কখন অলক্ষ্যে আলাপ-আলোচনার মধ্য হইতে বাদ পড়িয়া গিয়াছেন, শুধু কিশোর আর হেমাঙ্গিনীতে কথা চলিতেছে; অর্থাৎ হেমাঙ্গিনী ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নানা প্রকার প্রশ্ন করিতেছেন এবং কিশোর তাহার উত্তর দিতেছে। হেমাঙ্গিনীর ভাবভঙ্গি দেখিয়া অনুমান হইতে লাগিল যে, এই প্রিয়দর্শন ছেলেটিকে

দেখিবামাত্র তাঁহার মাতৃহৃদয়ের বহুকালসঞ্চিত স্নেহ। অকস্মাৎ প্রচণ্ড বেগে উথলিয়া উঠিয়াছে, তাই আজ তাহার নাড়ীনক্ষত্র না জানিয়া তিনি ক্ষান্ত হইবেন না।

মা নেই—আহা মরে যাই। মুখখানিকে নিরতিশয় করুণ ও ব্যথিত করিয়া বলিলেন, যার মা নেই, তার কেউ নেই। মা-মরা ছেলে দেখলেই আমার বুকের ভিতরটা কেমন করতে থাকে।তা, তোমার বাবা আবার সংসার করেছেন বুঝি?

ঘাড় নাড়িয়া কিশোর জানাইল—হ্যাঁ।

বিজ্ঞভাবে শিরঃসঞ্চালন করিয়া হেমাঙ্গিনী কহিলেন, তাই। ও তো জানা কথা—দোজ-পক্ষে বিয়ে করলে আগের পক্ষের ছেলেমেয়ে পর হয়ে যায়—এ আমি ঢের দেখেছি। এ তো নতুন কিছু নয়, বাবা। তোমার সৎমার আবার ছেলেপুলে হয়েছে তো?

কিশোর বলিল, হ্যাঁ। কিন্তু আমি বাবার পর হয়ে গেছি, একথা আপনি মনে করছেন কেন?

হয় বাবা, অনেক দেখেছি, জানি কিনা। আর তাই যদি না হবে, তুমি এখানে একটি বাসা নিয়ে রয়েছ, তিনি কি তোমার কাছে এসে থাকতে চাইতেন না?

কিশোর কহিল, ও অঞ্চলে আমাদের কিছু জমিদারি আছে, তাই দেখতে শুনতে হয় বলে তিনি এখানে থাকতে পারেন না। তা ছাড়া–

বিস্ময়ে চোখ তুলিয়া হেমাঙ্গিনী বলিলেন, জমিদারি আছে? তবে তোমার চাকরি করবার দরকার?

এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া কঠিন। শুধু টাকার লোভে যে সকল মানুষ কাজ করে না, কর্মের প্রতি নিঃস্বার্থ অনুরাগও যে সম্ভব, একথা ইহাকে বুঝাইবার চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। উপরন্তু এই নাছোড়বান্দা জেরায় সে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাই প্রসঙ্গটাকে শেষ করিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যে বলিল, আমার ভাল লাগে, তাই কাজ করি; তা ছাড়া আমি তো একলা থাকি না, আমার বৌদিদি থাকেন— বলিয়া ফেলিয়াই কিশোর ত্রস্ত হইয়া উঠিল। এই নূতন সুত্র ধরিয়া যে আর এক প্রস্ত জেরা আরম্ভ হইবে, তাহা বুঝিতে পারিয়া সে তাড়াতাড়ি বিনয়বাবুর দিকে ফিরিয়া কী একটা অন্য কথা বলিতে গেল, কিন্তু তাহাকে সে অবসর না দিয়া হেমাঙ্গিনী পুনশ্চ বলিলেন, বৌদিদি? কিন্তু তুমি যে বললে, তোমার বড় ভাই কেউ নেই। তা তোমার দাদাও কি তোমার সঙ্গেই থাকেন?

বিরক্তি চাপিয়া কিশোর বলিল, না, আমার বৌদি বিধবা।

বিধবা-কিছুক্ষণ নির্বাক থাকিয়া যেন কী চিন্তা করিতে করিতে বলিলেন, সেই কথাই তো ভাবছিলাম, তুমি ছেলেমানুষ, একলা থাক, শুধু বামুন-চাকরের ওপর কি নির্ভর করা চলে? একজন। গিন্নীবান্নী মেয়েমানুষ বাড়িতে চাই বৈকি। তাঁর হাতেই বুঝি সংসার? তা—তাঁর ছেলেপুলে নেই বুঝি? কত বয়স হবে?

প্রশ্নগুলা যে নিঃস্বার্থ কৌতূহল-প্রণোদিত নহে এ সন্দেহ কিশোরের অন্তরে উঁকি মারিতেছিল, এবার সে একেবারে অধৈর্য হইয়া পড়িল, বলিল, আমাকে মাপ করবেন, কিন্তু সারাক্ষণ নিজের সম্বন্ধে আলোচনা করতে আমি বড় লজ্জা পাচ্ছি। আপনারাও নিশ্চয় মনে মনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন।

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, না বাবা, তোমার কথায় আমি বড় আনন্দ পাচ্ছি।

সে আমার সৌভাগ্য। কিন্তু এঁরা তো ক্লান্তি বোধ করতে পারেন। বলিয়া ঘরের বাকী দুইজন লোককে নির্দেশ করিল।

কিশোরের দিকে একটা মর্মভেদী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া হেমাঙ্গিনী আর কিছু বলিলেন না। আজ তিনি এ বাড়ির আবহাওয়া বুঝিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু বিশেষ করিয়া পুত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী এই যুবকটিকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করাই ছিল তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য।

অনুপম সে রাত্রির ঘটনা প্রথমে মাতার কাছে গোপন করিয়াছিল। কাজটা যে ঠিক হয় নাই, করিয়া ফেলিবার পরই সে বুঝিয়াছিল। তারপর যখন বিনয়বাবুর চিঠি গেল, তখন আর কোন কথাই চাপা রহিল না। অনিচ্ছুক পুত্রের নিকট হইতে খুঁটিনাটি সমস্ত জানিয়া লইয়া হেমাঙ্গিনী বিরক্ত হইয়া বলিলেন, তুই যেমন বোকা, তেমনি বেহায়া। নিজের মুখে মেয়ের বাপের কাছে বিয়ের কথা তুলতে তোর লজ্জা হল না? ভাগ্যে সুজাতা বেঁচে নেই,নইলে আমার আজ মাথা কাটা যেত। এই সব কথা—এই লোকটার ব্যাপার—এতদিন আমাকে বলিসনি কেন?

www.bengaliebook.com

বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রের সহিত তিনি অন্তরালে এমন ব্যবহার করিতেন, যেন সে পাঁচ বছরের একটা নিবোধ শিশু।

বিনয়বাবুর বেশ টাকাকড়ি আছে, একথা চেনা-পরিচিত সকলেই জানিত; তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন এবং সুহাসিনী তাঁহার একমাত্র সন্তান—এই তিনটি তত্ত্বের যাহা অনিবার্য যোগফল, তাহাও নিতান্ত গণ্ডমূখ ছাড়া কাহারও অবিদিত থাকিবার কথা নহে। সুতরাং রঙের উপর রসানের মত সুহাসিনীর সহিত অনুপমের বিবাহ যে হেমাঙ্গিনীর একান্ত অভিপ্রেত ছিল, তাহা লিখিয়া প্রকাশ না করিলেও কোন ক্ষতি ছিল না।

তিন-চারিদিন ধরিয়া সমস্যাটিকে চতুর্দিক হইতে ভাল করিয়া বিবেচনা করিবার পর তিনি নিজেই অকুস্থল পরিদর্শনের জন্য আসিলেন, কিন্তু অনুপমের প্রস্তাব ও প্রত্যাখ্যান সম্বন্ধে যে ঘুণাক্ষরেও কিছু জানেন, তাহার আভাসমাত্র দিলেন না।

কথায় কথায় আরও কিছুকাল কাটিল। আজিকার সন্ধ্যাটা ব্যর্থ হইল, এইরূপ মনোভাব লইয়া কিশোর প্রস্থান করিবার পর, হেমাঙ্গিনী দ্বারের দিকে চাহিয়া থাকিয়া যেন নিজমনেই বলিলেন, ছেলেটি বেশ, কিন্তু বাপের সঙ্গে বনে না। ভিতরে কিছু কথা আছে।

কিছু কুণ্ঠিতভাবে বিনয়বাবু বলিলেন, বনে না, তেমন কথা তো কিছু বললে না।

হেমাঙ্গিনী বলিলেন, বাইরের লোকের কাছে কি সে কথা বলতে পারে? কিন্তু আমি বলে দিলুম, দেখে নিও, ভিতরে কোন কথা আছে। বলিয়া সুহাসিনীর দিকে চাহিয়া গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িলেন।

এইরূপে, ভদ্রভাবে কিশোরের যতটা অনিষ্ট করা যাইতে পারে, তাহা করিয়া, পিতার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সুহাসিনীকে খুব সাবধান করিয়া দিয়া এবং শীঘ্রই আবার আসিবেন, এই আশ্বাস প্রদান করিয়া তিনি ছ্যাকড়া গাড়ি চড়িয়া প্রস্থান করিলেন।

সুহাসিনীর মনের অবস্থা যে ঠিক কোথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং তাহার হৃদয় লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কিশোর যে কিরূপ গুরুতর প্রতিপক্ষ, তাহা তাঁহার মত শাণিত বুদ্ধিশালিনী রমণীর আন্দাজ করিতে বিলম্ব হয় নাই। তাই গাড়ির মধ্যে খাড়া বসিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ভাবিতে ভাবিতে তিনি বাড়ি গিয়া পৌঁছিলেন।

9

সেই যে প্রায় মাসখানেক পূর্বে পশুপতিবাবু কিশোরকে ত্যাজ্যপুত্র করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প জানাইয়া ট্যাক্সি চড়িয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন, তারপর হইতেই তাঁহার আর কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। তিনি যে সত্যিই তাহার সহিত সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন, পত্র লিখিয়াও আর সমাচার লইবেন না, ইহা কিশোর অসম্ভব বলিয়াই মনে করিয়াছিল। কিন্তু সপ্তাহকাল অধীরভাবে প্রতীক্ষা করিবার পরও যখন তাঁহার কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না, তখন একদিন বিমলাকে লুকাইয়া কিশোর নিজেই পত্র লিখিল। সমস্ত ব্যাপার সবিস্তারে বিবৃত করিয়া বহু মিনতি জানাইয়া লিখিল যে, এ অবস্থায় বিমলাকে ত্যাগ করা শুধু যে নিষ্ঠুরতা হইবে, তাহা নহে, ঘোর অধর্ম হইবে; এবং মৃতা জননীর শপথ করিয়া লিখিল যে, বিমলার সহিত তাহার সম্পর্ক ভ্রাতা-ভগিনীর ন্যায় নিষ্কলুষ, একথা যেন তিনি অবিশ্বাস না করেন।

সর্বশেষে পত্র সমাপ্ত করিবার সময় লিখিল—এত বলিবার পরও যদি তিনি বিশ্বাস করিতে না চাহেন, বেশ, বিমলাকে তিনি নিজের কাছে লইয়া গিয়া রাখুন; পরমারাধ্যা মাতৃদেবী সর্বদা তাহার। সঙ্গে থাকিবেন, কিশোর তাহার ছায়াও মাড়াইবে না। তাহা হইলে তো আর কোন গোল থাকিবে না?

পত্র পাঠাইয়া দিয়া গত তিন সপ্তাহ ধরিয়া সে উত্তরের অপেক্ষা করিতেছিল। কিশোরের প্রকৃতি স্বভাবতই প্রফুল্ল, দুশ্চিন্তা-ভাবনা সে সহজে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারি, কিন্তু তবু পিতার সহিত এই অহেতুক মনোমালিন্য তাহার মনের কোণে গুপ্ত কাঁটার ন্যায় সর্বদাই

খচখচ করিতেছিল। ইহার একটা সন্তোষজনক নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তাহার মন একদণ্ডের জন্যও সুস্থির হইতে পারিতেছিল না।

সে দিনটা ছিল রবিবার। ভাল করিয়া ঘুম ভাঙিবার পূর্ব হইতেই আজিকার দিবসব্যাপী অনাহত অবকাশের কাল্পনিক চিত্রটা কিশোরের সর্বাঙ্গে যেন তৃপ্তির স্পর্শ বুলাইয়া দিল। সে তাড়াতাড়ি শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। কারণ, এমন দিনের একটা দণ্ডও ঘুমাইয়া নষ্ট করা যাইতে পারে না। হাত-মুখ ধুইয়া, ল্যাবরেটরি-ঘরের সব জানালা খুলিয়া দিয়া প্রাতঃকালের নবীন আলোতে সে কাজ করিতে শুরু করিয়া দিল। যথেচ্ছা কাজ করিবার স্বাধীনতাই যে পরম বিশ্রাম, তাহা জানিয়াই যেন এই নিত্য-নৈমিত্তিক কাজেও তাহার শ্রান্তি আসিল না।

ময়লা ন্যাতা জলে নিঙড়াইয়া গৃহস্থের মেয়েরা যেমন ঘরের মেঝে মুছিয়া ফেলেন, আকাশের কালো কালো মেঘগুলাও যেন আকাশটিকে তেমনই মাজিয়া ঘষিয়া পরিষ্কার করিয়া নিজেরা কোথায় সরিয়া গিয়াছিল। এই সদ্যোধৌত প্রফুল্ল প্রভাতটি যে আজিকার মত ছুটির দিনে বিধাতার বিশেষ একটি দান, ইহা কল্পনা করিয়া পরম আনন্দে নিজের মনে শিস দিতে দিতে কিশোর কাজ করিতে লাগিল। তাহার যদি দিব্যদৃষ্টি থাকিত তাহা হইলে দেখিতে পাইত, পাশের বাড়ির একটি মেয়েও এই মধুর প্রভাতের মোহে আকৃষ্ট হইয়া অতি প্রত্যুষে উঠিয়া নিজমনে গুন গুন করিয়া গান গাহিতে গাহিতে সুপ্ত বাড়িময় গৃহকর্ম করিয়া বেড়াইতেছে।

ঘড়িতে আটটা বাজিতেই কিশোরের মন এদিক ওদিক পলাইতে আরম্ভ করিল। একটা পরিচিত কণ্ঠের আহ্বানের জন্য তাহার ইন্দ্রিয়গুলা সতর্ক হইয়া রহিল। রবিবারে সকালবেলাও বিনয়বাবুর। বাড়িতে সভা বসিতে আরম্ভ করিয়াছিল, দীনবন্ধুবাবুও এ সভায় আসিয়া যোগ দিতেন। কিশোর পলাতক মনটাকে ধরিয়া আনিয়া কাজে জুড়িয়া দিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু কিছুতেই মন স্থির থাকিতে চাহিল না।

ওদিকে দীনবন্ধুবাবু বোধ করি কোন কাজে পড়িয়া আসিতে পারিলেন না; সুহাসিনী অন্যমনস্কভাবে দু-তিনবার ড্রয়িংরুমে ঘুরিয়া গিয়া লাইব্রেরি-ঘরে উঁকি মারিয়া দেখিল, বিনয়বাবু কি একটা লেখায় ব্যাপৃত আছেন। আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকিয়া সে তাঁহার পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইল। বিনয়বাবু লক্ষ্য করিলেন না। তখন সে শেলফ হইতে একখানা বই টানিয়া লইয়া গদি-মোড়া চেয়ারে গিয়া বসিল। ক্ষুদ্র একটি নিশ্বাস ফেলিয়া তাহার পাতা উল্টাইতে লাগিল।

সাড়ে আটটা বাজিয়া গেল। কিশোর তখন টেস্ট টিউব ফেলিয়া হাত ধুইয়া তোয়ালেতে হাত মুছিতে মুছিতে এবার কি করিবে ভাবিতেছে, এমন সময় নীচে সদর দরজার নিকট হইতে ডাকপিয়নের সাড়া আসিল, চিঠি হ্যায়।

চিঠি কিশোরের বড় একটা আসে না, কেই বা লিখিবে? সে সচকিত হইয়া তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেল।

দুখানি চিঠি। একখানি হস্তাক্ষর দেখিয়াই চিনিল, তাহার বাবার। চিঠি দুইখানা লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিয়া কিশোর ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

তারপর খাম ছিড়িয়া চিঠি বাহির করিয়া পড়িল। পত্রের আরম্ভে কোন সম্বোধন বা শিরোনামা নাই। পত্র এইরূপ,–

তোমার পত্রে যে অসম্ভব স্পর্ধা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছি। তোমার যে এতদুর ধৃষ্টতা হইতে পারে, তাহা তোমার শোচনীয় অধঃপতন দেখিয়াও কল্পনা করিতে পারি নাই। তোমার বিমাতা একটা ভ্রষ্টা রমণীর সাহচর্যে বাস করিবেন, এই কদর্য প্রস্তাব করিয়া তুমি আমাকে যে অপমান করিয়াছ, তাহার উত্তরে আমি তোমাকে জানাইতেছি যে, তোমাকে আমি ত্যাজ্যপুত্র করিলাম; আজ হইতে তোমার সহিত আমার কোন সুবাদ রহিল না। আমার মৃত্যুর পর আমার বিষয়-সম্পত্তিতে তোমার কোন দাবি রহিল না জানিবে। আমার অন্যান্য পুরো বিষয় পাইবে, সেইরূপ উইল করিয়াছি। আশা করি, তাহারা কালে তোমার মত নষ্টচরিত্র গুরুর অবমাননাকারী কুপুত্র হইয়া দাঁড়াইবে না। ভবিষ্যতে আমাকে পত্র লিখিয়া কোন উপরোধ অনুরোধ করিবার চেষ্টা করিও না, পত্র অপঠিত অবস্থায় বিনষ্ট হইবে। ইতি–
পশুপতিনাথ চক্রবর্তী।

পত্র হাতে করিয়া কিশোর স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তিক্ত মনে ভাবিতে লাগিল, ইহা ছাড়া আর কি সে প্রত্যাশা করিয়াছিল? সেদিন সম্মুখে যাহা বলিয়া গিয়াছিলেন, আজ পত্রে তিনি সেই কথারই পুনরুক্তি করিয়াছেন, কোথাও এতটুকু গরমিল নাই। শুধু তিনি

যে কিশোরকে ত্যাগ করিতে কতদূর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাহাই যেন পত্রের প্রতি ছত্রে আগুনের মত জ্বলজ্বল করিতেছে। কিশোরের সমস্ত হৃদয় নিঙড়াইয়া দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে এই সত্যটাই বাহির হইয়া আসিল যে, হায় রে, আজ তাহার মা জীবিত নাই, তাই তাহার বাপ তাহাকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিয়া এ পক্ষের সন্তানদের সংস্থান করিতে এত ব্যর্থ যে, একটা সত্যকার অপরাধের জন্য অপেক্ষা করিতে পারিলেন না, মিথ্যা কলঙ্ক লেপন করিয়া তাহাকে লোকসমাজে অস্পৃশ্য করিয়া দিলেন।

চিঠিখানা সে কুচি কুচি করিয়া ছিড়িয়া জানালা গলাইয়া ফেলিয়া দিল। বিমলার চোখে যদি এ চিঠি পড়ে, তবে হীনতা ও অপমানের লজ্জা বাড়িবে বৈ কমিবে না। তাছাড়া নিজের পিতার সম্বন্ধে আর একজনের মনে অশ্রদ্ধার সৃষ্টি করিয়া লাভ কি? এ চিঠির যুক্তিহীন ক্রোধের আড়ালে যে কি স্বার্থান্ধ ক্ষুদ্রতা লুকাইয়া আছে, তাহা বুঝিতে বিমলার এক মুহূর্ত বিলম্ব হইবে না। তখন পিতার লজ্জায় তাহার নিজের মর্যাদাও যে ধূলায় লুটাইয়া পড়িবে।

অন্য চিঠিখানা তুলিয়া লইয়া সে চোখ বুলাইয়া দেখিল, কিন্তু কে লিখিয়াছে সহসা বুঝিতে পারিল না। স্ত্রীলোকের লেখা চিঠি, নীচে স্বাক্ষর হেমাঙ্গিনী দেবী। বিস্মিত হইয়া পাঠ করিতে করিতে তাহার স্মরণ হইল, সেদিন রাত্রে যাঁহার সহিত পরিচয় হইয়া গিয়াছে, ইনি সেই অনুপমের জননী হেমাঙ্গিনী দেবী।

এই সময়ে ঘরের বন্ধ দ্বারে ঘা পড়িল।

ঠাকুরপো, দোর বন্ধ কেন? চিঠি কোত্থেকে এল?

রবিবারে কলেজের রান্না নাই বলিয়া বিমলা প্রায় বেলা নয়টা পর্যন্ত পূজা-অর্চনায় কাটাইত। এইমাত্র পূজার ঘর হইতে বাহির হইয়া ঝির মুখে চিঠি আসার খবর পাইয়া কিশোরের কাছে খোঁজ লইতে আসিয়াছিল। কিশোরের কাছে চিঠিপত্র যে সাধারণত আসে না, তাহা তাহার অজ্ঞাত ছিল না।

দ্বার খুলিয়া হাতের চিঠিখানা দেখাইয়া কিশোর বলিল, একখানা নেমন্তন্নর চিঠি, হেমাঙ্গিনী দেবী লিখেছেন।

তিনি কে?

অনুপমের মা।

ও, যাঁর কথা সেদিন বলছিলে। তা নেমন্তন্ন কিসের?

কী জানি কিসের নেমন্তন্ন, তা তো কিছু লেখেননি। আর মাত্র একদিনের পরিচয়ে আমাকে নেমন্তন্ন করবার মানেও তো কিছু বুঝতে পারছি না। ছাপানো চিঠি নয়, হাতে লেখা। এই দেখো না।

বিমলা চিঠিখানা হাতে লইয়া দেখিল, ছোট চিঠি, তাহাতে এই কয়টি কথা লেখা আছে,–

বাবা কিশোর,

কাল রবিবার সন্ধ্যায় আমার বাড়িতে সামান্য একটু চা-পানের আয়োজন করিয়াছি। গুটিকয়েক বন্ধু বান্ধব উপস্থিত থাকিবেন। তুমি আসিতে পারিলে বড়ই আনন্দিত হইব। ইতি–

আশীর্বাদিকা
হেমাঙ্গিনী দেবী।

চিঠি ফিরাইয়া দিয়া হাসিতে হাসিতে বিমলা বলিল, তোমার ওপর এঁর ভারি মায়া পড়ে গেছে দেখছি, একেবারে বাবা কিশোর লিখে ফেলেছেন। একটু সাবধানে থেকো, ঠাকুরপো।

কিশোর বলিল, হুঁ, সেদিন মায়ার ঠেলায় ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিলেন। বলিতে বলিতে তাহার মুখখানা মলিন হইয়া গেল। স্মরণ হইল, এই স্ত্রীলোকটিই সেদিন বলিয়াছিলেন যে, তাহার বাবা তাহার পর হইয়া গিয়াছেন। কথাটা তখন তাহার ভাল লাগে নাই।

বিমলা তাহার মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, মুখখানা শুকনো শুকনো দেখছি। রাত্রে কি ঘুম ভাল হয়নি?

কিশোর মাথা নাড়িয়া বলিল, না, ঘুম বেশ হয়েছিল, এই মহিলাটির কথা ভেবেই মনটা খারাপ। হয়ে যাচ্ছে। কি জন্যে নিমন্ত্রণ কিছুই জানি না—চা পানও করি না—আমার যাওয়াটা কি উচিত হবে?

বিমলা বলিল, সে কি কথা, যেতে হবে বৈকি! চা না হয় না খাবে। তুমি কুঁড়ে মানুষ, কোথাও যেতে হলেই তোমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে—এক ঐ বাড়ি ছাড়া। বলিয়া অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া জানালার দিকে দেখাইল।

কিশোর কী একটা প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিল, বিমলা বাধা দিয়া বলিল, তোমার কৈফিয়ত শোনবার এখন আমার সময় নেই। উনুন জ্বলে যাচ্ছে, রান্না চড়াতে চললুম। বলিয়া হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল।

10

সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে হেমাঙ্গিনী দেবীর হাতিবাগানের বাড়ির দ্বিতলে একখানা বড় ঘরে গুটি দশ-বারো ভদ্রলোক ও মহিলা জড় হইয়াছিলেন। সকলে বিশিষ্ট পারিবারিক বন্ধু, বাহিরের লোক কেহ ছিল না। সুহাসকে লইয়া বিনয়বাবু উপস্থিত ছিলেন, দীনবন্ধুবাবুও আসিয়াছিলেন। ঘরের স্থানে স্থানে দুইজন বা তিনজন অতিথি একত্র হইয়া নিম্নকণ্ঠে বাক্যালাপ করিতেছিলেন, সকলের সম্মিলিত অনুচ্চ কণ্ঠস্বরে ঘরের মধ্যে একটি অস্ফুট গুঞ্জন উঠিতেছিল। গৃহকর্ত্রী সোনার নাকটেপা। চশমা আঁটিয়া চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন এবং মাঝে মাঝে ইহাকে উহাকে সম্বোধন করিয়া আপ্যায়িত করিতেছিলেন। অনুপমচন্দ্র আকাশে চক্রায়মান চিলের মত সুহাসিনীকে কেন্দ্র করিয়া ঘরময় পরিভ্রমণ করিতেছিল।

ঘরের প্রায় মধ্যস্থলে একটা কৌচের উপর সুহাসিনী এবং আর একটি মেয়ে বসিয়া গল্প করিতেছিল। মেয়েটির নাম করবী, সে অনুপমের মামাত বোন। এতদিন দার্জিলিঙে মেয়েদের এক কনভেন্টে থাকিয়া পড়াশুনা করিতেছিল; এখন হঠাৎ কি খেয়াল হইয়াছে তাই লেখাপড়ায় ইতি করিয়া দিয়া বাপের কাছে চলিয়া আসিয়াছে। আজিকার এই অনুষ্ঠানের সে-ই প্রধান উপলক্ষ্য।

করবী মেয়েটি বয়সে সুহাসিনীর সমান কি এক-আধ বছরের ছোটই হইবে। ছোটখাটো গোলগাল গড়ন, চাঁপাফুলের মত রঙ, মুখে চোখে বেশ একটি শ্রী আছে,—এই মেয়েটি সহজে ছোট বড়। সকলের হৃদয় জয় করিয়া লইতে পারিত। বাপ-মা আত্মীয়স্বজনের

অতিরিক্ত আদর ও বিলাতী স্কুলের শিক্ষার গুণে সে একটু ফাজিল ও স্বেচ্ছাপরায়ণ হইয়া পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু সত্যকার মন্দ তাহার স্বভাবে কিছু ছিল না বলিয়া সকলেই তাহা ছেলেমানুষী মনে করিয়া উড়াইয়া দিতেন।

করবী সুহাসিনীর কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিতেছিল, হাসিদি, তোমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে বড্ড ইচ্ছে করছে, ভাই।

সুহাসিনী বলিল, ছেলেমানুষী করিসনি, করবী! এত লোকের সামনে তোর কি একটু লজ্জাও নেই! তার চেয়ে স্কুলের গল্প বল শুনি।

করবী বলিল, সে হবে খন। কদ্দিন পরে দেখা বল তো, একটা চুমুও খাব না। আচ্ছা, এত লোকের সামনে যদি তোমার লজ্জা করে, ঐ পাশের ঘরটায় চলো। ও ঘরে কেউ নেই।

হাসিয়া ফেলিয়া সুহাসিনী বলিল, কি পাগল তুই বল দেখি! না না, চুমু খেতে হবে না। আমি এখন ঐ জন্যে উঠে যেতে পারব না। তারপর তাহার ডালিম-ফুলের রঙের টকটকে লাল সিল্কের শাড়িখানার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, কি চমৎকার রঙ তোর শাড়িখানার! কবে কিনলি?

চুম্বনের কথা ভুলিয়া করবী আহ্লাদিত হইয়া বলিল, বেশ রঙ-না? কিনিনি, বাবা প্রেজেন্ট করেছেন। দাম বেশী নয় ভাই—পঁচাত্তর। তুমি যদি কেননা, বলে দিতে পারি কোন দোকানে পাওয়া যায়। আমি নিজে গিয়ে রঙ পছন্দ করে নিয়েছি কিনা।

সুহাসিনী বলিল, আমি এ রঙের কাপড় নিয়ে কি করব?

কেন পরবে।

সুহাসিনী হাসিল, দূর! আমাকে রক্ষেকালীর মত দেখাবে যে!

মাথা নাড়িয়া করবী বলিল, কখনো না, কখখনো না, চমক্কার দেখাবে। তুমি কি কালো? না, আমি গোরাচাঁদ বলিয়া সুহাস মুখে একটু হাসিল বটে, কিন্তু মনে তাহার সে হাসির ছায়া পড়িল না। এই আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত নিজের কালো রঙের জন্য কোনদিন তাহার মনে দুঃখ হয় নাই। কিন্তু ইদানীং কি জানি কেন, প্রায়ই নিজেকে কুরূপা মনে করিয়া সে ভারি বিষণ্ণ হইয়া পড়ে।

দরজার কাছে একটা শব্দ শুনিয়া দুজনে একসঙ্গে চোখ তুলিয়া দেখিল, টিলা আস্তিনের পাঞ্জাবি গায়ে গৌরবর্ণ দীর্ঘায়তন একটি যুবা দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

চশমার উপর দিয়া তাহাকে দেখিতে পাইয়া হেমাঙ্গিনী সাদরে আহ্বান করিলেন, এসো বাবা, এসো।

সুহাসিনীর গায়ে ঠেলা দিয়া চুপি চুপি করবী বলিল, কে ভাই, হাসিদি? তুমি চেনো?

সুহাস কিন্তু উত্তর দিল না, প্রশ্নটা বোধ করি শুনিতেই পাইল না। তাহার চোখের সম্মুখ হইতে একটা কালো পর্দা সরিয়া যাইতেছিল। আজিকার এই অনুষ্ঠানে যে কিশোর নিমন্ত্রিত হইতে পারে, ইহা তাহার অতিদূর কল্পনাতেও আসে নাই। অনুপমের সহিত কিশোরের যেরূপ আলাপ, তাহাকে আলাপ না বলিয়া বিরোধ বলিলেই ভাল হয়। হেমাঙ্গিনীর সঙ্গেও মাত্র একদিনের দেখাশুনা, ইহারই মধ্যে এমন কিছু অন্তরঙ্গতা জন্মিতে পারে না—যাহাতে এই পারিবারিক ক্রিয়ায় কিশোরকে নিমন্ত্রণ না করিলেই নহে। অথচ তাহাকে ঐ দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া কিছুই আর সুহাসিনীর কাছে গোপন রহিল না। বিদ্যুৎ-বিকাশের মত এই ব্যাপারের সমগ্র নিগুঢ়তা তাহার অন্তরপটে প্রকট হইয়া পড়িল। সেদিন কিশোরের প্রতি হেমাঙ্গিনীর অযাচিত সহৃদয়তার আতিশয্য দেখিয়া সুহাসিনী কিছু বিস্মিত হইয়াছিল, আজ আর তাহার হেতু বুঝিতে তিলমাত্র বিলম্ব হইল না।

মর্মভেদ করিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস তাহার কণ্ঠ পর্যন্ত ঠেলিয়া উঠিল, কিন্তু সে তাহা বাহির হইতে দিল না। করবীর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি বলছিলে?

এবার করবীর নিকট হইতে কোন উত্তর আসিল না। সুহাস দেখিল, সে সম্মুখদিকে একটু ঝুঁকিয়া বিভক্ত ওষ্ঠাধরে উৎসুক দৃষ্টিতে কিশোরের দিকে চাহিয়া আছে।

এই সময় হেমাঙ্গিনী করবীর দিকে ফিরিয়া ডাকিলেন, করবী, এ দিকে আয়। কিশোরের সঙ্গে তোর পরিচয় করিয়ে দিই।

কিশোরও সঙ্গে সঙ্গে এ দিকে ফিরিয়াছিল, সুহাসিনীকে দেখিয়া স্মিতমুখে হাত তুলিয়া নমস্কার করিল।

করবী সহাস্যমুখে চঞ্চলপদে উঠিয়া গেল; সুহাসিনী কিন্তু কিশোরের নমস্কার ফিরাইয়া দিতেও পারিল না, অব্যক্ত ব্যথার ভার বুকে লইয়া নতমুখে পাথরের মত শক্ত হইয়া বসিয়া রহিল।

হেমাঙ্গিনী বোধ হয় কিশোরের জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলেন, এবার তাঁহার ইঙ্গিত পাইয়া তকমা-আঁটা দুজন বেয়ারা চায়ের পাত ও রূপার ট্রেতে করিয়া কেক্‌, প্যাটি ইত্যাদি নানাবিধ খাবার লইয়া অতিথিদের দিতে লাগিল।

কিশোর ও করবী তখন ঘরের এক কোণে গল্প আরম্ভ করিয়াছিল, বেয়ারা উপস্থিত হইলে করবী একটা পেয়ালা তুলিয়া লইয়া কিশোরের দিকে আগাইয়া দিয়া বলিল, এই নিন, কিশোরবাবু।

কিশোর লজ্জিতভাবে বলিল, ওটা আপনি নিন, আমি চা খাইনে।

চা খান না! চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া করবী তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল।

কিশোর হাসিয়া বলিল, ঘোর অসভ্যতার লক্ষণ সন্দেহ নেই, কিন্তু চা খেলেই আমার মাথা ধরে।

করবী আরও কিছুক্ষণ হাঁ করিয়া থাকিয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসি থামিলে বলিল, চা খান না, আপনি তো ভারি আশ্চর্য মানুষ। আমি দিনে অন্তত দশ পেয়ালা খাই। আচ্ছা, একটা কেক খান, নইলে পিসীমা দুঃখ করবেন।

তা বরং খাচ্ছি বলিয়া কিশোর সন্তর্পণে ট্রে হইতে একটা মিষ্টান্ন তুলিয়া লইল।

করবী নিজের পেয়ালার কানায় একবার ওষ্ঠ স্পর্শ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনি আগে কোথায় থাকতেন?

মৃদু হাস্যে কিশোর বলিল, চা খাই না বলে নিশ্চয়ই আপনার সন্দেহ হচ্ছে আমি সম্প্রতি কোন জঙ্গল-টঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসছি, কেমন? সত্যি কিনা বলুন?

করবী খুব হাসিতে হাসিতে বলিল, না সে জন্যে নয়, আপনাকে আগে কখনও দেখিনি কিনা, তাই জিজ্ঞাসা করছি।

কিশোর বলিল, দেখেননি, তার কারণ, ইতিপূর্বে আমি আপনাদের সমাজে মেশবার সুযোগ পাইনি, নইলে গত পাঁচ-সাত বছর থেকে আমি বরাবর কলকাতাতেই থাকি।

মাত্র মাসখানেক হল। বিনয়বাবুর সঙ্গে আলাপ হয়েছে, সেই সুত্রেই আপনাদের মত উন্নতিশীল লোকের সঙ্গে মেলামেশা; নচেৎ বস্তুত আমি একজন অতি সেকেলে পদানশীন নেটিব।

করবী যেন হতবুদ্ধি হইয়া বলিল, কিন্তু কিন্তু আপনাকে দেখে—আপনার কথাবার্তায়—

কিশোর হাসিয়া উঠিয়া বলিল, আড়ষ্ট জড়সড় ভাব নেই—এই বলতে চান তো? ওটা আমার স্বভাব, কোন অবস্থাতেই আমি আড়ষ্ট বা জড়সড় হয়ে থাকতে পারি না।

ঘরের এক কোণে সুহাসের তখন চোখ ফাটিয়া জল আসিতেছে, শরীর এত খারাপ বোধ হইতেছে। যে, ইচ্ছা হইতেছে কোথাও নিরিবিলি পাইলে বালিশে মুখ গুঁজিয়া শুইয়া পড়ে। এদিকে অনুপম কখন ঘেঁষিয়া ঘেঁষিয়া তাহার পাশে আসিয়া বসিয়াছে এবং কতকগুলা অর্থহীন কথা অবিশ্রাম তাহার কানের কাছে বকিয়া যাইতেছে; তাহাতে শারীরিক ক্লান্তি যেন আরও দুর্বহ হইয়া উঠিতেছে। ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল, সাড়ে সাতটা; ভদ্রতা বাঁচাইয়া বিদায় লইতে হইলে অন্তত আরও একঘন্টা বসিয়া থাকিতে হয়। সে অধীরভাবে বিনয়বাবুর জন্য একবার চারিদিকে চক্ষু ফিরাইল; দেখিল, তিনি একটা কোণে বসিয়া দীনবন্ধুবাবুর সহিত অত্যন্ত মনোযোগ দিয়া কি কথা কহিতেছেন।

অসুস্থতার অজুহাত দেখাইয়া সকাল-সকাল বাড়ি ফেরা সম্ভব হইবে কিনা ভাবিতেছে, এমন সময় অতি নিকটে কিশোরের কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিল। ফিরিয়া দেখিল, কিশোর ও করবী তাহার পশ্চাতে আসিয়া পাশাপাশি দাঁড়াইয়াছে।

কিশোর বলিল, আমার এবং এঁর পক্ষ থেকে একটি সম্মিলিত আর্জি আপনার কাছে পেশ করতে চাই।

সুহাসিনী হাঁ-না কোন উত্তর না দিয়া ফিরিয়া বসিল, তাহার মনের মধ্যে এক আশ্চর্য ব্যাপার ঘটিল। এতক্ষণ যে-শ্রান্তি তাহার দেহ-মনকে অবসন্ন করিয়া রাখিয়াছিল তাহাই যেন রূপান্তরিত হইয়া কিশোরের প্রতি দারুণ বিরক্তির আকার ধরিয়া দেখা দিল। কিশোরের এই সকৌতুক আবেদনের কোন উত্তর দিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না।

কিশোর পুনশ্চ সহাস্যে আরম্ভ করিল, আমাদের বিনীত আর্জি হচ্ছে এই–

অনুপমবাবু, আমাকে এক গ্লাস জল এনে দিতে পারেন?

এই যে, এখনই দিচ্ছি বলিয়া অনুপম ব্যস্ত সমস্তভাবে আদেশ পালন করিতে ছুটিল।

কিশোর আবার বলিতে যাইতেছিল, সুহাসিনী বলিল, করবী আয়, আমার কাছে এসে বোস! কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

আর আমার আবেদন বুঝি কানেই তুলছেন না? বলিয়া কিশোর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

বিরক্তিপূর্ণ অবজ্ঞায় সুহাসিনী চোখ তুলিয়া বলিল, কী বলতে চান, সোজা করে বলুন।

কিশোরের মুখের হাসি মিলাইয়া গেল, সে অপ্রস্তুতভাবে বলিল, একখানা গান গাইতে বলছিলুম।

তাহার অদ্ভুত স্পর্ধায় সুহাসিনী যেন অবাক হইয়া গেল, ভ্রু তুলিয়া শুধু একবার বলিল, গান? তারপর গভীর বিরক্তিতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া পাশে উপবিষ্টা করবীর সহিত কথা কহিবার উদ্যোগ করিল।

কিশোর সুহাসিনীর কথার ধরন কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বলিল, হ্যাঁ, আমরা এতক্ষণ বলাবলি করছিলুম যে, আপনি যদি একখানা গান করেন–

তড়িদ্বেগে তাহার দিকে ফিরিয়া তীক্ষ্ণ অনুচ্চকণ্ঠে সুহাসিনী বলিল, আপনি কি মনে করেন, আমি পেশাদার গাইয়ে?

কিশোর ক্ষণকালের জন্য স্তম্ভিত হইয়া গেল; সুহাসিনীর কণ্ঠের যে সুরটা সে এতক্ষণ ধরিতে পারিতেছিল না, তাহা তীক্ষ্ণ হইয়া তাহার কানে গিয়া বাজিতেই অপমানে তাহার মুখ-চোখ লাল হইয়া উঠিল। সে স্থিরদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ সুহাসিনীর দিকে চাহিয়া থাকিয়া সংযত স্বরে বলিল, আমায় মাপ করবেন। এ কথায় যে আপনি উত্ত্যক্ত হবেন তা আমি বুঝতে পারিনি। বলিয়া আস্তে আস্তে গিয়া একটা জানালার সম্মুখে দাঁড়াইল।

সুহাসিনীর মনে হইল, সে বুঝি এবার ভাঙিয়া পড়িবে। দুই হাতে কপাল টিপিয়া ধরিয়া সে হেঁটমুখে ভাবিতে লাগিল—আজ তাহার কি হইয়াছে? কেন সে এমন সৃষ্টিছাড়া ব্যবহার করিয়া বসিল?

এই নাও জল।

অনুপমের কথায় মুখ তুলিয়া সুহাসিনী বলিল, জল? জল কি হবে?

হতবুদ্ধি অনুপম বলিল, তুমি যে চাইলে?

ও–হ্যাঁ, আচ্ছা দিন বলিয়া গ্লাস লইয়া এক নিশ্বাসে সব জলটুকু পান করিয়া গ্লাস ফিরাইয়া দিল।

অনুপম প্রস্থান করিলে সহসা করবীর তীব্রকণ্ঠে সুহাসিনী চমকিয়া উঠিল। করবী সুন্দর মুখখানা রাঙা করিয়া বলিল, কিশোরবাবুকে অমন স্নাব করলে কেন বলো তো?

ক্ষীণকণ্ঠে সুহসিনী বলিল, কী করেছি?

ক্রুদ্ধকণ্ঠে করবী বলিল, অপমান করেছ। গান গাইতে বলে তোমার কী অসম্মানটা উনি করেছিলেন শুনি? আমার কথাতেই উনি তোমায় অনুরোধ করতে এসেছিলেন, নইলে আসতেন, না।

সুহাসিনীর ভয় হইল, সে এবার বিষম একটা কিছু করিয়া ফেলিবে। তাই ব্যগ্রভাবে করবীর হাত চাপিয়া ধরিয়া ভগ্নকণ্ঠে বলিল, করবী, বাবাকে একবার বল তো, আমি এখনই বাড়ি যেতে চাই।

সুহাসিনীর শুষ্ক শ্রীহীন মুখ দেখিয়া মুহূর্তে করবীর ক্রোধ গলিয়া জল হইয়া গেল, সে বিগলিত অনুশোচনার কণ্ঠে বলিল, আমি বুঝতে পারিনি, সুহাসদি, মাপ করো আমাকে। তোমার শরীর। খারাপ হয়েছে! যে গরম এই ঘরটা—যেন অগ্নিকুণ্ড। চলো পাশের ঘরে, এখনই ঠিক হয়ে যাবে। বলিয়া তাহার কোমর জড়াইয়া ধরিয়া একরকম টানিতে টানিতে পাশের ঘরে লইয়া গেল।

সেখানে ভিতর হইতে দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া জোর করিয়া গায়ের জামা আগা করিয়া দিতে দিতে বলিল, হবে না? কি করে এটাকে বেঁধেছ বলো দেখি, একেবারে কেটে বসে গেছে যে! তারপর। তাহার মুখে-চোখে জল দিয়া হেলান-দেওয়া একখানা চেয়ারে বসাইয়া মাথার উপর পাখা খুলিয়া দিল।

মিনিট কুড়ি পরে সুহাস যখন করবীর হাত ধরিয়া বাহিরে আসিল, তখন সে অনেকটা সুস্থ হইয়াছে। সকলেই উল্কণ্ঠিত হইয়া প্রশ্ন করিতে লাগিলেন—কি হইয়াছিল? বিনয়বাবু বিহুলভাবে আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, সুহাস, কেমন আছিস মা?

লজ্জিতমুখে সুহাসিনী বলিল, কিছুই তো হয়নি, বাবা। সামান্য একটু—

বিনয়বাবুর পশ্চাতে কিশোর ও দীনবন্ধুবাবু আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, করবী কিশোরের দিকে চাহিয়া বলিল, অনেকক্ষণ থেকে সুহাসদির শরীরটা খারাপ মনে হচ্ছিল, তাই কথা কইতে ভাল লাগছিল না।

তাহার কথার ইঙ্গিত বুঝিয়া কিশোর তৎক্ষণাৎ সুহাসিনীর পাশে গিয়া বলিল, এখন আর শরীর তেমন মনে হচ্ছে না? বেশ ভাল বোধ হচ্ছে?

সুহাসের মুখ সিঁদূরের মত আরক্ত হইয়া উঠিল। সে কোনমতে ঘাড় নাড়িয়া কিশোরের কথার উত্তর দিল, চোখ তুলিয়া তাহার দিকে তাকাইতে পারিল না।

দীনবন্ধু বলিলেন, তোমরা সবাই মিলে ঘিরে দাঁড়িয়ে ওকে আরও অসুস্থ করে তুলবে দেখছি। সুহাস-মায়ী, তুমি আমার কাছে এসো, ঐ জানলাটার সামনে দাঁড়াবে চলো, বেশ হাওয়া পাওয়া যাবে।

কিছুক্ষণ বাদে সাড়ে আটটা বাজিয়া যাইতেই অতিথিরা একে একে উঠিতে আরম্ভ করিলেন। কিশোর উঠিবার উপক্রম করিতেই বিনয়বাবু তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, কিশোরবাবু, একলা পালাবেন না যেন, আমরা এক পাড়ার লোক, একসঙ্গেই যাব। কিশোর সম্মতি জানাইয়া বসিয়া পড়িল। করবী কিশোরের পাশে আসিয়া বলিল, আবার কবে আসছেন বলুন! কিশোর ইতস্তত করিতেছে দেখিয়া করবী বলিল, না, সে হবে না,

আসতে হবে। আমাদের বাড়িতেও যাওয়া চাই। কবে যাবেন বলুন। শিগগির না গেলে আমি কিন্তু আপনাদের বাড়ি গিয়ে উৎপাত আরম্ভ করব।

কিশোর উৎসাহ দেখাইয়া বলিল, বেশ তো, বেশ তো। আমি ভারি খুশি হব আপনি এলে। বৌদিদিও খুশি হবেন।

করবী বলিল, আচ্ছা বেশ, কিন্তু আগে আপনার যাওয়া চাই।

কিশোর হাসিয়া বলিল, আচ্ছা, তাই হবে।

ওদিকে হেমাঙ্গিনী সহানুভূতিপূর্ণ স্বরে সুহাসিনীকে বলিতেছিলেন, হঠাৎ শরীর খারাপ হল, ভেতরে ভেতরে কোনও রোগ না জন্মে থাকে। তোমার বাবাকে বলি, এই বেলা ডাক্তার দেখানো হোক বাপু। এলাকাড়ি দিয়ে শেষে কী থেকে কী হয়ে পড়বে।

মাথা নাড়িয়া সুহাস বলিল, এমন কিছুই তো হয়নি মাসীমা, আপনি কেন এত ব্যস্ত হচ্ছেন? ঘরটা গরম হয়ে উঠেছিল তাই নিজেকেও সে এই কথাটাই তখন হইতে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছিল।

অনুপম বুকে হাত বাঁধিয়া গম্ভীর-চিন্তিত মুখে দাঁড়াইয়া ছিল, সে বলিল, ও কোন কাজের কথা নয়। আমার বিশ্বাস ও পাড়াটা তোমার সুট করছে না, একটু চেঞ্জ দরকার। আমি বলি, এই সময় যদি কিছুদিনের জন্যে শিমুলতলা বা দেওঘরে—

সুহাসিনী হাসিয়া ফেলিল।

আর কেহ কিছু সন্দেহ না করিলেও হেমাঙ্গিনীর ন্যায় চতুরা নারী সুহাসিনীর আকস্মিক অসুস্থতার একটা হেতু বোধ হয় অনুমান করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি সেকথা আভাসে ইঙ্গিতেও প্রকাশ পাইতে দিলেন না। শুধু বলিলেন, ভাল হলেই ভাল মা। কিন্তু শরীরের ওপর একটু নজর রেখো। আজ তোমার মা নেই, তাই আমায় বলতে হচ্ছে, তিনি থাকলে আমায় একটা কথাও বলতে হত না। আমার মত দশটা মেয়েমানুষের বলা কওয়ার ভার তিনি একলাই নিতে পারতেন।

স্বর্গীয়া বান্ধবীর প্রতি এই শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া তিনি একটি গভীর নিশ্বাস মোচন করিলেন।

.

বিনয়বাবুর জন্য ট্যাক্সি ডাকা হইয়াছিল।

দীনবন্ধুর সঙ্গে গল্প করিতে করিতে তিনি নীচে নামিয়া গিয়াছিলেন। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়াইয়া সুহাস ও করবী কথা কহিতেছিল, কিশোর হেমাঙ্গিনীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল। ঘরে তখনও কয়েকজন অতিথি বসিয়া ছিলেন।

সুহাস বলিল, আচ্ছা, চললুম, ভাই। শিগগির একদিন যাস, নইলে ভারি রাগ করব বলিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল।

কিশোরের দিকে ফিরিয়া করবী বলিল, আপনাকেও আমার ঐ কথা, শিগগির যাবেন, নইলে ভারি রাগ করব।

আচ্ছা-নমস্কার।

গুড নাইট বলিয়া করবী হাত বাড়াইয়া দিল। হাসিতে হাসিতে শেক-হ্যাণ্ড করিয়া কিশোরও বলিল, গুড নাইট।

দুধারে দেয়াল দেওয়া সঙ্কীর্ণ সিঁড়ি। কিশোর সিঁড়ির মোড় পর্যন্ত নামিয়া গিয়া দেখিল, বাঁকের নীচেই দেয়ালে ভর দিয়া সুহাস চোখ বুজিয়া দাঁড়াইয়া আছে। একলাফে তাহার কাছে গিয়া কিশোর জিজ্ঞাসা করিল, কী হয়েছে?

সুহাসের চোখের পাতা দুবার কাঁপিয়া খুলিয়া গেল, ঠোঁট দুটিও কাঁপিতে লাগিল, সে অতি অস্পষ্ট স্বরে বলিল, বুক বড় ধড়ফড় করছে আর পা কাঁপছে।

আমার হাত ধরুন বলিয়া কিশোর নিজেই তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, আমার হাত ধরে আস্তে আস্তে নামতে পারবেন?

নামিবে কি, কিশোরের হাত তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিবামাত্র সে থরথর করিয়া কাঁপিয়া সিঁড়ির উপরেই বসিয়া পড়িল। আজ জীবনে এই প্রথম কিশোরের স্পর্শ অনুভব করিয়া তাহার বুকের মধ্যে যেন কত দিনের নিরুদ্ধ কান্নার বেগ গুমরিয়া উঠিল; এবং তাহার কুমারী-হৃদয়ের একান্ত অপরিচিত একটা দুর্দম বাসনা শরীরকে শিথিল অবশ করিয়া দিল। কিশোরের বুকের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিয়া তাহার বুক ভিজাইয়া দিবার বাসনা যে কতদূর নিন্দনীয়, তাহা অনুভব করিয়া সে যেন অর্ধেক চৈতন্য হারাইয়া ফেলিল।

তাহাকে কাঁপিয়া বসিয়া পড়িতে দেখিয়া কিশোর আর দ্বিধা করিল না, দুই বাহু দিয়া স্বচ্ছন্দে শিশুর মত তাহাকে তুলিয়া লইল। মুহূর্তকাল এইভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে সন্তর্পণে সিঁড়ি দিয়া নামিতে লাগিল। সুহাসের গলার আওয়াজ একেবারে বুজিয়া গিয়াছিল, তাই ওজর-আপত্তির একটা কথাও সে উচ্চারণ করিতে পারিল না; সুখে আতঙ্কে হর্ষে শঙ্কায় কণ্টকিত হইয়া বেপমান বক্ষে কিশোরের বুকের উপর চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল।

সিঁড়ির নীচে পৌঁছিয়া সুহাস চুপিচুপি বলিল, এবার নামিয়ে দিন।

সন্তর্পণে তাহাকে নামাইয়া দিয়া কিশোর বলিল, এখন অনেকটা ভাল বোধ হচ্ছে, কেমন? বারান্দা পেরিয়ে গাড়িতে উঠতে পারবেন কি?

পারব।

আচ্ছা, তবে আমার হাত ধরে আসুন।

কিশোরের হাত ধরিয়া স্বপ্নাবিষ্টার মত সুহাসিনী গাড়িতে গিয়া উঠিল। বিনয়বাবু গাড়িতে বসিয়া অপর দিকে দণ্ডায়মান দীনবন্ধুবাবুর সহিত তখনও বাক্যালাপ চালাইতেছিলেন; সুহাসিনী আসিয়া তাঁহার পাশে বসিতে তিনি বলিলেন, আচ্ছা দীনবন্ধু, তাহলে–

দীনবন্ধু বলিলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, কাল-পরশুর মধ্যে আমি যাব, তখন আবার কথা হবে। দীনবন্ধুর গৃহ অন্যদিকে, তিনি আচ্ছা—চললুম বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

বিনয়বাবু বলিলেন, কিশোরবাবু, সামনে বসতে হবে না, এইখানেই আসুন। তিনজনের যথেষ্ট জায়গা হবে।

সুহাসিনী সঙ্কুচিত হইয়া পিতার দিকে একটু সরিয়া বসিল, কিশোর তাহার পাশের খালি জায়গাটায় গিয়া উপবেশন করিল।

পথে যাইতে বেশী কথা হইল না, কিশোর একবার শুধু বলিল, এঁর স্বাস্থ্য বোধ হয় ডাক্তার দিয়ে ভাল করে পরীক্ষা করানো দরকার। রোগ কিছু আছে আমি মনে করি না— তবু–

বিনয়বাবু বলিলেন, দীনবন্ধুর সঙ্গে এই কথাই হচ্ছিল। আমি তো আজ বড় ভয় পেয়ে গেছি। কখনও এমন হয় না—আজ হঠাৎ–না, কালই ডাক্তার ডাকব।

সিঁড়ির ঘটনাটা কিশোর ইচ্ছা করিয়াই উল্লেখ করিল না; বৃদ্ধ তাহাতে আরও ব্যাকুল হইয়া পড়িবেন কিন্তু লাভ কিছু হইবে না।

গাড়ি প্রায় বাড়ির কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে এমন সময় কিশোর অনুভব করিল, গাড়ির ভিতরকার অন্ধকারে নরম একখানি হাত নিঃশব্দে আসিয়া তাহার হাতের মধ্যে প্রবেশ করিল; কিন্তু তাহা মুহূর্তের জন্য। এই নীরব কৃতজ্ঞতা ও অনুতাপের নিদর্শন স্বীকার করিয়া হাতে একটু সস্নেহ চাপ দিতেই হাতখানি ত্রস্ত হইয়া ফিরিয়া গেল।

রাত্রে বিছানায় শুইয়া বুকের উপর দুই হাত রাখিয়া সুহাসিনী আজিকার এই নূতন উপলব্ধি সমস্ত ইন্দ্রিয় জাগ্রত করিয়া আস্বাদ করিতে করিতে ভাবিতে লাগিল। বিস্ময়েরও যেমন তাহার অবধি ছিল না, মনের এই জাজ্বল্যমান অবস্থা সে যে এত দিন দেখিতে পায় নাই, সে জন্য ক্ষোভেরও তেমনই। শেষ ছিল না। সুখ, বিস্ময়, কৌতুক, লজ্জা কত রসই তাহার বুকের উপর দিয়া ঢেউয়ের মত বহিয়া গেল তাহার অন্ত নাই। নিজের অন্ধকার শীতল শয্যায় একা শুইয়া সে নির্লজ্জভাবে মনের রাশ ছাড়িয়া দিল।

তারপর অনেক রাত্রে নিবিড়ভাবে বালিশটা জড়াইয়া লইয়া যখন সে ঘুমাইবার চেষ্টা করিল, তখন একজনের সুদৃঢ় বাহুবন্ধন ও করস্পর্শের স্মৃতি তাহার নিদ্রাকে আরও নিগুঢ় রসাপ্লুত করিয়া তুলিল।

১১

অনুপম প্রস্তাব করিবার পর হইতেই সুহাসিনীর বিবাহের কথাটা থাকিয়া থাকিয়া বিনয়বাবুর মনে তীক্ষভাবে খোঁচা দিয়া যাইতেছিল। আর যে বিলম্ব করা উচিত নহে, সুহাসের জন্য একটি সৎপাত্র দেখা দরকার, এই চিন্তা একটা শারীরিক অস্বস্তির মত তাঁহার চেতনার পিছনে লাগিয়া ছিল। অথচ কী করিতে হইবে, কোথায় ভাল পাত্র পাওয়া যায়, এ সকল বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান এতই সঙ্কীর্ণ যে কার্যত কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না।

দীনবন্ধুবাবু তাঁহার বহুদিনের পুরাতন বন্ধু, কর্মস্থলে থাকাকালেই তাঁহার সহিত সম্প্রীতি জন্মিয়াছিল। কার্যোপলক্ষে দীনবন্ধুবাবুকে তখন মাঝে মাঝে ও অঞ্চলে যাইতে হইত; তিনি। বিনয়বাবুর গৃহেই আতিথ্য স্বীকার করিতেন। সুহাসিনী সেই সময় ফ্রক পরিয়া বাড়ির উঠানময় ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিয়া বেড়াইত। তাহার সুহাস-মায়ী নামটা সেই কালের।

চা-পার্টির রাত্রে দীনবন্ধুকে আড়ালে পাইয়া বিনয়বাবু নিজের সমস্ত দুশ্চিন্তা ও দুভাবনার কথা বন্ধুর কর্ণে ঢালিয়া দিলেন। দীনবন্ধুবাবুর কাছে তিনি কখনও কোন কথা গোপন করিতেন না। অনুপমের প্রস্তাব ও সুহাসিনীর প্রত্যাখ্যানের কথাও প্রকাশ করিয়া বলিলেন।

সমস্ত শুনিয়া দীনবন্ধু বলিলেন, আপনি ঠিকই করেছেন। পাত্র নির্বাচন অবশ্য আমরাই করব। কিন্তু সুহাস-মায়ী এখন বড় হয়েছেন, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধেও কিছু হতে পারে না। কাজেই তিনি যাকে অপছন্দ করেছেন, অতিবড় সৎপাত্র হলেও তাকে ত্যাগ করতে হবে। সুহাস-মায়ী যে বিবাহের অবস্থা। প্রাপ্ত হয়েছেন, তা আমিও লক্ষ্য করেছি; কিন্তু আমি আশা করেছিলুম খোঁজাখুঁজির দরকার হবে না, ও সমস্যাটার আপনিই সমাধান হয়ে যাবে। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় না যে, বিশেষ কাউকে মনে মনে পছন্দ করেন বলেই সুহাস-মায়ী সেদিন। অনুপমকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন?

বিনয়বাবু মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া বলিলেন, না, আমার তো তা মনে হয় না। সে রকম ছেলে কে-ই বা আছে যাকে সুহাস; তবে আমি অন্যমনস্ক লোক, ভাল করে লক্ষ্য করিনি, তাও হতে পারে।

দীনবন্ধুবাবু অন্যমনস্ক লোক নহেন, তিনি ভাল করিয়াই চারিদিক লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু আপাতত কিছু না বলিয়া সব দিক ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিবেন বলিয়া বিনয়বাবুকে আশ্বাস দিলেন। সে রাত্রে কথা এইখানেই স্থগিত রহিল।

পরদিন প্রাতে বিনয়বাবু চিঠি লিখিয়া দীনবন্ধুকে ডাকিয়া আনাইলেন। দীনবন্ধু আসিয়া শুনিলেন, একজন বিখ্যাত মহিলা-ডাক্তার ডাকা হইয়াছে, তিনি উপরের ঘরে সুহাসিনীর স্বাস্থ্য পরীক্ষায় নিযুক্ত আছেন।

অল্পক্ষণ পরে ডাক্তার মিসেস সরকার নামিয়া আসিলেন। স্ত্রীলোকটির বয়স হইয়াছে—এম. ডি. ডাক্তার; নির্ভীক স্পষ্টবাদিতা সত্ত্বেও সুচিকিৎসার গুণে শহরের সম্ভ্রান্ত ও অত্যাধুনিক সমাজে অনেক পুরুষ-ডাক্তার অপেক্ষাও অধিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। বিনয়বাবুর উৎকণ্ঠিত মুখের দিকে চাহিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন, Nothing wrong, আপনি চিন্তিত হবেন না। আপনার মেয়ের স্বাস্থ্য খুব ভাল। এমন clean-limbed healthy girl আমি খুব অল্পই দেখেছি, বিশেষত, আজকালকার এই সব tea-swelling cinema-mad modern মেয়েদের মধ্যে। She is a perfect innocent too! ডাক্তার সরকার সকৌতুকে হাসিলেন, না, ওষুধ-বিষুধ দরকার নেই। কতকগুলো patent medicine গিলিয়ে ওর অমন সুন্দর system নষ্ট করে দিতে চাই না।

বিনয়বাবু বলিলেন, কিন্তু কাল রাত্রে–

ডাঃ সরকার বলিলেন, ও কিছু নয়-momentary excitement, এ বয়সে এমন হয়ে থাকে। Girls will be girls, you know. কোন কারণে মানসিক উত্তেজনা হয়েছিল তাই she felt faint. You need nt wory about that, আচ্ছা, উঠলুম তবে। যন্ত্রপাতির ব্যাগটা লইয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, আর দেখুন, একটা কথা বলতে চাই, কিছু মনে করবেন না। আপনারা হয়তো মেয়েকে পঁচিশ বছরের করে বিয়ে দেবার পক্ষপাতী। কিন্তু সব দিক দেখেশুনে, দেশের জলহাওয়া বিবেচনা করে আমার মনে হয়—সেটা মেয়েদের স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর। অনাগত-যৌবনার বিবাহ দেওয়া যেমন ক্ষতিকর, বিগত-যৌবনারও তাই। সব জিনিসেরই দুটো extreme আছে মানেন তো?–

আচ্ছা, Good bye! Gratuitous advice দেওয়া আমার একটা অভ্যাস-I hope you dont mind-নমস্কার। বলিয়াই ভিজিট লইয়া সহস্যমুখে তিনি প্রস্থান করিলেন।

বিনয়বাবু হাঁফ ছাড়িয়া বলিলেন, যাক, একটা দুভাবনা দুর হল। দীনবন্ধু বলিলেন, দুর্ভাবনা আপনারই হয়েছিল, আমার কস্মিন কালেও হয়নি। সে যাক, ডাক্তার সরকার বিবাহ সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত দিয়ে গেলেন, সে-ও তো আমাদেরই মনের কথা, কালই এ বিষয়ে আলোচনা হয়ে গেছে। তাহলে ও বিষয়ে আর তর্ক নেই। এখন কথা হচ্ছে, সুহাস-মায়ীর জন্যে একটি ভাল বর দেখা দরকার।

বিনয়বাবু চিন্তিতমুখে বলিলেন, সে তো বুঝেছি, কিন্তু তেমন পাত্র পাওয়া যাচ্ছে কোথায়? তোমার জানাশুনোর মধ্যে এমন কোন–

দীনবন্ধু বলিলেন, সে কথা পরে হবে। তার আগে কী রকম জামাইটি আপনার ঠিক চাই, সেই কথা আমাকে খোলসা করে বলুন তো।

বিনয়বাবু ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন, কী রকম? বিদ্বান, সচ্চরিত্র, স্বাস্থ্যবান হবে, এই আর কি! ভদ্রঘরের ছেলে হবে, একেবারে দীন-দরিদ্র না হয়, আর কলকাতার মধ্যে হয়, তা হলেই ভাল,–মাঝে মাঝে মেয়েটাকে দেখতে পাব। বলিয়া তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন।

দীনবন্ধু হাসিয়া বলিলেন, শেষটাই আপনার আসল কথা, কী বলেন? কিন্তু এসব ছাড়াও আর একটা কথা আছে, সুহাস-মায়ীর পছন্দ হওয়া চাই। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া হঠাৎ প্রশ্ন করিলেন, আচ্ছা, কিশোরকে আপনার কেমন মনে হয়?

বিনয়বাবু যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন, কিশোর? কিশোর?

সহাস্যে দীনবন্ধু কহিলেন, হাঁ কিশোর। চোখের বড় কাছে থাকে বলে নাকটাকে সহজে কেউ দেখতে পায় না। আমার গিন্নী আঁচলে চাবি বেঁধে প্রায়ই বাড়িময় চাবি খুঁজে বেড়ান এবং আমাকে। সন্দেহ করেন। আপনারও তাই হয়েছে, পাশের বাড়ি বলে কিশোরকে লক্ষ্য করেননি।

বস্তুত বিনয়বাবু এ দিক দিয়া কিশোরকে কখনও ভাবিয়া দেখেন নাই। ছেলেটিকে তাঁহার বড় ভাল লাগিয়া গিয়াছিল, যখন তখন তাহাকে ডাকাডাকি করিয়া গল্পগুজবে অথবা জ্ঞানবিষয়ক আলোচনায় সময় কাটাইতেন। সুহাসিনীর সঙ্গে অকুণ্ঠিতভাবে মেলামেশা করিবার সুযোগও কিশোর অন্যান্য পরিচিত বন্ধুদের মত সহজেই পাইয়াছিল। কিন্তু সুহাসিনীর স্বামী হিসাবে তাহার যোগ্যতা-অযোগ্যতার কথা বিনয়বাবু কোন দিন বিচার করিয়া দেখেন নাই। তিনি অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে সোজা হইয়া বসিয়া বলিয়া উঠিলেন, সত্যিই তো! ঠিক তো! হ্যাঁ—এটা অ্যাদ্দিন চোখে পড়েনি! আর ঘরও যে আমাদের পালটি হে! সেদিন কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করেছিলুম, বললে শাণ্ডিল্য পোত্র। চমৎকার ছেলে, দীনবন্ধু, খাসা ছেলে! যেমন স্বাস্থ্য, তেমনই লেখাপড়ায়, আর যার বড় নেই কলকাতার বাসিন্দা। বলিয়া তিনি উত্তেজনার ঝোঁকে হাঁপাইতে লাগিলেন। হঠাৎ এমন মনোমত পাত্র

হাতের এত কাছে পাইয়া আনন্দে তিনি কন্যার বিবাহ দিবার মর্মগত অনিচ্ছাও ভুলিয়া গেলেন। সোৎসাহে আবার বলিলেন, হাতের কাছে এমন ছেলে রয়েছে, আর আমরা চারদিকে হাতড়ে বেড়াচ্ছিলুম! ব্যস্‌, আর দেরি নয়, দীনবন্ধু, তাহলে লাগিয়ে দাও। ছোকরাকে দেখে অবধি আমার যে কী ভাল লেগেছিল, তা আর তোমায় কি বলব। প্রথম থেকেই। বুঝেছিলুম, অমন ছেলে আর হয় না। তাহলে, কি বল দীনবন্ধু, বিবাহের প্রস্তাবটা ওর কাছে—হঠাৎ তাঁহার উৎসাহ বাধাপ্রাপ্ত হইল, থমকিয়া বলিলেন, কিন্তু সুহাস যদি কোন গোলমাল করে। তার যদি মত না হয়।

দীনবন্ধুবাবু সকৌতুকে বিনয়বাবুর এই উত্তেজনা উপভোগ করিতেছিলেন, মৃদুহাস্যে বলিলেন, আমার বিশ্বাস সুহাস-মায়ীর অমত হবে না। আপনি বরং তাকে একবার জিজ্ঞেস করে দেখুন।

বিনয়বাবু বলিলেন, সেই কথাই ভাল। সুহাসকে এইখানেই ডাকা যাক, কী বল? তার যা লেবার আছে আমাদের দুজনের সামনেই বলুক।

দীনবন্ধু হাসিলেন, দুজনের সামনে বলতে হয়তো সে লজ্জা পাবে, তার চেয়ে আপনি বরং ও-ঘরে–

বিনয়বাবু বলিলেন, আচ্ছা বেশ, আমিই না হয় ওপরে গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করে আসছি। আমার কাছে কিছু লুকোবে না, সেদিন অনুপম সম্বন্ধে তো বেশ পরিষ্কারভাবেই–

দীনবন্ধু বলিলেন, এ সব বিষয়ে না বলা যত সহজ, হ্যাঁ বলা তত সহজ নয়। কিন্তু আমি বলছিলুম আপনি বরং তাকে ডেকে দিয়ে পাশের ঘরে গিয়ে বসুন, জিজ্ঞাসাবাদ যা করবার, আমিই করছি। আপনি যে রকম অস্থির হয়ে পড়েছেন, কি বলতে কি বলে বসে থাকবেন, তার ঠিকানা নেই।

না, না, তা বলব কেন? তা বলব কেন? এই সময় তোমার বৌদিদি যদি বেঁচে থাকতেন!—তা আচ্ছা, তুমিই ওকে প্রশ্ন করো, একই কথা—ও ঝি। সুহাসকে একবার এই ঘরে ডেকে দাও তো, বলো দীনবন্ধুবাবু ডাকছেন!—আমি তাহলে পাশের ঘরে রইলুম।

কিছুক্ষণ পরে সুহাসিনী ঘরে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কাকাবাবু, আমাকে ডাকছেন?

দীনবন্ধু নতমুখে চিন্তা করিতেছিলেন, বলিলেন, হ্যাঁ, এসো সুহাস-মায়ী, আমার পাশে এসে বোসো, তোমার সঙ্গে দুটো কথা আছে। সুহাসিনী বিস্মিতভাবে তাঁহার পাশে গিয়া বসিল, বাবা কোথায়?

দীনবন্ধু বলিলেন, তিনি ও-ঘরে আছেন–। সুহাস-মায়ী, তুমি যখন খুব ছোট্টটি ছিলে, পাজামা আর ফ্রক পরে একটা সেলুলয়েডের পুতুল বগলে করে বাড়িময় ছুটাছুটি করে বেড়াতে, তখন আমি মাঝে মাঝে তোমাদের বাড়িতে যেতুম। মনে আছে?

সুহাস ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আছে। আপনিই তো আমাকে ঘুড়ি ওড়াতে আর মার্বেল খেলতে শিখিয়েছিলেন। তখন আমি ভারি দুরন্ত ছিলুম–না?

দীনবন্ধু অতীতের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, তা আমার মনে নেই। কিন্তু সন্ধ্যার পর আমার কোলের কাছটিতে বসে তুমি যে-সব গোপনীয় মনের কথা আমাকে বলতে, তা বেশ মনে আছে।

সুহাসিনী কৌতূহলী হইয়া বলিল, আমার কিন্তু মনে নেই। কি সব মনের কথা বলতুম কাকাবাবু, বলুন না।

দীনবন্ধু বলিলেন, তোমার কি রকম ছেলে চাই, কটা মেয়ে চাই, কত বড় বাড়ি, কখানা মোটর না হলে একেবারেই চলবে না, এই সব গোপনীয় কথা আমাকে বলতে। বড় হয়ে আমার মত একটা ছেলে যে তোমার নিতান্ত দরকার, একথাও তখন বলেছিলে। সেই জন্যই তো তোমাকে সুহাস-মায়ী ছাড়া আর কিছু বলতে পারলুম না।

ছেলে সম্বন্ধে সে-মত আমার এখনও বদলায় নি, কাকাবাবু বলিয়া সলজ্জহাস্যে সুহাসিনী চোখ নীচু করিল।

দীনবন্ধু বলিলেন, সে আমি জানি। কিন্তু একটা কথা তুমি তখন বলনি, বোধ হয় খেয়াল হয়নি। সেইটে আজ তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই।

কী কথা, কাকাবাবু?

দীনবন্ধু গম্ভীরভাবে বলিলেন, আমার মত ছেলে চাও বলেছিলে বটে, কিন্তু ছেলের বাপটি যে কি রকম চাই, তার আভাস দিতে তখন ভুলে গিয়েছিলে। আমারও জেনে নেওয়া হয়নি। কিন্তু এখন যে সেটা জানা দরকার হয়ে পড়েছে, সুহাস-মায়ী।

সুহাসিনীর মাথায় যেন লজ্জার পাহাড় ভাঙিয়া পড়িল। সে আরক্ত নতমুখে বসিয়া ঘামিতে লাগিল।

দীনবন্ধু পূর্ববৎ গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিলেন, ত্রুটি আমারই, তখনই এই বিষয় আমার সবিশেষ অনুসন্ধান করা উচিত ছিল। কিন্তু ভুল যখন হয়ে গেছে তখন তো আর উপায় নেই। মনে করো, আমরা আবার সেই আগেকার দিনে ফিরে গেছি; আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি, আমার বাবাটি কি রকম হলে তোমার পছন্দ হয়? তুমিও সেদিনকার মত মন খুলে সরলভাবে উত্তর দাও দেখি।

সুহাসের চক্ষু বুজিয়া আসিতেছিল, গলাও প্রায় বুজিয়া গিয়াছিল। সে ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, আমি ও-সব কিছু জানি না।

দীনবন্ধু বলিলেন, জানো নিশ্চয়, কিন্তু লজ্জায় বলতে পারছ না। লজ্জা কি মা? তোমার মন না জেনে তত আমরা কিছু করতে পারি না। কিন্তু আর যে জামাই না হলে

আমাদেরও চলছে না। নাও, মুখ তুলে আমার পানে চাও দেখি। বলিয়া সস্নেহে তাহার চিবুক ধরিয়া মুখ তুলিতে গেলেন। প্রত্যুত্তরে সুহাস হেঁট হইয়া তাঁহার জানুর মধ্যে মুখ লুকাইয়া অস্ফুটস্বরে কহিল, না, আমি কিছু বলতে পারব না, কাকাবাবু।

পাগল মেয়ে। এত লজ্জা! দীনবন্ধুবাবু মনে মনে খুশিই হইলেন। আস্তে আস্তে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন, আচ্ছা, কী রকম বর চাই, তা তোমাকে বলতে হবে না— আমিই না হয় বলছি– ।–একটি ছেলেকে আমার আর তোমার বাবার দুজনেরই খুব পছন্দ হয়েছে। তুমিও তাকে চেনো—

সভয়ে সপ্রশ্ননেত্রে সুহাসিনী মুখ তুলিল।

কিন্তু তার সম্বন্ধে তোমার মনের কথা কী, তা না জানা পর্যন্ত আমরা কিছু করতে পারছি না। ছেলেটির নাম কিশোর।

বিদ্যুদ্বেগে আবার সুহাস তাঁহার জানুর মধ্যে মুখ লুকাইল।

দীনবন্ধুবাবু ভিতরে ভিতরে সবই বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু এই কন্যাপ্রতিম মেয়েটির প্রথম অনুরাগের সলজ্জ মধুটুকু উপভোগ করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছিলেন না। তাই এতক্ষণ নানা ছল চাতুর্যের অবতারণা করিয়া এই নবোন্মেষিত হৃদয়ের সরসোজ্জ্বল মাধুর্যটি নিজের পরিণত বয়সের রসোপলব্ধি দ্বারা সানন্দে আস্বাদন করিতেছিলেন। তিনি জোর করিয়া সুহাসের মুখ তুলিয়া ধরিয়া কহিলেন, এবার তো সুহাস-মায়ী, হ্যাঁ না যা-

হোক একটা উত্তর দিতে হবে, আর তো চুপ করে থাকা চলবে না। কিশোরের সম্বন্ধে তোমার মনের কথাটি কী, আমাকে চুপি চুপি বলে ফেলো তো দেখি।

সুহাস উত্তর দিল না, চক্ষু মুদিয়া রহিল।

বলবে না? আচ্ছা, চোখ খুলে চাও। তাও না? তবে তো ভারি মুশকিল। কিশোর বেচারার ভাগ্য পরীক্ষা তাহলে হয় কি করে? ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দীনবন্ধুবাবু যেন কী চিন্তা করিলেন, আচ্ছা, এক কাজ করা যাক। ছেলেবেলার সে-খেলা আমি এখনও ভুলিনি, তোমারও নিশ্চয় মনে আছে। এই আমি চোখ বুজে রইলুম, তোমার উত্তর যদি হাঁ হয় তাহলে একটা চুমু খাবে, আর যদি না হয় তাহলে হাতে একটা চিমটি কাটবে—কি-বলো? ব্যস, এইবার আমি চোখ বুজলুম।

দীনবন্ধুবাবু সুহাসিনীকে ছাড়িয়া দিয়া চক্ষু মুদিত করিলেন। কিয়ৎকাল কিছুই হইল না, তারপর সহসা নিজের কপালে ওষ্ঠাধরের মৃদু স্পর্শে তাড়াতাড়ি চোখ খুলিয়া দেখিলেন, সুহাস বিদ্যুতের মত ঘর ছাড়িয়া পলাইয়াছে।

সুহাস—সুহসা-মায়ী—ডাকাডাকিতে কোনই ফল হইল না। সুহাস তখন নিজের ঘরে সশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

বিনয়বাবু লাইব্রেরি-ঘর হইতে শঙ্কিতভাবে গলা বাড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কী হল?

দীনবন্ধুবাবু পুনশ্চ গাম্ভীর্য অবলম্বন করিয়া বলিলেন, ভয় নেই, আপনি আসুন। আমার যতদূর মনে হল কিশোরকে বিয়ে করতে সুহাস-মায়ীর আপত্তি হবে না।

বিনয়বাবু প্রফুল্ল হইয়া বলিলেন, যাক, এ দিকে তাহলে আর কোন গণ্ডগোল নেই। এখন কিশোরের কাছে কথাটা তুলতে পারলে–

পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া দীনবন্ধুবাবু বলিলেন, সেটা আজ বিকেলবেলা করলেই হবে। আমার কলেজের বেলা হয়ে গেছে, আমি আর বসতে পারব না। উঠলুম। কলেজে অবশ্য তার সঙ্গে দেখা হবে কিন্তু আমি তাকে এ বিষয়ে কিছু বলতে চাই না। আপনি মেয়ের বাপ, বলা কওয়া আপনারই দরকার। যাহোক, বিকেলবেলা আমি আবার আসছি, তখন যথা কর্তব্য স্থির করা যাবে। বলিয়া তিনি গাত্রোত্থান করিলেন।

12

পাঁচটা বাজিতে না বাজিতে দীনবন্ধুবাবু আবার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাহির হইতে কিশোরকে একটা ডাক দিয়া বিনয়বাবুর বাড়িতে প্রবেশ করিতে যাইবেন, এমন সময় একখানা গাড়ি সম্মুখে আসিয়া থামিল। গাড়ি হইতে করবী, অনুপম ও হেমাঙ্গিনী অবতরণ করিলেন। সকলের বেশভূষার কিছু অধিক পারিপাট্য দেখিয়া দীনবন্ধু বুঝিলেন, শুধু এখানে নয়, আর কোথাও যাইবার জন্য ইহারা প্রস্তুত হইয়া বাহির হইয়াছেন।

কথা কহিতে কহিতে সকলে একসঙ্গে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে কিশোরও আসিয়া উপস্থিত হইল; তাহাকে দেখিয়া করবী আনন্দে বলিয়া উঠিল, এই যে, কিশোরবাবুও এসে পড়েছেন—বেশ হয়েছে। আমরা সুহাসদিকে বায়োস্কোপে ধরে নিয়ে যাব বলে এসেছি। আপনিও চলুন।

অনুপমের মুখ অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। কিন্তু দূরদর্শিনী হেমাঙ্গিনী করবীর কথায় সম্পূর্ণ সায় দিয়া। বলিলেন, হ্যাঁ—সেই বেশ হবে। করবীর সঙ্গে সারাক্ষণ কথা কইবার জন্য একজন চাই তো। বায়োস্কোপ দেখতে বসে রাজ্যের যত কথা ওর মনে আসে। আমি বাপু বুড়োমানুষ, ওর সঙ্গে বকতে পারব না। কিশোর, তুমি বাবা ওকে সামলে রেখো।

হেমাঙ্গিনীর সুমিষ্ট কথার মধ্য হইতে ইঙ্গিতটা গোপন রহিল না যে, করবীকে সঙ্গদান করিবার জন্য কিশোরের বায়োস্কোপে যাওয়া চলিতে পারে এবং ইহার ফলে ন্যায়শাস্ত্র

অনুসারে সুহাসিনীকে সঙ্গদান করিবার ভার বাধ্য হইয়া কাহার উপর পড়িবে তাহাও সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়।

এই সহজে অনুমেয় তত্ত্বটি যিনি সর্বাগ্রে বুঝিয়াছিলেন সেই দীনবন্ধুবাবু কিন্তু বাদ সাধিলেন। ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, কিশোরকে আজ তোমাদের ছেড়ে দিতে হবে, করবী। তোমাকে শ্যাপেরোন করবার সৌভাগ্য আজ ওর হল না। ওকে আমার একটু দরকার আছে।

কী দরকার জিজ্ঞাসিত হইয়াও দীনবন্ধুবাবু কিছু ভাঙিলেন না, শুধু বলিলেন, জরুরী কাজ, তা না হলে আটকাতুম না। অনুপম বাবাজী একলা তিনটি মহিলাকে নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়বেন বুঝতে পরছি, কিন্তু উপায় কি?

করবী একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, আপনি সব মাটি করে দিলেন। ভেবেছিলুম আজ বকে বকে কিশোরবাবুর মাথা ধরিয়ে দেব, তা আর হল না। যাহোক, আমার নিমন্ত্রণ পেছিয়ে গেল মাত্র, আর একদিন হবে,—কি বলেন, কিশোরবাবু?

কিশোর স্মিতমুখে সম্মতি জানাইল।

বায়োস্কোপে যাইবার তাড়াতাড়ি বিশেষ ছিল না, তখনও যথেষ্ট সময় ছিল। তাই সকলে মিলিয়া সময় কাটাইবার জন্য গল্পসল্প করিতে লাগিলেন। করবী ও সুহাসিনী ঘরের একটা কোণে গিয়া গল্প জুড়িয়া দিল। তাহাদের মৃদু কথিত গলার আওয়াজ ও মাঝে

মাঝে করবীর হাসির শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। হেমাঙ্গিনী দীনবন্ধুবাবুকে পাকড়াও করিয়া কথাচ্ছলে বুঝাইতে লাগিলেন যে, বর্তমান যুগে স্ত্রীলোক হইয়া বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করা কিরূপ কঠিন ব্যাপার এবং কলিকাতা শহরে ভাড়াটে নামক অর্থপিশাচ জীবগুলার নিকট হইতে মাসিক বাড়িভাড়া আদায় করা কী অমানুষিক ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার কাজ; দীনবন্ধু চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বোধ করি খুব মনোযোগ দিয়াই শুনিতে লাগিলেন।

দৈবক্রমে কিশোর, অনুপম ও বিনয়বাবু পরস্পর কাছাকাছি চেয়ারে বসিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের মধ্যেও দল পাকাইয়া একটা কোন প্রসঙ্গের আলোচনা হওয়া উচিত ছিল; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কোন প্রসঙ্গই জমিতেছিল না। বিনয়বাবু বায়োস্কোপ সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে শিক্ষা বিস্তার লইয়া একটা আলোচনা আরম্ভ করিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু গোড়া হইতেই উৎসাহ ও প্রেরণার অভাবে উহা নির্জীব ভাব ধারণ করিয়া অকালে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল। চুপচাপ মুখোমুখি বসিয়া থাকার অপেক্ষা যাহা হউক কিছু বলা দরকার মনে করিয়া কিশোরও একবার একটা কথা উত্থাপন করিবার চেষ্টা করিল কিন্তু কোথায় এই তিনজনের মনের মধ্যে অনেকখানি সংকোচ ও কুণ্ঠা লুকাইয়া ছিল, অম্লরসের মত তাহা বারংবার তাহাদের ঘনীভূত জল্পনার সকল উদ্যোগই ছিড়িয়া ব্যর্থ করিয়া দিতে লাগিল।

অনুপম এইবার গলাটা সাফ করিয়া লইয়া বলিল, আজ যশোর থেকে আমার এক বন্ধুর চিঠি পেলুম। তিনি কিশোরবাবুকে চেনেন।

কিশোর বলিল, আমাকে চেনেন! কী নাম বলুন তো?

ধনপতি চৌধুরী—ডাক্তার।

কিশোর চিন্তা করিয়া বলিল, কী জানি, আমি তো মনে করতে পারছি না। যশোরে আমি মাত্র একবার গিয়েছি, তাও এমন অবস্থায় যে—।

অনুপম মুখ অত্যন্ত গম্ভীর করিয়া বলিল, আপনি না চিনতে পারেন; তবে যাঁকে আপনি বৌদিদি বলে নিজের কাছে রেখেছেন, তিনি বিলক্ষণ চেনেন।

হঠাৎ ঘরের মধ্য দিয়া যেন একটা বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। কথাটা অনুপম ইচ্ছা করিয়াই বেশ জোর গলায় বলিয়াছিল, তাই সকলেই শুনিতে পাইলেন, এবং কথার অন্তর্নিহিত বক্রোক্তিটাও এতই সুস্পষ্ট যে কাহারও কর্ণকে ফাঁকি দিতে পারিল না। ঘরের কোণে করবী ও সুহাসিনীর বাক্যালাপ বন্ধ হইয়া গেল। দীনবন্ধুবাবু চোখ খুলিয়া সোজা হইয়া বসিলেন, বিনয়বাবু ফ্যালফ্যাল করিয়া অনুপমের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। কেবল হেমাঙ্গিনী ক্ষণেকের জন্য নীরব হইয়া, যেন কিছুই হয় নাই এমনই ভাবে দীনবন্ধুর উদ্দেশ্যে আবার কথা কহিতে শুরু করিলেন।

কিশোর স্থিরদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ অনুপমকে নিরীক্ষণ করিয়া শেষে বলিল, আপনি কী ইঙ্গিত করছেন, পরিষ্কার করে বলবেন কি?

ভ্রূ তুলিয়া অনুপম বলিল, ইঙ্গিত? ইঙ্গিত তো কিছু করিনি। যাকে আপনি বৌদিদি বলে থাকেন–

শান্তস্বরে কিশোর বলিল, অনুপমবাবু, সোজা কথাকে এত ঘুরিয়ে বলবার প্রয়োজন কী তা তো বুঝছি না। আমি স্পষ্ট কথা শুনতে ভালবাসি।

অনুপম বিদ্রূপ করিয়া বলিল, আমিও স্পষ্ট কথা বলতে ভালবাসি এবং সেইজন্যেই বলছি যে স্ত্রীলোকটিকে আপনি বৌদি বলে প্রচার করে নিজের

কিশোরের অনুচ্চ অথচ তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর ছুরির মত অনুপমের মুখের কথাকে কাটিয়া দ্বিখণ্ডিত করিয়া দিল, ব্যস! আর না। আপনি কি বলতে যাচ্ছেন আমি অনুমান করতেও চাই না। কিন্তু আপনার ভালর জন্যেই বলছি—ভবিষ্যতে যখন ওঁর উল্লেখ করবেন তখন আমার বৌদিদি বলেই করবেন।

কিশোরের কণ্ঠস্বর ও চোখের দৃষ্টিতে এমন কিছু ছিল যাহা অনুপম পূর্বে কখনও দেখে নাই। অনুপম আজ কিশোরকে নূতন করিয়া চিনিল। ইহাকে এমন অবহেলাভরে ঘাঁটানো যে নিরাপদ নহে, এই কথা হৃদয়ঙ্গম হইবামাত্র সে চট করিয়া কথার ভঙ্গি বদলাইয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, কিন্তু আমি তো অন্যায় কথা কিছুই বলিনি। ধনপতির চিঠি পড়ে আমার ধারণা হয়েছিল যে উনি আপনার নিজের বৌদিদি নন, সেই কথাই বলছিলুম। কিন্তুধনপতি এমন কথা লিখলে কেন? সে আপনাদের বিষয় অনেক কথাই লিখেছে। এ কথাও লিখেছে যে তীর্থনাথ হালদার বলে কোন এক মাস্টার–

কিশোর শুস্বরে বলিল, আপনাদের বন্ধুটি সত্যি কথাই লিখেছেন। এবার তাঁকে মনে পড়েছে, ডাক্তারের ন্যায্য অধিকার লঙ্ঘন করে যাবার চেষ্টা করেছিলেন বলে তাঁর সঙ্গে আমার একটু মনোমালিন্য হয়েছিল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, কিন্তু কথাটা ঠিক, উনি আমার নিজের বৌদিদি নন, এমন কি মাসতুত-পিসতুতও না। উনি আমার এক বন্ধুর স্ত্রী। কিন্তু থাক, নিজের পারিবারিক কথা অন্যের সঙ্গে আলোচনা করতে আমি ভালবাসি না। আপনাদের পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট যে, উনি আমার বৌদিদি। বলিয়া কিশোর উঠিয়া দাঁড়াইল।

সুহাসিনী এতক্ষণ ঘাড় হেঁট করিয়া শুনিতেছিল, কিশোর উঠিয়া দাঁড়াইতেই সে চোখ তুলিয়া তাহার মুখ দেখিতে পাইল। সঙ্গে সঙ্গে আর একদিনের একটা দৃশ্য তাহার চোখের উপর দিয়া কালো মেঘের মত ছায়া ফেলিয়া গেল—সেই যেদিন ছাদের উপর ভিজিতে ভিজিতে কিশোর ও বিমলাকে হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিল। তাহাকে দেখিতে পাইয়া কিশোরের সন্ত্রাস পলায়ন—ক্ষণকালের জন্য সেই ছবিটা অন্য এক রূপ ধরিয়া তাহার বুকের মধ্যে সব আলো মুছিয়া নিল।

কিন্তু তাহা ক্ষণকালের জন্য। মুহূর্তমধ্যে সে এই অতি গর্হিত সন্দেহটাকে মন হইতে দূরে ঠেলিয়া দিল, এবং নিজের ক্ষুদ্রতাকে ধিক্কার দিয়া দৃঢ়পদে উঠিয়া কিশোরের সম্মুখীন হইয়া বলিল, আজ আপনি আমাদের সঙ্গে বায়োস্কোপে যেতে পারলে আমি খুব খুশি হতুম। কিন্তু যখন যাওয়া হল না, তখন আর একদিন আমি, আপনি, বাবা আর কাকাবাবু একসঙ্গে যাব—এই কথা রইল। আর আপনার বৌদিদি যদি আসেন–

নিমেষমধ্যে কিশোরের মুখের মেঘ কাটিয়া গেল, সে প্রফুল্ল হইয়া বলিল, আচ্ছা বেশ, বৌদিদিকেও যে-করে পারি ধরে নিয়ে যাব।

করবী সুহাসিনীর পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে বলিল, বা রে! আর আমি বুঝি বাদ? সে হবে না, আমিও যাব। কিশোরবাবু, মনে আছে তো আপনার সঙ্গে কী কন্ট্রাক্ট হয়েছে?

দীনবন্ধু অতিশয় সরল মনে বলিলেন, বেশ কথা। সেদিন করবীর সমস্ত কথা শোনবার এবং তার উত্তর দেবার ভার আমি নিলুম। বলিয়া নিরীহভাবে সপুত্র হেমাঙ্গিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

দীনবন্ধুর কথায় সুহাসিনীর চমক ভাঙিল। আজই সকালে, যাহাকে সে ভালবাসে বলিয়া প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াছে, তাহাকে পিতা এবং অন্যান্য গুরুজনের সম্মুখে এমনভাবে সম্বোধন করার বিসদৃশ নির্লজ্জতা চোখে পড়িবামাত্র সঙ্কোচে সে মাটির সহিত মিশিয়া গেল এবং কেন যে অকারণে এতগুলা কথা কিশোরকে বলিতে গেল, তাহাও বুঝিতে না পারিয়া নিজের প্রগতার জন্য নিজেই বিরক্ত হইয়া উঠিল।

এই সময় হেমাঙ্গিনী উঠিয়া দাঁড়াইয়া নীরসকণ্ঠে বলিলেন, দেরি হয়ে যাচ্ছে। সুহাস, তোমার শ্লিপার জোড়া বদলে নাও। এর পর গেলে গোড়াটা দেখতে পাবে না।–অনুপম, একটা ট্যাক্সি।

সুহাসিনী নিজের পায়ের দিকে একবার দৃষ্টি নামাইয়া দ্রুতপদে নিজের ঘরের উদ্দেশে প্রস্থান করিল।

মিনিট পাঁচেক পরে বায়োস্কোপ-যাত্রীদের গাড়ি রওনা হইয়া গেলে অবশিষ্ট তিনজন আবার ঘরে আসিয়া বসিলেন।

কিন্তু অনুপমের সঙ্গে ঐ অপ্রীতিকর চর্চাটা তিনজনকেই ভিতরে ভিতরে পীড়া দিয়া তাঁহাদের মনের সহজ শান্ত ভাব নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। তাই, যে কথা বলিবার জন্য কিশোরকে আটকাইয়া রাখা হইল, দুইজনের কেহই তাহা সহসা উত্থাপন করিতে পারিলেন না। অসংলগ্ন অন্যমনস্কভাবে কথাবার্তা চলিতে লাগিল। প্রয়োজনীয় কথাটা কী, তাহা জানিবার জন্য কিশোরেরও কম কৌতূহল ছিল না, কিন্তু সে কোন প্রশ্ন করিল না। সময় উপস্থিত হইলে দীনবন্ধু আপনা হইতেই বলিবেন বুঝিয়া সে প্রতীক্ষা করিয়া রহিল।

তারপর কখন অজানিতভাবে তিনজনের মধ্যে একটি প্রগাঢ় আলোচনা শুরু হইয়া তাঁহাদের এমনই অখণ্ড মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া লইল যে, সময়ের দিকে কাহারও লক্ষ্য রহিল না। আধুনিক ও প্রাচীন ইংরাজী, ফরাসী, ইটালীয় ও জার্মান সাহিত্যের কাব্যের দিকটাতে বিনয়বাবুর অসামান্য পাণ্ডিত্য ছিল। দীনবন্ধুবাবুরও সকল বিষয়ে এমন একটি স্বাভাবিক সত্যদৃষ্টি ছিল যে, কাব্য-বিষয়ে সম্যক জ্ঞানের অভাব সত্ত্বেও বোধ ও অনুভূতির ব্যাপকতা দ্বারা তাহা পূর্ণ করিয়া লইতে পারিতেন। কিশোরের শিক্ষার ধারা যদিও রসায়নের দিকেই গিয়াছিল, তথাপি তাহার উৎসুক মন রসশাস্ত্রকেও কোন দিন

অবহেলা করে নাই, বাংলা ও ইংরাজী কাব্যে তাহার ভাল রকম দখল ছিল। সুতরাং বিনয়বাবুর জ্ঞানপূর্ণ অথচ সরল কাব্যালোচনা সকলের হৃদয়ের মধ্যেই একটি সরস তন্ময়তার সৃষ্টি করিয়াছিল। বিনয়বাবু পাশ্চাত্ত্য মহাকাব্যের আদি পিতা হোমার হইতে আরম্ভ করিয়া ভার্জিল, দান্তে, টাসো, চসার, ফ্রাঁসোয়া, ভিল, গেটে, ভিক্টর হুগো, কীটস এবং সর্বশেষ রুপার্ট ব্রুক—সকলকে রসের একসূত্রে গ্রথিত করিয়া কাব্যের বংশানুক্রম দেখাইয়া যাইতেছিলেন, কিশোর ও দীনবন্ধু মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছিলেন ও মাঝে মাঝে দু একটা কথার দ্বারা নিজ নিজ উপলব্ধির আনন্দ প্রকাশ করিতেছিলেন, এবং দুজন শ্রোতারই মনে থাকিয়া থাকিয়া এই বিস্ময়টি খেলিয়া যাইতেছিল যে, সংসারী বিনয়বাবু ও অধ্যাপক বিনয়বাবুতে কী আকাশ-পাতাল প্রভেদ!

ঠং করিয়া ঘড়ি বাজিতেই সকলে একসঙ্গে চোখ তুলিয়া দেখিলেন সাড়ে আটটা। বিনয়বাবু লজ্জিত হইয়া বলিলেন, তাই তো হে, দু ঘণ্টা ধরে বকে চলেছি। আর তোমরা চুপ করে বসে শুনছ? তোমাদের ধৈর্য তো কম নয়।

দীনবন্ধু একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আরও দুঘণ্টা হলেও আমার ধৈর্যচ্যুতি হত না। কিন্তু সে যাক। এখন আপনি কিশোরকে কী বলতে চান তাই বলুন।

বিনয়বাবু চেয়ার হইতে উঠিয়া একবার ঘরময় পায়চারি করিলেন, চুলের মধ্য দিয়া আঙুল চালাইয়া চুলগুলাকে অত্যন্ত এলোমেলো করিয়া তুলিলেন, তারপর বিস্মিত কিশোরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া প্রায় ভগ্নস্বরে বলিলেন, বাবা কিশোর, আমার

সুহাসকে আমি তোমার হাতে দিতে চাই—তাকে— বলিয়া আরও কিছু বলিতে চাহিলেন কিন্তু আবেগের পূর্ণতা হেতু বলিতে পারিলেন না।

কিশোর উঠিয়া দাঁড়াইল। এত অপ্রত্যাশিত, এমনই অচিন্তনীয় এই প্রস্তাব যে, কিশোরের মাথা ঘুরিয়া গেল। হৃৎপিণ্ড গলার কাছে আসিয়া সবেগে স্পন্দিত হইতে লাগিল এবং মুহূর্তের জন্য ঘূর্ণমান পৃথিবীটা তাহার চক্ষুর সম্মুখ হইতে লুপ্ত হইয়া গেল। কেবল সেই শূন্যতার কেন্দ্রস্থলে একখানি স্মিতসলজ্জ সুকুমার-সুন্দর মুখ তাহার দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিল। তারপর আনন্দের বন্যার মত এই অনুভূতি তাহার হৃদয়ের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া গেল যে, তাহার নিভৃত অন্তর্যামী এই বস্তুটিকেই এত দিন একান্তভাবে কায়মনোবাক্যে কামনা করিতেছিল। কিন্তু এত নিগূঢ় সে কামনা যে, কোনদিন তাহাকে নিজের মনেও স্পষ্ট করিয়া রূপ দিবার সাহস তাহার হয় নাই। সে। নিজের কণ্ঠস্বর যথাসাধ্য সংযত করিয়া বলিল, কিন্তু তিনি কি–?

দীনবন্ধুবাবু হাত বাড়াইয়া তাহার হাতে একটু চাপ দিয়া বলিলেন, হ্যাঁ। তাঁর মত না নিয়ে কিছু করা হয়নি। বলিয়া কিশোরের হাত আর একবার চাপিয়া দিলেন।

.

এইবার কিশোরের সমস্ত স্নায়ু শিরা পূর্ণ করিয়া অনির্বচনীয় সুখের একটা শিহরণ বহিয়া গেল। সুহাস নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে। সে তাহাকে চায়! হয়তো মনে মনে অনেক দিন হইতেই। প্রেয়সী নারীর হৃদয় জয় করিবার যে গর্ব, তাহা কিশোরের মুখখানাকে

উদ্ভাসিত করিয়া দিল। সে সহাস্যে মুখ তুলিয়া বলিল, তবে আর আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন কেন? আমি আর কী বলব, আপনাদের ইচ্ছাই আমার কাছে আদেশ।

বিনয়বাবু কম্পিতস্বরে বলিলেন, বেঁচে থাকো বাবা, দীর্ঘজীবী হও।

কিশোর নত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। দীনবন্ধুর পায়ের কাছে মাথা নোয়াইতে তিনি সবলে তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, কিশোর, এত দিন তুমি আমার ছাত্র সহকর্মী ছিলে, এবার তোমার পদবী বদলে গেল। জান তো, সুহাস-মায়ী আমার মা।

কিছুক্ষণ পরে দীনবন্ধু বলিলেন, তাড়াতাড়ি কিছু নেই, শ্রাবণ মাস তো শেষ হয়ে এল। মাঝে অঘ্রান মাসও বাদ যাবে—সেই মাঘ-ফাল্গুনের আগে কিছু হচ্ছে না। কিন্তু এ দিকে কাজকর্ম সব। এগিয়ে রাখা ভাল। তোমার বাবাকে চিঠি লিখে, তারপর তাঁর কাছে গিয়ে সব ঠিক-ঠাক করতে হবে। সাহেবমেমের ব্যাপার তো নয় যে, শেষ বরাবর বাপকে একখানা নিমন্ত্রণপত্র দিলেই চলবে। বলা যায় না, তোমার বাবা হয়তো বরপণ দাবি করতে পারেন। তোমরা কুলীন বটে তো হে? বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

কিশোরের নিকট হইতে কিন্তু এ হাসির জবাব আসিল না। সহসা তাহার মুখখানা অত্যন্ত শুষ্কভাব ধারণ করিল। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া সে ধীরে ধীরে বলিল, বাবাকে জানানো কি আবশ্যক?

দীনবন্ধু বিস্মিত হইলেন, কিশোরের মনের ভাবটা ঠিক বুঝিতে পারিলেন না। তিনি জানিতেন। যে, কিশোরের পিতা দ্বিতীয়বার বিবাহ করিয়াছেন ও প্রথম পক্ষের ছেলের প্রতি তাঁহার স্নেহ কিছু আলগা হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া বিবাহের সময় তাঁহাকে সংবাদ পর্যন্ত দেওয়া হইবে না, ইহাই বা কী করিয়া সম্ভব? তিনি বলিলেন, আবশ্যক নয়? বল কি হে? তিনি যে বরকতা, তিনি। যত দিন আছেন তত দিন তুমি যে কেউ নও। কথায় বলে বর না চোর। তাঁর অনুমতি যে সর্বাগ্রে চাই। অবশ্য তুমি সাবালক স্বাধীন, বাপের গলগ্রহ নও, সে সব আমি জানি। কিন্তু আমাদের সমাজে এ প্রথাটা অনাদিকাল থেকে চলে আসছেনা করলে তাঁকে অসম্মান করা হবে যে।

কিন্তু তিনি হয়তো কথা শেষ না করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া কিশোর উঠিয়া দাঁড়াইল, দীনবন্ধুর দিকে ফিরিয়া আস্তে আস্তে বলিল, এ বিষয়ে আমার কিছু বলা উচিত নয়, আপনারা যা ভাল বুঝবেন, করবেন।

একবার ঘড়ির দিকে চাহিয়া সে নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। তাহার ছায়াচ্ছন্ন আশঙ্কাচিহ্নিত মুখ লক্ষ্য করিয়া দীনবন্ধু ভাবিলেন, কিশোরের বাপ বোধ হয় সেকেলে গোঁড়া হিন্দু, এত বড় মেয়ের সঙ্গে এরূপ ম্লেচ্ছভাবাপন্ন ঘরে বিবাহ দিতে রাজী না হইতে পারেন, এই চিন্তা কিশোরকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছে।

অন্ধকার করিডর পার হইয়া বাহিরের বারান্দায় পা দিতেই কিশোর দেখিল সুহাসিনী মোটর হইতে নামিয়া গাড়ির অন্যান্য আরোহীদের নিকট বিদায় লইয়া বহির্দ্বারের সম্মুখীন হইল। মোটর চলিয়া গেল। বাড়ির দ্বার খোলাই ছিল, অস্ফুটস্বরে একটা গানের

কলি গুঞ্জন করিতে করিতে। বারান্দায় প্রবেশ করিয়া সুহাসিনী থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। যদিও বারান্দায় আলো ছিল না, তবু রাস্তার একটা গ্যাসের আলো জানালা দিয়া প্রবেশ করিয়া বন্ধ বারান্দাটিকে ঈষৎ আলোকিত করিয়াছিল। অস্পষ্ট আলোতে সুহাস চিনিল, কিশোর দাঁড়াইয়া আছে।

দুজনেই ক্ষণকাল পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইয়া নীরব হইয়া রহিল, কাহারও মুখে সহসা কোন কথাই আসিল না। তারপর সুহাস মুখ নীচু করিয়া জড়িতস্বরে কী একটা বলিয়া পাশ কাটাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিল। কিশোরও তাড়াতাড়ি সরিয়া দাঁড়াইয়া পথ ছাড়িয়া দিল।

দরজা পার হইয়া সুহাস করিডরে প্রবেশ করিয়াছে—

সুহাস!

সুহাসিনী চমকিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। গ্যাসের আলো সোজা আসিয়া তাহার মুখের উপর পড়িয়াছিল, কিশোর তাহার কাছে গিয়া বলিয়া উঠিল, সুহাস, আজ তোমার বাবা তোমাকে আমার হাতে দান করতে চেয়েছেন। এ দান নেবার যোগ্যতা আমার আছে কিনা জানি না। কিন্তু আমি নিয়েছি। দীনবন্ধুবাবু বললেন, তোমার অমত নেই। কিন্তু এই কথাটি আমি তোমার নিজের মুখে একবার শুনতে চাই।

সুহাসিনীর বুকের ভিতর যে ঝড় বহিয়া গেল, বাহিরে তাহা কিছুই প্রকাশ পাইল না, এমন কি তাহার সর্বশরীর যে থরথর করিয়া কাঁপিতেছে, তাহাও ক্ষীণালোকে ধরা পড়িল না। সে নতমুখে দাঁড়াইয়া রুমালের খুট আঙুলে জড়াইতে লাগিল।

কিশোর বলিল, এই কদিনের জানাশোনায় তুমি যে আমাকে ভালবাসবে এ আমি কল্পনাও করতে পারি না—তবু–কিশোর থামিল।

ঘরে আলো থাকিলে আজ সুহাস একটা কথাও মুখ দিয়া বাহির করিতে পারিত না, কিন্তু এই আবছায়া আধ-অন্ধকার তাহার লজ্জাকে আবৃত করিয়া দিল। সে মুখ তুলিয়া মৃদুকম্পিত কণ্ঠে বলিল, কেন, কল্পনা করতে পারেন না?

কিশোর তাহার একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া আগ্রহস্পন্দিত স্বরে কহিল, সুহাস, সত্যিই কি–

সুহাসের মনে হইল, তাহার দেহের অস্থিমজ্জা পর্যন্ত দ্রব হইয়া তরল হইয়া গিয়াছে, আর বুঝি সে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিবে না। হাতখানা সে সম্পূর্ণ কিশোরের হাতে ছাড়িয়া দিয়া আর এক হাতে নিজের বুক চাপিয়া ধরিয়া রহিল।

সুহাস, সত্যিই কি তুমি আমাকে–? না, তুমি নিজের মুখে বলল। স্বপ্নের মত কিশোর শুনিতে পাইল, সুহাসিনী যেন বলিতেছে, হ্যাঁ! তুমি জানতে পারনি? আমিও আগে জানতে পারিনি। কাল রাত্রে যখন তুমি–সুহাসের মুখের কথা মুখে মিলাইয়া গেল।

কিছুক্ষণ দুইজনে এমনিভাবে হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর অতি দীর্ঘনিশ্বাস পতনের শব্দে দুজনেই মুখ তুলিয়া দেখিল তাহাদের মুখের চেহারা কেমন বদলাইয়া গিয়াছে। কিশোর বুভুক্ষুর মত সুহাসিনীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিল, সুহাস, আমাকে বিশ্বাস করতে পারবে, আমার উপর মনপ্রাণ সব ছেড়ে দিয়ে নির্ভর করতে পারবে?

কথাগুলার মধ্যে এমন একটা ব্যগ্র মিনতি ছিল যে, সুহাসের চোখে জল আসিয়া পড়িল। যাহার হাতে সর্বস্ব তুলিয়া দিতে পারিয়াছে, তাহাকে বিশ্বাস করিতে পারিবে না? সে ঘাড় নাড়িয়া শুধু বলিল, পারব।

দুই হাতে সুহাসের নরম হাতখানা একবার ধরিয়া কিশোর ছাড়িয়া দিল। তারপর আর কোন কথা না বলিয়া দ্রুতপদে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। প্রাপ্তির এই প্রথম উচ্ছল উন্মাদনায় পাছে অধিকারের অতিরিক্ত কোন অসংযম প্রকাশ করিয়া ফেলে, এই ভয়ে জোর করিয়া সে নিজেকে ছিনাইয়া লইয়া গেল।

13

মনের সঙ্গে যখন পা দুটার সংযোগ থাকে না, তখন তাহারা স্বেচ্ছামত নিজের পরিচিত পথে চলে। বিনয়বাবুর বাড়ি হইতে বাহির হইয়াই কী এক নেশায় বুঁদ হইয়া কিশোর পথ চলিয়াছিল; কোথায় যাইতেছে কোন খেয়ালই ছিল না। হঠাৎ সজাগ হইয়া দেখিল, তাহার কলেজের সম্মুখে। দাঁড়াইয়া আছে।

রাত্রি দশটার সময় কলেজের অন্ধকার প্রকাণ্ড বাড়িখানার দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া তাহার ভারি হাসি পাইল। নিজ মনে হাসিতে হাসিতে সে আবার বাড়ির দিকে ফিরিল।

যে আনন্দের সংবাদটা সমস্ত জগৎ ভুলাইয়া তাহাকে অকারণে অভ্যাসবশেই এতদূর টানিয়া আনিয়াছিল, বৌদিদির কাছে সেই কথাটি ব্যক্ত করিবার জন্য তাহার প্রাণ ছটফট করিতে লাগিল। আজ একাদশী, তাই সে সন্ধ্যার পূর্বেই রাত্রির মত আহারাদি শেষ করিয়া লইয়াছিল। বৌদিদি হয়তো এতক্ষণ উদ্বাসক্লিষ্ট দেহে শয্যায় শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, এই ভাবিয়া সে জোরে জোরে পা। চালাইয়া ছিল।

বৌদিদি কিছুই জানেন না, সন্দেহও করেন নাই। হঠাৎ অপূর্ব সংবাদ শুনিয়া তিনি কিরূপ চমকিত ও আনন্দিত হইয়া উঠিবেন, উৎসুকভাবে কী কী প্রশ্ন করিবেন, সে তাহার কী কী উত্তর দিবে, এই সব ভাবিতে উল্লাসে উত্তেজনায় তাহার মন ভরিয়া উঠিল। সে ভাবিতে লাগিল, তাহার মত ভাগ্যবান পৃথিবীতে আর নাই; একদিকে

বৌদিদির মত স্নেহপরায়ণা ভগিনী, আর একদিকে সুহাস। এমন ভাগ্য আর কাহারও হয়? সৌভাগ্যগর্বে তাহার হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠিল।

কিন্তু–হঠাৎ কিশোর রাস্তার মাঝখানেই দাঁড়াইয়া পড়িল। বৌদিদি যদি সুহাসের সহিত বিবাহের সংবাদে সুখী না হন? তিনি কিশোরের সংসারে সর্বময়ী কর্ত্রী, সুহাসকে তিনি জানেন না,যদি কোনরূপ অমূলক আশঙ্কা করিয়া তিনি মনে কষ্ট পান? কিন্তু না, এ হইতেই পারে না। বৌদিদির, সম্বন্ধে এরূপ স্বার্থপরতার কথা চিন্তা করাও অপরাধ। নিজের হৃদয়ের অপরিসীম স্নেহ যিনি নিঃস্ব হইয়া তাহার মাথায় ঢালিয়া দিয়াছেন, তাহার এত বড় সুখে তিনি অসুখী হইবেন, ইহা কল্পনা করাও মহাপাপ।

এই সঙ্গে আর একটা চিন্তা আসিয়া জুটিল। কিশোরের হৃদয়ের অভ্যন্তরে দুইটি মাত্র নারী প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছিল,—একটি বিমলা, অপরটি তাহার সদ্যোলব্ধ সুহাসিনী। ইহাদের একজনকে বাদ দিলেও তাহার জীবন পঙ্গু হইয়া যাইবে, ইহা নিশ্চিত, বিমলার স্নেহ বা সুহাসের ভালবাসা কোনটাই সে স্বেচ্ছায় ছাড়িতে পারিবে না। কিন্তু এই দুইটি রমণী যদি ভবিষ্যতে পরস্পরকে প্রীতির সহিত গ্রহণ করিতে না পারে? যদি সাংসারিক ক্ষুদ্র প্রবেশ করিয়া তাহার অকলঙ্ক জীবনযাত্রাকে লাঞ্ছিত করিয়া তোলে? তাহার প্রাণ দুরদুর করিয়া একবার কাঁপিয়া উঠিল। সে প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া মনে মনে বলিল— না, বৌদিদি ও সুহাস কি সাধারণ সামান্য স্ত্রীলোক? সে যখন তাহাদের দুইজনকেই ভালবাসিয়াছে, তখন তাহারাও পরস্পরকে ভালবাসিবেই। ইহার মধ্যে কণামাত্র সংশয় থাকিতে পারে না।

বাড়ি পৌঁছিয়া সোজা বিমলার ঘরের দ্বারের কাছে গিয়া সে ডাকিল, বৌদি, আসব?

এসো। এত দেরি যে, কোথায় ছিলে?

কিশোর ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, প্রদীপের সম্মুখে মেঝেয় বসিয়া বিমলা একখানা পুঁথি পড়িতেছিল, বই মুড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম বৌদি, তাই দেরি হল। বলিয়া কিশোর হাসিতে লাগিল।

ভুরু তুলিয়া বিমলা বলিল, এগারোটা বাজে, এত রাত্তিরে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলে কোন সুখে বলো তো?

জোর করিয়া মুখ গম্ভীর করিয়া কিশোর বলিল, বলছি। কিন্তু তার আগে একবার তোমার পায়ের ধুলো নিই। বলিয়া হেঁট হইয়া বিমলার পদধুলি গ্রহণ করিল।

বিমলা কিশোরের মাথায় হাত রাখিয়া প্রসন্ন কণ্ঠে বলিল, বেঁচে থাকো। কথাবার্তা সব ঠিক হয়ে গেল?

কী? কী ঠিক হবে? কিসের কথাবার্তা?

সেকথার জবাব না দিয়া মৃদু হাস্যে বিমলা জিজ্ঞাসা করিল, আর সুহাস কী বললে?

বিস্মিত পুলকিত হইয়া কিশোর বিমলার মুখের পানে চাহিয়া রহিল! তারপর দুই হাত বাড়াইয়া বিমলার দুটা বাহু চাপিয়া ধরিয়া বলিল, অ্যাঁ—বৌদি, তুমি জানো?

না গো মশাই—তা কি আর জানি। তোমরা দুজনেই কত সাবধানী। বিমলা হাসিয়া ফেলিল, তবু তোমার মনের কথা আঁচে আন্দাজে বুঝতে হয়, সে ছুঁড়ির মুখের দিকে একবার তাকালে আর কছু বুঝতে বাকি থাকে না। আচ্ছা ঠাকুরপো, এত লুকোচুরি কিসের? প্রেমিক-প্রেমিকাদের বুঝি খোলাখুলি কিছু করতে নেই। সবই মনে মনে গোপনে গোপনে? কিন্তু লুকিয়ে যখন রাখতেও পার না, তখন চেষ্টা করাই বা কেন? সেদিন সুহাসের কাণ্ড দেখে আমি তো অবাক।

সুহাসিনীর সহিত বিমলার পরিচয় হইয়াছে, এ খবর কিশোর জানিত না। সে আশ্চর্য হইয়া বলিল, তার সঙ্গে তোমার ভাব হয়ে গেছে? আমাকে বলনি কেন?

কেন বলব? তুমি আমার কাছে লুকোতে পার, আর আমি পারি না? আমার বুঝি রাগ হয় না? লো নেই কওয়া নেই, হৃদয়খানি যে আর একজনকে দিয়ে এলে, বলি, বৌদিদির অনুমতি নিয়েছিলে কি?

অদূরে তক্তপোশের উপর সাদা ধবধবে বিছানা পাতা ছিল, কিশোর তাহার উপর গিয়া বসিল। পাশের স্থানটা হাত দিয়া চাপড়াইয়া বলিল, বোসো এসে এখানে। এইবার বলো, কবে তোমাদের ভাব হল, কী কথা হল, এই সব।

সম্মুখে গলির দিকের জানালাটা খুলিয়া দিয়া বিমলা বিছানায় আসিয়া বসিল। গালে হাত দিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, ঠাকুরপো, মাত্র দুদিন সুহাসের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে কিন্তু এই দুদিনের দেখাতেই বুঝতে পেরেছি যে, এমন জিনিসটি লাভ করা যে কোন পুরুষমানুষের পক্ষে ভাগ্যের কথা। মনে আছে সেদিন ঠাট্টাচ্ছলে বলেছিলুম, যে বিন্ধিবে লভিবে সে কৃষ্ণা গুণবতী? তার একটা কথাও মিথ্যে নয়! অমন মেয়েকে স্বয়ম্বরসভায় লক্ষ্যভেদ করে নিজের গুণপনা দেখিয়ে তবে লাভ করবার অধিকার জন্মায়। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিতে লাগিল, দেখ, আমি পাড়াগেঁয়ে মেয়ে, আঠারো-উনিশ বছরের আইবুড়ো মেয়ে দেখা আমার অভ্যাস নেই, এতদিন ও জিনিসটাকে মনের মধ্যে ঠিকভাবে নিতে পারতুম না। কিন্তু সুহাসের সঙ্গে ভাব হবার পর থেকে সে ভুল আমার ভেঙে গেছে। শুচিতা কৌমার্য যে মনের সম্পদ, বয়সের নয়, তা বুঝতে পেরেছি। সুহাসের মধ্যে কী আছে জানি না, কিন্তু ওর মুখের দিকে চেয়ে ওকে না ভালবেসে থাকা যায় না। বিদ্যাবুদ্ধির কথা বলছি না, সে তো আজকাল অনেক মেয়েরই আছে। কিন্তু সুহাসের মধ্যে সত্যিকারের ভাল আছে ঠাকুরপো,—সেই ভাল যা ভগবান নিজের হাতে দেন, যা চেষ্টা করে হওয়া যায় না। এত মিষ্টি নরম ওর স্বভাব, এমন লাজুক মন,.যেন রাত-দিন বুক দিয়ে ঘিরে রাখতে ইচ্ছা করে।

কিশোর মুষ্টির উপর চিবুক রাখিয়া শুনিতেছিল। তাহার তগত মুখের দিকে স্নেহ-নিষিক্ত দৃষ্টিপাত করিয়া বিমলা বলিল, কিন্তু তাও বলি, তোমার মত বর না হলে ও মেয়ের মর্যাদা আর কেউ বুঝত না। আমার মনে বড় ভয় ছিল ভাই, কী জানি তুমি একদিন কী রকম একটি বৌ ঘরে নিয়ে আসবে, হয়তো সে তোমাকে চিনতে পারবে না, আমাকেও

ভুল বুঝবে—আর তোমার প্রাণের ঐ তপোবনের মত শান্তি ঘুচে যাবে! কিন্তু সে ভয় আর আমার নেই; যিনি আসছেন তাকে বিধাতা তোমারই মনের মত করে নির্জনে বসে গড়েছিলেন।

কিশোর নড়িয়া-চড়িয়া বসিল, একবার কী বলিতে ইচ্ছা করিল, তারপর আবার চুপ করিয়া বসিয়াই বৌদিদির অমৃতমধুর বাণী শুনিতে লাগিল।

বিমলা একটি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, কিন্তু আর না, বেশী প্রশংসা করলে তোমার আবার জাঁক হবে। তার চেয়ে সুহাসের কথাই বলি,-কেমন? সেদিন দুপুরবেলা আমি ওদের বাড়ি গিয়েছিলুম, তারপর ও আর একদিন এ বাড়িতে এসেছিল।

আনন্দে কণ্টকিত হইয়া কিশোর বলিল, সুহাস এসেছিল?

হ্যাঁ গো, এসেছিল। যদি তার রকম দেখতে, এখনও মনে হলে আমার হাসি পায়। এক পা করে এগোয় আর যেন চমকে চমকে ওঠে, মুখ এই লাল, এই ফ্যাকাসে—ঠিক যেন চুরি করতে ঢুকেছে, ধরা পড়বার ভয়েই জড়সড়। আমি হাত ধরে নিয়ে গিয়ে তাকে তোমার বিছানার উপর বসিয়ে দিলুম।

কিশোর রুদ্ধ নিশ্বাসে স্থির হইয়া বসিয়া রহিল, পাছে নড়িলে-চড়িলে বা নিশ্বাস ফেলিলে এই কাহিনীর সূক্ষ্ম সূত্রটি ছিন্ন হইয়া যায়। বিমলাও সেদিনকার কৌতুকপূর্ণ স্মৃতিটা মনে মনে আলোচনা করিতে করিতে স্মিতমুখে জানালার দিকে চাহিয়া রহিল।

তারপর?

হাসিয়া উঠিয়া বিমলা বলিল, তারপর আর কী? সব কথাই তোমাকে শুনতে হবে না কি?–কিন্তু ভারি মজার জিনিস একটি লক্ষ্য করলুম, তখনও সে নিজের মন বুঝতে পারেনি। তা যদি পারত, তাহলে আমার কাছে কথায় কথায় ধরা পড়ে যেত না। একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া কতকটা নিজমনে বলিল, কী সুন্দর এই সময়টি।

মিনতি করিয়া কিশোর বলিল, আমাকে আর পাগল করে দিও না, বৌদি। সুহাস আর কী করলে বলো।

কী আবার করবে? তোমার ল্যাবরেটরি দেখলে, বইগুলো ঘাঁটলে, টেবিলের এটা-ওটা নাড়লে, কলম দিয়ে লিখলে, তারপর বিছানায় বসে তোমার মাথার বালিশটা কোলে নিয়ে আমার মুখের পানে চেয়ে তোমার কথা শুনতে লাগল। তোমার কথা শোনবার এত কী খিদে বাপু, কিছুতেই যেন মিটতে চায় না!—এ দিকে তোমারও তো সেই দশা দেখছি। কিন্তু আর না, এবার ওঠো। আজ রাত্রে কী ঘুমোবার দরকার নেই? বিমলা উঠিয়া দাঁড়াইল।

হাত ধরিয়া তাহাকে পুনরায় বসাইবার চেষ্টা করিয়া কিশোর বলিল, বোসো না বৌদি, তারপর–

কৃত্রিম রোষে তর্জনী তুলিয়া বিমলা কহিল, আবার তারপর? সারারাত শুধু সুহাসকথামৃত শুনবে—আমাকেও ঘুমোতে দেবে না। আজ একাদশী তাও ভুলে গেলে?

অনুতপ্ত কিশোর তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পড়িল, লজ্জিত হইয়া বলিল, না না বৌদি, এবার তুমি শুয়ে পড়ো, আমি যাচ্ছি।

বাইরে ঝিমঝিম করিয়া বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল, ঠাণ্ডা ভিজা বাতাস গায়ে লাগিতেছিল, বিমলা সম্মুখের জানালাটা আবার বন্ধ করিয়া দিতে লাগিল।

কিশোর বলিল, আচ্ছা বৌদি, সেদিন—

আবার! আমি আর পারি না ঠাকুরপো, তোমার সুহাসের গল্প বলতে। ঐ শোনো, বারোটা বাজল। নাও ওঠো, আর আমি তোমার সঙ্গে রাত জাগতে পারব না। আসল জিনিসটা তো পেয়ে গেছ, এখন আর গল্প শুনে কী হবে? যাও, শুয়ে পড়োগে।

কিশোর দ্বারের কাছে তবু একটু ইতস্তত করিয়া নিজের ঘরে সেই পরম পবিত্র শয্যার দিকে—যে শয্যার মাথার বালিশটি সুহাসের অঙ্গ-স্পর্শে ধন্য হইয়াছে—সেই বিছানার ক্রোড়ে রাত্রির মত বিশ্রাম লইতে গেল।

.

নিজের ভালবাসা লইয়াই সুহাস তন্ময় হইয়া ছিল, এই নবাগত দেবতাটিকে লইয়া কী করিবে, কোথায় রাখিবে, ভাবিয়া পাইতেছিল না। অন্য পক্ষের মনের ভাব কিরূপ তাহা চিন্তা করিয়া দেখিবার তাহার অবসর হয় নাই, সেকথা মনে উদয়ও হয় নাই।

তাই, কিশোর যখন নিজের হৃদয়ের পরিচয় দিয়া তাহার হাত দুইটা একবার চাপিয়া দিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল, তখন বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের উপর চন্দ্রোদয়ের মত তাহার অন্তর অপরিমিত আনন্দ-আবেগে মথিত হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইল এইটুকু হৃদয়ের মধ্যে বুঝি এতখানি সৌভাগ্যকে ধরিয়া রাখিবার স্থান নাই, এখনই উহা ভাঙ্গিয়া শতখণ্ডে চুরমার হইয়া যাইবে।

পাশের ঘর হইতে দীনবন্ধু ও বিনয়বাবুর কণ্ঠস্বর শুনা যাইতেছিল, সুহাস পা টিপিয়া টিপিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় রাত্রির আহারাদি সম্পন্ন করিয়া যখন সে নিজের ঘরে আসিয়া ঢুকিল, তখন ঘরের স্বচ্ছ তরল অন্ধকার যেন বাহু বাড়াইয়া তাহাকে কোলে টানিয়া লইল। আলো না জ্বালিয়াই সিঙার মেঝের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে কাপড়-চোপড় ছাড়িতে লাগিল।

এমনই ভাবে সুখের স্বপ্নে কতক্ষণ কাটিয়া গিয়াছিল সে জানিতেও পারে নাই; বাইরের বৃষ্টিপতনের শব্দে চেতনা হইল যে, ঘরের জানালাগুলা বন্ধ থাকায় একটু গরম বোধ হইতেছে। সে গিয়া গলির দিকের জানালাটা উন্মুক্ত করিয়া দিল।

বাহির দিকে চোখ পড়িতেই সে দেখিল, গলির অপর পারে খোলা জানালার সম্মুখে অস্পষ্ট আলোতে দুটি লোক বিছানার উপর বসিয়া আছে। ক্ষীণ আলো সত্ত্বেও চিনিতে কষ্ট হইল না যে, একজন কিশোর ও অন্যজন বিমলা। সুহাস তাড়াতাড়ি জানালা ছাড়িয়া চলিয়া আসিতেছিল, কিন্তু পারিল না; কে যেন জোর করিয়া তাহাকে ধরিয়া রাখিল। কিশোর ও বিমলার কথার গুঞ্জনটুকুই সে শুনিতে পাইতেছিল, একবার বিমলার অনুচ্চ একটুখানি হাসি তাহার কানে পৌঁছিল। অন্ধকারে দাঁড়াইয়া সুহাস বিহ্বলের মত সেই দিকে তাকাইয়া রহিল।

বিমলা জানালা বন্ধ করিতে উঠিলে তাহার দুএকটা অসংলগ্ন কথা তাহার কানে গেল— ...বারোটা বাজল—তোমার সঙ্গে রাত জাগতে...শুয়ে পড়ো—জানালা বন্ধ হইয়া গেল!

সুহাস ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিয়া নিজের বিছানায় বসিল। এতদিন যাহা সে অবহেলা করিয়াই লক্ষ্য করে নাই, সেই অজ্ঞাত বিষয়টি আজ সবেগে আসিয়া তাহাকে আঘাত করিল। ইহারা দুইজন স্ত্রী-পুরুষ এক বাড়িতে থাকে, রাত্রিতে তৃতীয় ব্যক্তিটি পর্যন্ত নাই। ইহাদের মধ্যে সম্বন্ধ কী? বন্ধুর স্ত্রী, স্বামীর বন্ধু। দুইজনেরই যৌবনের মধ্যাহ্ন। স্ত্রীলোকটি বিধবা, অপূর্ব রূপসী! রাত্রি বারোটার সময় ইহারা এক বিছানায় ঘেঁষাঘেঁষি বসিয়া নিম্নকণ্ঠে সিগল্প করে, তারপর সাবধানে বাহিরের জানালা বন্ধ করিয়া দেয়। কোন লৌকিক বাধাবিঘ্নের বালাই নাই।

আর একদিনের আর এক দৃশ্যের স্মৃতি এই সঙ্গে আজ দ্বিতীয়বার তাহার চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল। সে-ও এমনই বাধা-বন্ধনহীন! এবং অনুপমের যে তীক্ষ্ণ কথাগুলার

অস্পষ্ট ইঙ্গিত অসভ্য বর্বরতা বলিয়াই আজ সন্ধ্যাবেলা সুহাসিনীকে কিশোরের দিকে ঠেলিয়া দিয়াছিল, সেগুলা এখন একে একে মনে পড়িয়া বিষাক্ত কাঁটার মত তাহাকে বিঁধিতে লাগিল।

সুহাসিনীর সমস্ত দেহ শিথিল হইয়া এলাইয়া পড়িল, বুকের ভিতরটা যেন একেবারে খালি হইয়া গেল। সে অস্ফুট একটা শব্দ করিয়া বিছানায় মুখ খুঁজিয়া শুইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ এইভাবে পড়িয়া থাকিবার পর সে মাথা তুলিয়া আবার ভাবিতে লাগিল, দোষ কী? সে নিজের মনের ক্ষুদ্রতা দিয়াই ইহাকে বিকৃত করিয়া দেখিতেছে, নহিলে দুইজন স্ত্রী-পুরুষের রাত্রিকালে নিভৃত আলাপ দূষণীয় কেন? সে নিজেও তো কত দিন অনুপমের সঙ্গে একাকিনী বসিয়া গল্প করিয়াছে! ইহাতে নিন্দনীয় কী আছে? তাহার মন মন্দ, তাই সে অন্যকে মন্দ দেখিতেছে, নিজের অন্তরের কলুষ অন্যের দেহে নিক্ষেপ করিতেছে। বিমলাকে সে জানে, বিমলার প্রতি তাহার আন্তরিক শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে—তিনি সর্বাংশে ভালবাসা ও শ্রদ্ধার যোগ্য। আর কিশোর? তাহার মত নির্মল চরিত্র আর সে কোথায় দেখিয়াছে? তাহার চাহনি পর্যন্ত যে পবিত্র! তবে ইহাদের চরিত্রের তুলনায় কি আজিকার এই অবস্থা-সংযোগকেই বড় করিয়া দেখিতে হইবে? নিজের মনকে পঙ্কিল অশুচি বলিয়া সুহাসিনী বারংবার ধিক্কার দিতে লাগিল।

এইভাবে নানা তর্কযুক্তির দ্বারা নিজের অবুঝ মনকে বুঝাইতে বুঝাইতে শেষরাত্রির দিকে সে ঘুমাইয়া পড়িল। কিন্তু ঘুমের মধ্যেও একটা অব্যক্ত বেদনা তাহার অচেতন দেহকে নিপীড়িত করিয়া অশ্রুধারায় উপাধান সিক্ত করিয়া দিল।

পরদিন সকালে দেরি করিয়া উঠিয়া ক্লান্ত-দেহে যখন সে নীচে নামিয়া গেল তখন নিজের মানসিক অবস্থা নিজেই সে ঠিক বুঝিতে পারিল না। শুধু, গত রাত্রে তাহার অন্তলোকে দক্ষিণা বাতাস লাগিয়া যে আনন্দের ফুলটি ফুটিয়াছিল, তাহা যে অকালে শুকাইয়া মলিন হইয়া গিয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না।

14

অনুপম ও হেমাঙ্গিনীর লক্ষ্য যদিও এক ও অভিন্ন ছিল, তথাপি মাতা-পুত্রের কার্যপ্রণালীতে বৈষম্য দেখা দিয়াছিল। অনুপম অত সুক্ষ্মভাবে সব দিক বাঁচাইয়া কাজ করিবার অর্থ বুঝিত না। কিশোরের উপর তাহার তীব্র বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল, যে কোন উপায়ে তাহাকে অপদস্থ করিয়া নিজের কার্যসিদ্ধি করিতে পারিলে সে আর কিছু চাহে না।

হেমাঙ্গিনী কিন্তু অন্য পথে চলিয়াছেন। কিশোর যে লম্পট দুশ্চরিত্র নহে তিনি তাঁহার পরিণত বয়সের অভিজ্ঞতার দ্বারা মনে মনে বুঝিয়াছিলেন, সুতরাং তাহার চরিত্রের প্রতি আক্রমণ শেষ পর্যন্ত। স্থায়ী ফলপ্রদ হইবে কি না, এ বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল। এরূপ একটা অপবাদ মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে অপবাদকারীর প্রতি তাহার ফল যে শুভ হয় না, এ কথাও তাঁহার অজানিত ছিল না। তাই দুই-একটা লোভনীয় অর্ধ-প্রমাণ হাতের কাছে পাইয়াও তিনি তাহার সদ্ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হইতেছিলেন। কিশোরের সহিত বিমলার সম্বন্ধটা বস্তুত নিদোষ হইলেও সাধারণ পাঁচজনের দৃষ্টিতে যে অত্যন্ত সন্দেহজনক, তাহাতে সংশয় নাই। বাহিরের লোকের কাছে শুদ্ধমাত্র এই একত্র থাকাটা অতিশয় নিন্দনীয় সম্পর্কের দিকে ইঙ্গিত করিতে থাকে, এবং অন্যের সম্বন্ধে মন্দ কথাটা নির্বিবাদে বিশ্বাস করিয়া লওয়ার দিকে মানুষের মনে এমন একটা সহজ প্রবণতা আছে যে বেশী সাক্ষ্যপ্রমাণ না পাইলেও, কেবল মাত্র একটা তুচ্ছ নৈতিক সাবধানতার বিধি লঙ্ঘন করার অপরাধে কাহারও বিরুদ্ধে। অতিবড় ব্যভিচারের অভিযোগও অভ্রান্ত সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে তিলমাত্র দ্বিধা হয় না।

হেমাঙ্গিনী কিন্তু এই সুতীক্ষ অস্ত্রটি কিশোরের বিরুদ্ধে আপাতত প্রয়োগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। নিজের বুদ্ধি ও কার্য-নৈপুণ্যের প্রতি তাঁহার অসীম আস্থা ছিল। তাই এক ঢিলে ঢিলে দুই পাখি মারিয়া যাহাতে তিনি সুহাসিনীর দিক হইতে কিশোরের চিত্তকে অন্যদিকে আকৃষ্ট করিয়া লইতে পারেন, সেই চেষ্টাতেই নিজের সুন্দরী ভ্রাতুস্পুত্রীকে আনিয়া রঙ্গস্থলে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন ও মনে মনে কামনা করিতেছিলেন—যাহাতে সাপও মরে অথচ লাঠিও না ভাঙে। করবীর স্বামী হিসাবে কিশোরকে কল্পনা করিতে তাঁর আপত্তি ছিল না, বরং ইহাই এ জটিল সমস্যার একমাত্র সু-সমাধান বলিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল।

অনুপম কিন্তু গোঁ-ভরে নিজের পথে চলিয়াছিল। হেমাঙ্গিনীর কুটনীতি তাহার মনঃপূত হইতেছিল না। কিন্তু প্রকাশ্যে মাতার বিরুদ্ধতা করিবার সাহসও তাহার ছিল না, তাই সে গোপনে গোপনে নিজের প্রবৃত্তিমত কাজ করিতে লাগিল। এক জাতীয় লোক আছে, নিজের স্বার্থের ব্যাঘাতকারীকে তাহারা নির্বিচারে দুষ্ট লোক বলিয়া বিশ্বাস করিয়া লয়, নিজের স্বার্থের ন্যায়-অন্যায় বিচার করে না। অনুপম সেই শ্রেণীর লোক। সে নানা প্রকারে নানা দিক দিয়া কিশোরের অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল এবং এই বলিয়া নিজের মনকে প্রবোধ দিল যে, দুষ্টের দমন করিতে গেলে কোন অস্ত্রই পরিত্যাজ্য নয়। যুদ্ধে এবং প্রণয়ে অনুচিত কিছু নাই।

এ দিকে কিশোরের তপোভঙ্গ করিবার ভার যাহার উপর পড়িয়াছিল সেই নির্দোষ বিঘ্নকারিণীটি পরম আনন্দেই দিন কাটাইতেছিল। পিসীমার অভিসন্ধি টের পাইলে

করবীর মত সরলমনা মেয়েও বোধ করি লজ্জায় ও ধিক্কারে এই অশোভন কলাকৌশল ও ষড়যন্ত্র হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াইত। এমন কি, সুহাসিনীর প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে তাহাকে আসরে দাঁড় করানো হইয়াছে, ইহা ঘুণাক্ষরে সন্দেহ করিলে সে রাগারাগি চেঁচামেচি করিয়া একটা কাণ্ড বাধাইয়া তুলিত এবং হয়তো কিশোরের সম্মুখে সকল ষড়যন্ত্র ফাঁস করিয়া দিতেও দ্বিধা করিত না। কিন্তু সে বেচারী এ-সব কিছুই জানিত না। নিতান্তই অন্ধকারে থাকিয়া সে কিশোরের প্রেমে হাবুডুবু খাইতেছিল।

করবীর জীবনে অবশ্য প্রেমে পড়া এই প্রথম নহে, ইতিমধ্যে আরও দুতিনবার হইয়া গিয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কোনটাই দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই।

সেদিন বৈকালে করবী সাজগোজ করিয়া পিসীমার বাড়ি যাইবার উপক্রম করিতেছিল, এমন সময় কিশোর একগুচ্ছ করবীফুল হাতে লইয়া উপস্থিত হইল।

বিবাহের কথাবার্তা স্থির হইয়া যাইবার পর কিশোর একবারমাত্র বিনয়বাবুর বাড়ি গিয়াছিল। কিন্তু তাহাকে দেখিয়া সুহাসিনী যেরূপ লজ্জিতভাবে ঘর হইতে উঠিয়া গেল এবং সে থাকা পর্যন্ত আর ফিরিয়া আসিল না, তাহাতে কিশোর নিজেও বড় কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। বাড়ি আসিয়া সে ভাবিয়া দেখিল যে, তাহাদের সম্বন্ধ এখন এমন হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, বিবাহের পূর্বে সুহাসিনীর সহিত মেলামেশা করা তাহার উচিত হইবে না। বিলাতী কোর্টশিপ ব্যাপারের বিরুদ্ধে তাহার মনে একটা মজ্জাগত বিরূপতা ছিল; এবং সুহাসও যে, যাহার সহিত বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে, প্রকাশ্যভাবে নিত্য তাহার

সাহচর্যকে কুণ্ঠার চোখে দেখে, তাহা বুঝিয়া সে বেশ তৃপ্তি পাইল। সে স্থির করিল আপাতত আর অকারণে বিনয়বাবুর বাড়ি যাইবে না।

কিন্তু প্রত্যহ কারণে অকারণে বিনয়বাবুর বাড়ি গিয়া এমন একটা অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল যে, সময় উপস্থিত হইলে মন ছটফট করিতে থাকিত। তাই দুচার দিন বাড়িতে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার পর সে বৈকালে বেড়ানোর পূর্বতন অভ্যাসটা পুনরুজ্জীবিত করিবার চেষ্টা করিল।

ইতিমধ্যে আরও কয়েকটা ব্যাপার ঘটিয়া তাহাকে উদ্ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল। ইদানীং কলেজের সুমহলে তাহাকে লইয়া বিশেষ একটা আন্দোলন আলোচনা, এমন কি হাসি-মস্করা চলিতেছে, তাহার আভাস সে মাঝে মাঝে পাইতেছিল। একদিন ক্লাশে ঢুকিয়া হঠাৎ তাহার চোখে পড়িল, বোর্ডের উপর খড়ি দিয়া বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে—বিমলা। সেদিন সে ইহার ইঙ্গিতটা ধরিতে পারিল না, কিন্তু দ্বিতীয় দিন যখন ঐ নামটার সঙ্গে হাটে হাঁড়ি এই দুটা শব্দ বোর্ডের উপর আরও বড় বড় অক্ষরে লেখা দেখিল এবং ক্লাশের দিকে চক্ষু ফিরাইতেই দেখিল, দেড় শত ছেলের চোখের অনুসন্ধিৎসা তাহার মুখে অপরাধের চিহ্ন অন্বেষণ করিতেছে, তখন কিছুই তাহার বুঝিতে বাকি রহিল না। নিমেষমধ্যে তাহার মুখখানা ক্রোধে কালো হইয়া উঠিল। কিন্তু সে আত্মসংবরণ করিয়া যথানিয়মে লেকচার দিয়া গেল, কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। ঘন্টা শেষ হইলে বিশ্রামঘরে গিয়া সে মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল, এ কাহার কাজ? তাহার পারিবারিক জীবন লইয়া এমন প্রকাশ্যভাবে কলেজের ছাত্রদের মধ্যে ঘাঁটাঘাঁটি করিতেছে কে?

কিন্তু যে-ই হউক, কেবল ছাত্রমহলে একথা প্রচার করিয়াই যে সে ব্যক্তি নিশ্চিন্ত নাই, তাহার প্রমাণ কিশোর অবিলম্বে পাইল। পরদিন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল তাহাকে নিজের ঘরে ডাকিয়া পাঠাইলেন; সে উপস্থিত হইলে নিঃশব্দে দেরাজ হইতে একখানা চিঠি বাহির করিয়া তাহাকে পড়িতে দিলেন; বেনামী চিঠি পড়িতে পড়িতে কিশোরের রগের শিরগুলি ফুলিয়া উঁচু হইয়া উঠিল। সে যে একজন স্রষ্টা স্ত্রীলোকের সহিত প্রকাশ্যে সহবাস করিতেছে, অজ্ঞাত পত্রলেখক এই সংবাদটি প্রিন্সিপ্যাল মহোদয়ের গোচর করিয়াছেন, এবং একজন অধ্যাপকের এইরূপ ব্যভিচারপূর্ণ জীবনযাত্রা ছাত্রদের নৈতিক চরিত্রের পক্ষে কিরূপ হানিকর তদ্বিষয়ে দীর্ঘ জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করিয়া পত্র শেষ করিয়াছেন।

চিঠি প্রত্যর্পণ করিয়া কিশোর জিজ্ঞাসা করিল, আপনি এখন কী করতে চান?

প্রিন্সিপ্যাল গম্ভীর-মুখে বলিলেন, বোসো। এ চিঠি কে লিখেছে, তোমার সন্দেহ হয়?

না?

তোমার কেউ শত্রু আছে?

থাকতে পারে—জানি না।

কিন্তু এরকম একটা দুর্নাম কে দিলে, কেনই বা দিলে, তাহার একটা নিরাকরণ হওয়া দরকার।

কিশোর নীরবে বসিয়া রহিল, কিন্তু তাহার চোখ দুটা অসহায় ক্রোধে জ্বলিতে লাগিল।

প্রিন্সিপ্যাল চিঠিখানা তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন, এর অভিযোগ সমস্তই মিথ্যা–কী বলো?

কিশোর কঠিন স্বরে বলিল, আপনি কি আমার কৈফিয়ত তলব করছেন?

ধীরভাবে প্রিন্সিপ্যাল বলিলেন, কলেজের কর্তৃপক্ষের দিক থেকে কৈফিয়ত তলব করলেও সেটা অনুচিত হয় না। কিন্তু আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি মাত্র।

কিশোর আরও কঠিন হইয়া বলিল, আমায় মাপ করবেন, আমি কৈফিয়ত দিতে অক্ষম। দরকার হয়, আমি কর্মে ইস্তফা দিতে প্রস্তুত আছি।

প্রিন্সিপ্যাল প্রবীণ লোক, কলেজের অধ্যক্ষতা করিয়া জীবন কাটাইয়াছেন, যুবক চরিত্রের অন্ধ্ররন্ধ্র তাঁহার সুপরিচিত। বিশেষ, কিশোর তাঁহার কলেজেরই ছাত্র ছিল, তাহাকে তিনি ভাল করিয়া চিনিতেন। শুধু অপরাধীই যে কৈফিয়ত দিতে ভয় পায় তাহা নহে, আত্মমর্যাদাশীল তেজস্বী ব্যক্তিও যে মিথ্যা দোষে অভিযুক্ত হইয়া নিজের সাফাই গাহিতে ঘৃণা বোধ করে, ইহাও তাঁহার অপরিজ্ঞাত ছিল না। তিনি কিশোরের গায়ে হাত রাখিয়া বলিলেন, কিশোর, এ যে মিথ্যা অপবাদ, তা আমি জানি। কিন্তু কলেজের পক্ষ থেকে এ

বিষয়ে আমার অনুসন্ধান করা উচিত নয় কি—তুমিই বলো? তা ছাড়া আমি তোমাকেই জিজ্ঞাসা করছি, আর কাউকে তো জিজ্ঞাসা করিনি করবও না। আমি বন্ধুভাবে কেবল জানতে চেয়েছিলাম, কে তোমার এমন অনিষ্ট করতে চায় এবং কতটুকু সত্যকে ফেনিয়ে তুলে সে এই মিথ্যার সৃষ্টি করেছে। কিন্তু আজ থাক, আজ তোমার মন ভাল নেই। আর একদিন তোমার মাথা ঠাণ্ডা হলে এ বিষয়ে আলোচনা করা যাবে। এই বলিয়া তাহাকে বিদায় করিলেন। কিশোর এই ভক্তিভাজন গুরুতুল্য লোকের প্রতি অকারণ রূঢ়তা প্রকাশ করার জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া ফিরিয়া আসিল।

সেদিন কিশোর সকাল সকাল বাড়ি ফিরিয়া আসিল, কিন্তু তাহার মনের অশান্তি দূর হইল না। এ এমনই কথা যে বৌদিদির কাছে বলিয়াও হৃদয়ভার লাঘব করা যায় না। ঘরে চুপ করিয়া বসিয়া থাকলে ঐ কথাটাই অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া মনকে উৎপীড়িত করিতে থাকিবে। এইরূপ অবস্থার কী করিয়া এ অন্তদাহের হাত হইতে নিস্তার পাইবে স্থির করিতে না পারিয়া হাঠৎ তাহার স্মরণ হইল করবীর কথা। করবী দুইবার তাহাকে নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করিয়াছে, এতদিন কেবল অবহেলা। করিয়াই নিমন্ত্রণ রক্ষা করা হয় নাই। কিশোর আর দ্বিধা না করিয়া উঠিয়া পড়িল এবং কালোচিত শেভূষা পরিয়া করবীর পিতৃভবনের উদ্দেশ্য যাত্রা করিল।

চৌরঙ্গীর দিকে সাহেব-পল্লীতে করবীদের বাড়ি। ধর্মতলার ট্রাম হইতে নামিয়া পথে হগ সাহেবের বাজারের ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে একটা ফুলের দোকানে অনেক লাল ও সাদা করবীফুল দেখিয়া কিশোর একগুচ্ছ তাহাই কিনিয়া লইল।

কিশোরকে দেখিয়া করবী ভারি খুশি হইল, ছুটিয়া আনন্দিত কলকণ্ঠে তাহার অভ্যর্থনা করিল। ভতরে গিয়া বসাইবার পর কিশোর তাহার সাজ-সজ্জার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, আপনি কোথাও যাচ্ছিলেন, আমি এসে বিঘ্ন করলুম।

করবী বলিল, তা হোক, কোথাও যাওয়ার চেয়ে আপনি এসেছেন, এতেই আমি বেশী খুশি হয়েছি।

কিশোর হাতের ফুলগুলা করবীকে দিয়া বলিল, এই ফুলগুলো আপনার নামে আত্ম-প্রচার করে নজেদের দর বাড়াবার চেষ্টা করছিল, তাই দেখে অপরাধীদের আপনার কাছে ধরে এনেছি।

করবী একবার কিশোরের স্মিতমুখ ও একবার তাজা ফুলগুলি নিরীক্ষণ করিয়া হাসিয়া উঠিল, ওঃ! কিন্তু তা তো নয়। বরং আমিই ওদের নাম জাল করে নিজেকে ওদের নামে চালিয়ে দেবার চেষ্টা করছি।

কিশোর মাথা নাড়িয়া বলিল, কখনই না। আমি ঠিক জানি ফুলগুলো ঝুটো, আপনি সাচ্চা।

করবী করতালি দিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, আচ্ছা কিশোরবাবু, আপনি এমন সুন্দর সুন্দর কথা তৈরি করে বলেন কী করে? আমি তো একেবারেই পারি না, যা মুখে আসি বলে ফেলি!

কিশোর বলিল, ভগবান আপনাকে অনেক গুণ দিয়েছেন, মনের কথা মুখে প্রকাশ করতে একটুও কষ্ট হয় না। আমি হতভাগ্য—প্রাণের কথাটি বলতে হলে অনেক ভেবেচিন্তে ভাষাকে আয়ত্ত করে তলব বলতে হয়। সেই জন্যই বোধ হয় অমন ছাপার অক্ষরের মত শোনায়।

করবী সপ্রশংস দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, আপনি অদ্ভুত লোক। এই ছুতো করে আবার একটা মপ্লিমেন্ট দিয়ে দিলেন। আপনার মত এমন কমপ্লিমেন্ট দেবার ক্ষমতা আমি কারুর দেখিনি– সাহেবদেরও না।

কিশোর বলিল, যার কোন গুণ নেই, বিনীতভাবে কথা বলবার ক্ষমতাও যদি তার না থাকে, তাহলে সে যে নিতান্তই অপাঙক্তেয় হয়ে পড়বে।

করবী ঘরের চারিকোণে রূপার ফুলদানিতে ফুলগুলি সাজাইয়া রাখিয়া, একটি সবৃন্ত লাল মঞ্জরী হাতে লইয়া কিশোরের সম্মুখে আসিয়া বলিল, উঠুন। এইটে আমার চুলে পরিয়ে দিন তো! বলিয়া কবরীবদ্ধ মাথাটি কিশোরের দিকে ফিরাইয়া দাঁড়াইল।

কিশোর মনে মনে ভারি কৌতুক অনুভব করিল। করবীর ছেলেমানুষের মত অসঙ্কোচ অনেক ময় শালীনতাকে ভ্রুক্ষেপ করে না। যাহার সঙ্গে মাত্র দুদিনের পরিচয়, এরূপ যুবকের দ্বারা নিজের বরী পুষ্পশোভিত করিয়া লইতে তাহার বাধে না, তাহার প্রাণের এই নির্মল নির্মুক্ততা অত্যন্ত মঠাভাবেই কিশোরের হৃদয় স্পর্শ করিল। আজ তাহার

প্রাণে অনেকখানি গ্লানি লুকাইয়া ছিল, প্রবীর এই বিশ্বাসপূর্ণ বন্ধুত্ব যেন তাহার মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া দিয়া গেল। সে তাহার খোঁপার মধ্যে অপটু হস্তে ফুল খুঁজিয়া দিতে দিতে মেহামনে ভাবিতে লাগিল, আজ যদি তাহার করবীর মত কেটি সহোদরা ভগিনী থাকিত, সেও বোধ করি এমনই অলজ্জিত অকুণ্ঠ অধিকারে দাদার সাহায্যে নজের কুন্তল-শোভা বর্ধিত করিয়া লইত।

দফুল পরানো হইলে করবী চকিতের ন্যায় অদূরের একটা আয়নার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া লইয়া সহাস্যমুখে কিশোরের দিকে ফিরিল; তারপর অঙ্গুলি দিয়া শাড়ির দুপাশের দুই অংশ ধরিয়া পায়ের পিছনে পা দিয়া হাঁটু মুড়িয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, থ্যাঙ্ক ইউ।

কিশোর অবাক হইয়া বলিল, ও কী হল?

করবী চঞ্চল চোখে চাহিয়া বলিল, ওকে ক্যার্টসি বলে—তাও জানেন না?—এখন চলুন, মার সঙ্গে দেখা করবেন। মা রোগা মানুষ, বেশী চলতে ফিরতে পারেন না, ওপরেই থাকেন। বাবা এখনও অফিস থেকে ফেরেননি, কিন্তু তিনিও এসে পড়লেন বলে। বাবা এলে সবাই মিলে চা খাওয়া যাবে। ওঃ—আপনি বুঝি আবার চা খান না। আচ্ছা, আপনার জন্য অন্য বন্দোবস্ত হবে অখন। ঘোলের সরবতে আপত্তি নেই তো?

তারপর ঘণ্টা দুই কিশোরের ভারি আনন্দে কাটিয়া গেল। করবীর মা রুগ্না স্ত্রীলোক, বেশী নড়াচড়া করা ডাক্তারের নিষেধ। বাড়ি হইতে বাহির হইতে পান না, তাই বাহিরের কেহ দেখা করিতে আসিলে ভারি আহ্লাদিত হন। করবীর বাবা প্রমদাবাবু পুলিস হইলেও

বেশ সজ্জন ব্যক্তি, পুলিস জীবনের নানা কৌতুকপ্রদ গল্প বলিয়া আসর জমাইয়া তুলিলেন। পুলিসের লোক যে এত মিশুক ও মজলিশী হইতে পারে, কিশোরের তাহা ধারণাই ছিল না।

রাত্রি প্রায় আটটার সময় ইহাদের অপর্যাপ্ত প্রীতি ও আতিথেয়তা উপভোগ করিয়া পুনরায় আসিবার অঙ্গীকার করিয়া কিশোর যখন বিদায় লইল, তখন সে তাহার চিরাভ্যস্ত প্রফুল্লতা ফিরিয়া পাইয়াছে। সম্পূর্ণ অনাত্মীয় পরিবারের কাছে আত্মীয়ের ন্যায় সমাদর পাইয়া এই কথাই ভাবিতে ভাবিতে সে বাড়ি ফিরিল যে, শত্রু তাহার যত শত্রুতাই করুক, যাঁহারা নিরপেক্ষ তাঁহাদের স্নেহ ও সম্মান আকর্ষণ করিবার মত গুণ তাহার আছে।

15

জন্মাষ্টমীর কয়েকদিন আগে হইতে বিনয়বাবুর শরীর খারাপ যাইতেছিল। তাঁহার সাবেক হাঁপানির ব্যারাম আবার মাথা তুলিয়াছিল। যদিও গুরুতর কিছু নয়, তথাপি দুইদিনের জন্য বৃদ্ধকে বিছানায় পাড়িয়া ফেলিয়াছিল।

এই যন্ত্রণাদায়ক রোগ সারাইবার জন্য তিনি গত পনেরো বৎসর অনেক চিকিৎসা, এমন কি দৈব অবধূত পর্যন্ত করাইয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কোন ফল পান নাই। অবশেষে একটা দামী বিলাতী পেটেন্ট ঔষধ সেবন করিলে তখনকার মত উপশম হইত।

জন্মাষ্টমীর পরদিন তিনি অনেকটা ভাল হইয়া উঠিয়াছিলেন। দুপুরবেলা তাঁহাকে বিছানার উপর পিঠে বালিশ দিয়া বসাইয়া হাতে একখানা বই দিয়া সুহাসিনী নিজের ঘরে সেলাই লইয়া বসিয়াছিল। নীচে লাইব্রেরি-ঘরে গিয়া বসিবার জন্য বিনয়বাবু আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু আজ বৈকালে শরীর ভাল থাকিলে একবারটি নীচে যাইতে দিলেও দিতে পারে, সুহাসিনী এইরূপ আশ্বাস দিয়া রাখিয়াছিল।

আরামকেদারায় হেলান দিয়া বসিয়া সেলাই করিতে করিতে সুহাসিনী অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে আসিয়া তাহার চোখ টিপিয়া ধরিল। সুহাসিনী কে রে? বলিয়া চমকাইয়া উঠিল, তারপর আঙুল দিয়া আগন্তুকের হাতে চুড়ি অনুভব করিয়া বলিল, করবী, চোখ ছাড়। কী চমকে দিতেই পারিস মানুষকে।

চোখ ছাড়িয়া গলা জড়াইয়া ধরিয়া করবী বলিল, কি ভাবছিলে ভাই হাসিদি তন্ময় হয়ে?—ঘরে ঢুকলাম—জানতেও পারলে না?

সুহাস বলিল, কিছু নয়। দুপুরবেলা হঠাৎ এলি যে? করবী বিছানার উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, জ্যেঠামশায়ের অসুখ জানতে পারিনি ভাই, আজ সকালে একজনের মুখে শুনতে পেয়ে খবর নিতে এলুম। কেমন আছেন তিনি?

আজ একটু ভাল আছেন। পিসীমা কোথায় রে, তিনি একদিনও বাবাকে দেখতে এলেন না?

পিসীমা তো সাতদিন হল বহরমপুর গেছেন। তাঁর দেওরের সঙ্গে কী মামলা-মোকর্দমা হবে, বাবাকে কাগজপত্র দেখাচ্ছিলেন, তাই জানতে পারলুম। বড়দাও এখানে ছিলেন না, পিসী। বহরমপুর যাবার পর তিনি কোথায় গিয়েছিলেন, আজ সকালে ফিরে এসেছেন।- বড়দার একটা কী হয়েছে, ভাই।

বিস্মিত হইয়া সুহাসিনী বলিল, কী হয়েছে?

তা জানি না, কিন্তু যেন কেমন কেমন লাগল। আজ এসেই আমাদের বাড়ি গিয়েছিলেন, মার সঙ্গেও দেখা করলেন না। আমাকে বললেন, বিকেলে সুহাসদের বাড়ি যাস, ভারি মজা হবে। বলেই। হঠাৎ চলে গেলেন। আমি তো কিছুই বুঝতে পারলুম না। কী মজা হবে ভাই, হাসিদি?

কি জানি। কিছুক্ষণ বিমনা হইয়া বসিয়া থাকিয়া সুহাসিনী বলিল, তাই বুঝি তুই সকাল-সকাল এসে হাজির হয়েছিস মজা দেখবি বলে?

করবী বলিল, দূর! মজা দেখবার জন্যে তো আমার ঘুম হচ্ছিল না। আর বড়দার মজা, সে ভাই। উনিই বোঝেন, আর কেউ বোঝে না। কেবল পরকে অপদস্থ করা, হয়তো ঝগড়া করা। সে ভাই আমার ভাল লাগে না। আমি এলুম নিরিবিলি তোমার সঙ্গে দুটো গল্প করব বলে। বাড়িতে একলা কি মন লাগে?

করবী শয্যায় উপুড় হইয়া দুই উথিত করতলে চিবুক রাখিয়া বলিল, কিন্তু অতদূরে বসে থাকলে কি গল্প হয়? এখানে এসে বোসস না, ভাই।

সুহাসিনী উঠিয়া বলিল, তা বসছি। কিন্তু খালি খালি চুমু খেয়ে যদি বিরক্ত করিস, তাহলে ভাল হবে না বলে দিচ্ছি। ও সব আদর আমি ভালবাসি না।

করবী বলিল, ইঃ, ভালবাসি না। বল না কেন, আমি চুমু খেলেই ভাল লাগে না, আর কেউ যদি—

চুপ করে পোড়ারমুখী! মেয়েদের স্কুলে পড়ে ভারি ফাজিল হয়েছিস। বলিয়া হাসিতে হাসিতে শাসনচ্ছলে তাহার গাল টিপিয়া দিল।

সুহাস তাহার পাশে আসিয়া বসিলে করবী মুখ গম্ভীর করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, হাসিদি, তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ আছে, ভাই। কিন্তু সে ভারি গোপনীয় কথা, কাউকে বলবে না বলো।

ইতিপূর্বে আরও কয়েকবার করবীর গোপনীয় কথা সুহাসিনী শুনিয়াছে, সুতরাং কথাটা যে কী, তাহা বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না। সে মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, কী কথা শুনি?

করবী গলা ধরিয়া সুহাসের কান নিজের মুখের কাছে টানিয়া আনিয়া ফিসফিস করিয়া গোপনীয় কথা বলিল।)

শুনিয়া সুইস উঠিয়া বলিল, এই কথা! তা এবার নিয়ে কবার হল রে?

কিছুমাত্র লজ্জিত না হইয়া করবী সহাস্যে বলিল, চারবার; কিন্তু এবার ভাই সত্যি-সত্যি, খেলা নয়; একেবারে চিরজীবনের জন্যে—for ever and ever!

সুহাস বলিল, সে তো প্রত্যেকবারেই বলিস। হ্যাঁ রে, তোর দুদিনের জন্যও মতি স্থির থাকে না? সত্যেনবাবু বেচারীর কী দশা হবে?

করবী বিজ্ঞের মত চিন্তা করিয়া বলিল, তোমার কাছে সত্যি কথা বলছি ভাই হাসিদি, সত্যেনবাবু খুব ভাল টেনিস খেলতে পারেন বলে ওঁকে আমার ভারি পছন্দ হত,

ভেবেছিলুম সত্যিই বুঝি তাঁকে ভালবাসি। কিন্তু এখন দেখছি সে একেবারেই ছেলেমানুষী।

হাসি চাপিয়া সুহাসিনী বলিল, আর নীতীশবাবু। তিনি কি অপরাধ করলেন?

গলা ফুলাইয়া করবী বলিল, নীতীশবাবু ভাল লোক নয়, ভাই। গলা খাটো করিয়া বলিল, একদিন একলা পেয়ে আমাকে চুমু খাবার চেষ্টা করেছিল। আমি তার গালে এমন একটি চড় কষিয়ে নয়েছিলাম যে, সেই থেকে আর আমার কাছে ঘেঁষে না।

সুহাস খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

করবী বলিল, যাও, তুমি হাসছ—তাহলে বলব না।

না, হাসব না, বল। লোকটি কে?

সন্দিগ্ধ চোখে চাহিয়া করবী বলিল, না, তুমি মুখ টিপে টিপে হাসছ। তোমার গায়ে হাত দিয়ে লেছি ভাই, এবার আর ঠাট্টা নয়, এবার জীবন-মরণের সমস্যা।

তাই তো জানতে চাইছি, জীবন-মরণের সমস্যাটি কে?

করবী একটু মলিন হইয়া বলিল, আমার প্রাণের কথা বুঝতে যদি নিজে কখনো প্রেমে পড়তে। তখন আর হেসে ওড়াতে পারতে না। একটু থামিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, আচ্ছা হাসিদি, তুমি কখনো কারু প্রেমে পড়নি?

দূর! আমি কি তোর মত পাগল? বলিয়া সুহাস কোলের উপর হইতে সেলাইটা তুলিয়া লইল।

উৎসাহে উঠিয়া বসিয়া করবী বলিল, বলো না হাসিদি, লক্ষ্মীটি, পায়ে পড়ি।

উৎসাহে দ্রুতবেগে ক্রুশকাঠি চালাইতে চালাইতে সুহাস বলিল, তুই নিজের কথা বল না বাপু, আমার কথা শুনে কী হবে?

সেলাই কাড়িয়া লইয়া করবী বলিল, না বলল। বা রে! আমিই খালি বলব আর তুমি মুখ বুজে থাকবে—সে হবে না।

অল্পকাল চুপ করিয়া থাকিয়া একটু লাল হইয়া সুহাস বলিল, যদি বলি হ্যাঁ, তাহলে কী করিস?

তাহলে গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খাই। তৎক্ষণাৎ সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিয়া আহ্লাদে করবী বলিল, কে ভাই তিনি? নিশ্চয় আমার জানা লোকনয়? আচ্ছা, তিনি তোমাকে ভালবাসেন?

সুহাসিনী উত্তর না দিয়া মৃদু হাসিল। করবী বলিয়া চলিল, নিশ্চয় বাসেন, তোমাকে না ভালবেসে কেউ থাকতে পারে? বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেছে, না? আচ্ছা, কি দুষ্টু তুমি, আমাকে একটি কথাও কি বলতে নেই? আমি কিন্তু ব্রাইড-মেড হব, তা এখন থেকে বলে দিচ্ছি। কিন্তু আসল কথাটাই যে বললে না—কে ভাই তিনি যিনি আমার সিদির মনটিকে হরণ করে নিয়েছেন?

বরের বুঝি নাম করতে আছে?

ইস্! এখনো তো বর হয়নি, এরি মধ্যে নাম করতে নেই? তুমি ভাই একদম সেকেলে।

আচ্ছা, কাছে আয়, কানে কানে বলছি!

ইলেকট্রিক বাতির গোলকের মধ্যে হঠাৎ আলো নিভিয়া গেলে চোখের পদার উপর তাহার প্রতিচ্ছবি যেমন ধীরে ধীরে ম্লান হইয়া যায়, নাম শুনিয়া করবীর মুখের হাসিও তেমনি করিয়া মিলাইয়া গেল। তাহার মুখের সমস্ত রক্ত নামিয়া গিয়া মুখখানা ছাইয়ের মত পাংশু হইয়া গেল, কিন্তু পরক্ষণেই আবার এক ঝলক রক্ত ছুটিয়া আসিয়া তাহার চোখের দৃষ্টি পর্যন্ত রক্তাভ করিয়া দিল। দৃষ্টিপথের সম্মুখস্থ কুয়াশার ভিতর দিয়া সে বিহ্বলের মত চাহিয়া রহিল।

করবীর মুখের দিকে সুহাসের দৃষ্টি ছিল না, থাকিলে বোধকরি সকল কথা প্রকাশ হইয়া দুজনের লজ্জা রাখিবার স্থান থাকিত না। সুহাস নিজমনে হাসিয়া বলিল, দুধ-ভাত খেলেই বরের নাম করার দোষ কেটে যায়। আজ রাত্তিরে দুধ-ভাত খাব।

এইবার করবী যেন ধাক্কা খাইয়া চেতনা ফিরিয়া পাইল। এ মুখের ভাব যে সুহাসকে কিছুতেই দেখাইলে চলিবে না, এ দুঃসহ লজ্জা যেমন করিয়া হউক গোপন করিতে হইবে, এই চিন্তা তাহার মুখখানাকে কাঠের মত শক্ত করিয়া দিল। একটা ফ্যাকাসে হাসি টানিয়া আনিয়া সে বলিল, কিশোরবাবু? এত শিগগির এই কদিনের মধ্যে—তাই কিছু জানতে পারিনি! আমি ভেবেছিলুম–তারপর অনর্গল দশ মিনিট ধরিয়া সে যে কী বলিয়া গেল, তাহার মাথামুণ্ড নিজেই সে বুঝিতে পারিল না। সুহাসের সন্দিগ্ধ দৃষ্টি তাহার উপর নিবদ্ধ দেখিয়া সে থামিয়া গেল, খুব হাসিয়া উঠিয়া বলিল, আবোল-তাবোল বকছি-না? খুব আমোদ হলে আমার ঐ রকম হয়, তখন। আর কথার মানে খুঁজে পাওয়া পাওয়া যায় না।

সুহাস বলিল, এবার তুই বল, তোর তিনিটি কে?

করবী বলিল, সে হবে খন। আগে এই খবরটা ভাল করে হজম করে নি। আচ্ছা হাসিদি, কিশোরবাবু তোমাকে খুব ভালবাসেন?

আমি জানি না। তাঁকে জিগ্যেস কগে যা। জান না বৈকি! না জেনেই বুঝি এত হাবুডুবু খাচ্ছ?

হাবুডুবু খাচ্ছি কে বললে?

বুক নিংড়াইয়া করবী হাসিল, সে তত দেখতেই পাচ্ছি! আচ্ছা হাসিদি, সত্যি করে বলো না, ওঁকে কি রকম ভালবাস? খুব-খুব অনেক?

তাহার গালে আঙুলের মৃদু টোকা মারিয়া লজ্জিত স্মিতমুখে সুহাস বলিল, অনেক।

ঘড়িতে ঠং ঠং করিয়া তিনটা বাজিল। সুহাস বলিল, তুই বোস, বাবাকে ওষুধ খাইয়ে আসি। বলিয়া উঠিয়া গেল।

সে ফিরিয়া আসিতেই করবী বলিয়া উঠিল, চল, কিশোরবাবুর বাড়ি যাই, ওঁর বৌদিদির সঙ্গে আলাপ করে আসি।

সুহাস সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, তুই যা, আমি ভাই যেতে পারব না।

কেন, লজ্জা করবে?

বাবাকে একলা ফেলে যাব, যদি কিছু দরকার হয়? তুই যা না, ঝিকে সঙ্গে দিচ্ছি।

যদি সুহাস পুরাতন প্রশ্নটা আবার করিয়া বসে, এই ভয়ে করবী কোন ছুতায় পলাইবার চেষ্টা করিতেছিল, সে উঠিয়া বলিল, তাই যাই! কথা দিয়েছি, না গেলে অন্যায় হবে।

তা যা না, ওঁরা সব বাড়ি আছেন, জন্মাষ্টমীর ছুটি। দীনবন্ধুকাকাও এসেছেন, তাঁর আজ এখানে নেমন্তন্ন।

ও—তবে থাক। বলিয়া করবী বসিয়া পড়িল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার উঠিয়া বলিল, চল ভাই, জ্যাঠামশায়ের কাছে গিয়ে বসি। তিনি একলা রয়েছেন, রোগা মানুষ, আমরা কাছে বসে গল্প করলে খুশি হবেন। বলিয়া সুহাসের মতামতের প্রতীক্ষা না করিয়া আগেই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বেলা চারটা বাজিতে না বাজিতে অনুপমচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইল। একেবারে বিনয়বাবুর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া অযাচিত কৈফিয়ত দিয়া বলিল, কদিন কলকাতায় ছিলাম না, একটা জরুরী কাজে বাইরে যেতে হয়েছিল, তাই আসতে পারিনি। শরীর খারাপ হয়েছিল? ও কিছু নয়। এখন তো বেশ ভালই আছেন দেখছি, নীচে চলুন না–

বিনয়বাবু বলিলেন, আমারও তো তাই ইচ্ছে, কিন্তু সুহাস–

অধীরভাবে অনুপম বলিল, ওদের আপত্তি শুনতে গেলে কাজ চলে না। কদিন ধরে এ ঘরেই বন্ধ হয়ে আছেন, নীচে গেলে একটা চেঞ্জ হবে। উঠুন। একলা নামতে না পারেন,

আমার কাঁধে ভর দিয়ে চলুন। সামান্য অসুখকে বড় করে তুলে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়া মেয়েদের একটা স্বভাব।

অনুপমের মুরুব্বিয়ানায় সুহাসিনী মনে মনে বিরক্ত হইল, কিন্তু পিতার আগ্রহ দেখিয়া আর কিছু বলিতে পারিল না। বিনয়বাবু অনুপমের সাহায্যে আস্তে আস্তে নামিয়া নীচে ড্রয়িংরুমে গিয়া বসিলেন।

সকলে উপবিষ্ট হইলে অনুপম কৈফিয়তের জের টানিয়া বলিল, আজকাল অফিসে যে রকম কাজ পড়েছে, নাওয়া-খাওয়ার ফুরসত পাই না। সীনিয়র তো কিছুই করেন না। বুড়ো হয়েছেন, নড়তেও পারেন না, বাইরের যত কাজ আমার ঘাড়ে ফেলে নিশ্চিন্দি। আর, আমি ছাড়া হয়ও না কারু দ্বারা। এই তো একটা ব্রীফ বোঝাতে পুরুলিয়া যেতে হল। যাক, একরকম মন্দ হল না, কাজকে কাজ, সেই সঙ্গে পরের পয়সায় বেড়ানো হল।

কেহ কোন উত্তর করিল না। সুহাসিনী মাথা নীচু করিয়া বুনিতে লাগিল, করবী অন্যমনস্কভাবে জানালার বাহিরে তাকাইয়া রহিল।

অনুপম এবার কাজের কথা পাড়িল। কোন বিষয়েই সে সবুর করিতে পারে না, গলাটা ভাল করিয়া ঝাড়িয়া লইয়া বিনয়বাবুর দিকে ফিরিয়া বলিল, একটা অপ্রীতিকর কাজ বাধ্য হয়ে আজ আমাকে করতে হবে। এতে আমার নিজের কোনও স্বার্থ আছে—আপনারা মনে করবেন না, সুবিনয় অনেক পাজি লোক ভদ্রতার মুখোস পরে ঘুরে

বেড়ায়, সকলকে ধরিয়ে দেওয়া আমার জীবনের ব্রত নয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কর্তব্যের অনুরোধে এ কাজ আমাকে করতে হচ্ছে।

সকলের বিস্মিত দৃষ্টি অনুপমের উপর গিয়া পড়িল। সে পকেট হইতে একখানা ভাঁজ করা কাগজ বাহির করিয়া বক্তৃতার ভঙ্গিতে বলিল, যাদের আমি বন্ধু বলে মনে করি, তাদের সম্বন্ধে আমি উদাসীন থাকতে পারি না, এই আমার স্বভাব। বন্ধুত্বের খাতিরে অনেক অপ্রিয় কাজ করতে হয়, এমন কি, সময় সময় এমন কাজও করতে হয় বন্ধুরা যাকে হয়তো অনধিকারচর্চা বলেও মনে করতে পারেন। কিন্তু ও সব সেন্টিমেন্টকে আমি ডরাই না। যাঁদের ভালবাসি, অনিষ্টের হাত থেকে তাঁদের রক্ষা করতে গিয়ে অপ্রিয় হতে আমার আপত্তি নেই।

অস্থির হইয়া বিনয়বাবু বলিলেন, কথাটা কী? তুমি যে খালি হেঁয়ালির সৃষ্টি করে চলেছ।

অনুপম কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া গাম্ভীর্যের মাত্রা আরও বাড়াইয়া দিয়া বলিতে লাগিল, আপনাদের স্মরণ থাকতে পারে, কিছু দিন পূর্বে কোন একটি লোকের বিরুদ্ধে আমি আপনাদের সতর্ক করে দিয়েছিলুম; প্রথম থেকেই বুঝেছিলুম তিনি কি প্রকৃতির লোক এবং সে কথা প্রকাশ করে বলতেও দ্বিধা করিনি। এই জন্যে অনেক ব্যঙ্গবিদ্রূপ আমাকে সহ্য করতে হয়েছে, কিন্তু কর্তব্যের খাতিরে সে সব আমি গ্রাহ্য করিনি। আপনারা বিশ্বাস করে তাকে অন্তরঙ্গের মধ্যে স্থান দিয়েছেন, এমন কি, বাড়ির মহিলাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার অবকাশ দিয়েছেন, আমার নিষেধে কর্ণপাত করেননি। কিন্তু এই লোকটা আপনাদের বিশ্বাস ও ঘনিষ্ঠতার কতদূর অযোগ্য, তার অকাট্য প্রমাণ আজ আমি দিতে পারি।

বিনয়বাবু নির্বাক বিহুলের মত বসিয়া রহিলেন। কিন্তু সুহাসিনী কথা কহিল, জ্বলন্ত দুই চক্ষু অনুপমের উপর নিবদ্ধ করিয়া অনুচ্চস্বরে কহিল, কার কথা আপনি বলছেন—কিশোরবাবুর?

বিকৃতমুখে হাসিয়া অনুপম বলিল-হ্যাঁ কিশোরবাবুর। যাঁকে আস্কারা দিয়ে তুমি মাথায় তুলেছ যাঁর মত ব্যক্তি পৃথিবীতে আর নেই। তিনি কী, তা জানো?

তেমনই তীব্র অনুচ্চকণ্ঠে সুহাসিনী বলিল, জানি। কিন্তু আপনি তাঁর কী জানেন জিজ্ঞাসা করি?

বিজ্ঞ হিতৈষীর ছদ্মবেশ ফেলিয়া দিয়া উগ্র কটুকণ্ঠে অনুপম বলিয়া উঠিল, লম্পট, দুশ্চরিত্র, স্কাউনড্রেল! আরও জানতে চাও? সমাজে একঘরে, বাপের ত্যাজ্যপুত্তুর! কী জানি আমি! কী জানি না? জোচ্চোর বদমায়েস কোথাকার।

জ্যা-মুক্ত ধনুকের মত সোজা দাঁড়াইয়া উঠিয়া সুহাসিনী বলিল, অনুপমবাবু, আপনি সাবধান হয়ে কথা বলবেন। আপনি জানেন না তিনি– বলিতে বলিতে থরথর করিয়া কাঁপিয়া সে আবার বসিয়া পড়িল। তাহার মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না।

বিনয়বাবু ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিলেন, ছি ছি অনুপম, এ সব তুমি কি বলছ? বিদ্বেষে অন্ধ হয়ে–কিশোরের মত ছেলে—তুমি কি পাগল হলে–

পাগল আমি হইনি, আপনারা হয়েছেন। আমার কথা আপনারা বিশ্বাস করবেন না জানি। এর পূর্বে একবার আমি এই কথাই আপনাদের জানাতে চেয়েছিলাম। সেদিন চোখ রাঙিয়ে সে আমাকে থামিয়ে দিয়েছিল; আপনারা তাতে মত দিয়েছিলেন। আজ তাই আমি প্রমাণ হাতে করে এসেছি—এই দেখুন। বলিয়া অনুপম হাতের কাগজখানা বিনয়বাবুর সম্মুখে তুলিয়া ধরিল।

অভিভূতের ন্যায় বিনয়বাবু বলিলেন, কী এ? কিসের প্রমাণ?

পড়ে দেখুন, বুঝতে পারবেন। সুহাসিনীর দিকে ফিরিয়া বিজয়গর্বিত কণ্ঠে বলিল, কিশোরবাবুর বাপের চিঠি। গুণধর ছেলেকে বাপ কী সার্টিফিকেট দিয়েছেন, একবার পড়ে দেখ।

পশুপতিনাথ চক্রবর্তী যে কিশোরের বাপের নাম, তাহা বিনয়বাবু কিশোরের কাছে জানিয়া লইয়াছিলেন। এ চিঠি তাঁহারই লেখা। পাঠ করিবার পর বিনয়বাবুর অবশ হস্ত হইতে কাগজখানা পড়িয়া গেল। অনুপম সেটা কুড়াইয়া সুহাসিনীকে খোঁচা দিয়া বলিল, তুমি বোধ হয় পড়তে চাও না। বিশ্বাসের জোর কমে যেতে পারে।

সুহাসিনী উত্তর দিতে পারিল না, উত্তর দিল করবী। সে উঠিয়া আসিয়া অবজ্ঞাপূর্ণ স্বরে বলিল, দেখি, কী চিঠি নিয়ে এত গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছ। চিঠিখানা আগাগোড়া

পড়িয়া চাপা ক্রোধের কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, বড়দা, মিথ্যে কথা, সমস্ত মিথ্যে কথা। কোত্থেকে এ সব তৈরি করে নিয়ে এলে? আমি বিশ্বাস করি না!

সে চিঠিখানা হাতে মুড়িয়া ফেলিয়া দিতে যাইতেছিল, সুহাসিনী ব্যগ্রভাবে বলিল, দেখি—দেখি করবী।

করবী তাহার হাতে তাল-পাকানো কাগজখানা দিল। কম্পিত হস্তে সেটা সমান করিয়া সুহাসিনী পড়িবার চেষ্টা করিল, প্রথমটা কিছুই পড়িতে পারিল না। তারপর অক্ষরগুলা স্পষ্ট হইয়া উঠিল, পড়িতে পড়িতে তাহার মুখ সাদা হইয়া গেল। যখন পড়া শেষ হইয়া গেল, তখনও সে কাগজখানা দুহাতে শক্ত করিয়া ধরিয়া অন্ধ দৃষ্টিতে তাহার পানে তাকাইয়া রহিল।

চিঠিতে লেখা ছিল—

আমার পুত্র কিশোরচন্দ্র চক্রবর্তীর নামে গত কয়েক মাসে নানা প্রকার কুৎসিৎ জনশ্রুতি শুনিয়া, স্বয়ং পরীক্ষা করিবার জন্য আমি একদিন হঠাৎ কলিকাতায় গিয়া তাহার আমহার্স্ট স্ট্রীটের বাসায় উপস্থিত হই। দেখিলাম, সে এক বিধবা যুবতীকে ভ্রাতৃবধু পরিচয় দিয়া তাহার সহিত ব্যভিচারীর জীবন যাপন করিতেছে। আমি তাহাকে সৎপথে আসিতে বহু অনুরোধ করা সত্ত্বেও সে ঐ কুলটা স্ত্রীলোককে ত্যাগ করিতে সম্মত হইল না।

ধর্মের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, আমি এই কুলকলঙ্ক পুত্রের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়াছি; মৃত্যুর পর আমার সত্ত্বার করিবার অধিকার পর্যন্ত তাহার থাকিবে না। এইরূপ পাপাচারী পুত্রের অগ্নি গ্রহণ করিলে পরকালে আমার সদগতি হইবে না।

শ্রীপশুপতিনাথ চক্রবর্তী।

অনেকক্ষণ পরে মড়ার মত দুই চোখ তুলিয়া যখন সুহাসিনী সম্মুখে চাহিল, তখন দেখিল, কিশোর ও দীনবন্ধুবাবু পদা ঠেলিয়া ঘরে প্রবেশ করিতেছেন।

16

জন্মাষ্টমীর উপবাস করিয়া পরদিন মধ্যাহ্নে নিমন্ত্রিত দীনবন্ধুবাবুকে স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া খাওয়াইয়া, দক্ষিণা দিয়া, গলায় আঁচল দিয়া প্রণামান্তে বিমলা যখন উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন দীনবন্ধু তাহার মুখের পানে চাহিয়া অন্তরের সঙ্গেই বলিলেন, আশীর্বাদ করি মা, পুণ্যবতী হও। প্রাণ তোমার শুদ্ধশুচি হোক, নিষ্পাপ হোক।

দুপুরবেলাটা কিশোরের ল্যাবরেটরি ঘরে তিনজনের খুব আনন্দে কাটিল। প্রথমটা বিমলা দীনবন্ধুর সঙ্গে কথা বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল, কিন্তু তিনি বলিলেন, আমার কাছে লজ্জা করা বৃথা, কারণ, কাল থেকেই আমি তোমার কাছে ফলাহারের ন্যায্য দাবি নিয়ে প্রত্যহ বিকেলবেলা যাতায়াত শুরু করব। এতদিন জানতুম না বলেই ফাঁক পড়ে গেছে, কিন্তু আর ফাঁকি দিতে পারবে না। এখন শুধু লজ্জার জোরে লোলুপ ব্রাহ্মণকে ঠেকিয়ে রাখা শক্ত হবে।

ল্যাবরেটরির সরঞ্জাম সকল পরীক্ষা করিতে করিতে কিশোরকে বলিলেন, শিশিবোতল তো সাজিয়েছে অনেক কিছু করতে পারলে?

মাথা নাড়িয়া কিশোর বলিল, না। আয়োজন দেখে মনে হয় বটে যে, উদ্যোগও ওর পিছনে বুঝি অনেকখানি আছে। কিন্তু সেটা ভ্রান্তি।

কেন, উদ্যোগ না থাকার কারণ কি?

কারণ কিছুই নেই—তবে–

বিমলা মৃদুস্বরে বলিল, উদ্যোগ খুব আছে, কিন্তু মাঝে মাঝে নিরুৎসাহ হয়ে পড়েন। বলেন, দেশের বড় বড় লোক যা পারলে না, আমার দ্বারা কি তা হবে?

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কিশোরের পানে চাহিয়া দীনবন্ধু বলিলেন, তাহলে বিশেষ একটা কিছু চেষ্টা করছ?

কুণ্ঠিত হইয়া কিশোর বলিল, ঠিক যে চেষ্টা করছি, তা বলতে পারি না, তবে মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয়, একটা কিছু করি। প্রকাণ্ড কিছু নয়, সে আমার শক্তির বাইরে—ছোটখাটোর মধ্যে এমন কিছু যা দেশের লোকের কাজে আসতে পারে।

দীনবন্ধু বলিলেন, এ তো ভাল কথা। বড় কাজ করবার লোক দেশে ঢের আছে, ছোট কাজের বেলাতেই লোকের অভাব হয়। কি চেষ্টা করছ শুনি?

একটা ফুড বার করবার চেষ্টা করছি, যা বিদেশী মেলিন্স ফুড, হরলিকস, ওভালটিন ইত্যাদির বদলে দেশের রোগী ও শিশুরা নির্ভয়ে ব্যবহার করতে পারে। একটু হাসিয়া বলিল, পারব কিনা জানি না, কিন্তু প্রশংসা যদি কারু প্রাপ্য হয় তো সে বৌদির। আগে আমার কোন সঙ্কল্পই ছিল না, খেয়ালমত এগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতুম। উনিই

দিনরাত আমার পেছনে লেগে থেকে এবং স্বহস্তে সাহায্য করে আমাকে এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত করেছেন।

উনি তোমাকে সাহায্যও করেন? বিস্মিত দীনবন্ধুবাবু জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া করিয়া বিমলার বিজ্ঞান-প্রীতির বিষয় শুনিয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন, বলিলেন, কিশোর যদি নূতন ফুড বার করতে পারে তো সে তোমারই গুণে পারবে। ওদিকে তোমার যে কৃতিত্ব কতদূর, সে তত আমি আজ টের পেয়েছি।

বিমল লজ্জিতমুখে বসিয়া থাকিয়া অল্পকাল পরে বালিশ বিছানা রৌদ্রে দিবার জন্য উঠিয়া গেল। তখন কিশোর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বিমলার ইতিবৃত্ত দীনবন্ধুবাবুকে খুলিয়া বলিল। অনুপমের মুখে সেদিন যে দু-চার কথা শুনিয়াছিলেন, তাহা দীনবন্ধুবাবুর মনে কুহেলিকারই সৃষ্টি করিয়াছিল, আজ সব কথা শুনিয়া তাহা পরিষ্কার হইয়া গেল।

যৌবনে যখন অনেকে আদর্শের পশ্চাতে ঘুরিয়া বেড়ায়, সেই সময় একদিন বোধ করি দীনবন্ধুবাবু এমনই একটি আদর্শের কল্পনোক সৃষ্টি করিয়া তাহাতে বাস করিয়াছিলেন, অনাত্মীয় দুটি নরনারীর নিষ্পাপ অথচ স্নেহঘনিষ্ঠ জীবনযাত্রার চিত্র কল্পনা করিয়া আনন্দ পাইয়াছিলেন। নিজের জীবনে তাঁহার সে কল্পনা বাস্তবে পরিণত হইতে পারে নাই। কিন্তু আজ কিশোরের জীবনে সেই আদর্শ সফল হইয়া উঠিয়াছে দেখিয়া তাঁহার অন্তর গভীর প্রীতিতে ভরিয়া উঠিল। দীর্ঘকাল নীরব থাকিয়া তিনি বলিলেন, আমার যৌবনে যদি এ সুযোগ ঘটত, আমিও এমনি আগ্রহে তাকে গ্রহণ করতুম। কিন্তু কিশোর, একটা কথা

ভুলো না, সাধারণে একে সহজভাবে নিতে পারবে না, অনেক যাচাই—অনেক পরীক্ষা করে তবে গ্রহণ করবে। হয়তো শেষ পর্যন্ত না-ও করতে পারে, সেজন্য প্রস্তুত থেকো।

কিশোর চুপ করিয়া রহিল, পরীক্ষা যে অত্যন্ত কঠিনভাবেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, তাহা আর বলিল না।

বেলা পড়িয়া আসিতেছিল, দীনবন্ধুবাবু উঠিয়া বলিলেন, চল, বিনয়বাবুর শরীর খারাপ, তার কাছে গিয়ে খানিক বসা যাক।

কিশোর এ কয়দিন প্রত্যহ দুইবেলা বিনয়বাবুর খোঁজ-খবর লইয়াছে; এই সূত্রে সুহাসিনীর সঙ্গেও দেখা হইয়াছে। বিনয়বাবুর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরে সুহাসিনী বিমর্ষ হেঁটমুখে দু-একটি কথা বলিয়াছে মাত্র। বিনয়বাবু অনেকটা ভাল আছেন, তাহা কিশোর সকালে ওবাড়ির চাকরবাকরের কাছে জানিয়া লইয়াছিল, তাই তাহার আশা সুহাসের দুভাবনামুক্ত সহাস্য মুখখানি দেখিতে পাইবে। দীনবন্ধুবাবুর কথায় সে দ্বিরুক্তি না করিয়া উঠিয়া পড়িল এবং তাঁহার সঙ্গে বিনয়বাবুর বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইল।

বাহিরের মুক্ত বাতাস হইতে অন্ধকূপের বদ্ধবায়ুর মধ্যে প্রবেশ করিলে যেমন দম বন্ধ হইবার উপক্রম হয়, এই ঘরে পদার্পণ করিবামাত্র ইহাদেরও ঠিক সেইরূপ মনে হইল। ঘরের বাতাস যেন। কি এক অচিন্তনীয় বিপৎপাতে স্তম্ভিত ভারি হইয়া আছে। কেহ কথা কহিল না, সম্ভাষণ করিল না, চোখ তুলিয়া চাহিল না, নতমুখে চিত্রার্পিতের মত বসিয়া

রহিল। যেন কোন বিষাক্ত ধূম ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একসঙ্গে সকলকে হতচেতন করিয়া দিয়াছে।

দীনবন্ধু উদ্বিগ্নভাবে একবারে সকলের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, কি হয়েছে? সকলে অমন করে বসে যে?

তাঁর কথায় সকলের যেন ঘুমের ঘোর কাটিয়া গেল। অনুপম প্রথম কথা কহিল, কটমট করিয়া কিছুকাল কিশোরের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল, দীনবন্ধুবাবু, যা হয়েছে তা এখনই শুনতে পাবেন, কিন্তু তার আগে আপনার সঙ্গীকে এখান থেকে যেতে বলুন। ও রকম লোক আমরা এখানে চাই না।

ঘোর বিস্ময়ে দীনবন্ধু বলিলেন, তার মানে?

বিনয়বাবু এতক্ষণ কেদারায় এলাইয়া পড়িয়াছিলেন, ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন। দুর্বল শরীরের উপর অকস্মাৎ এই দারুণ আঘাত তাঁহার চিন্তাশক্তিকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিয়াছিল। তিনি ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া অস্বাভাবিক উঁচু গলায় ঝোঁক দিয়া দিয়া বলিতে লাগিলেন, না না দীনবন্ধু, তুমি ওকে যেতে বলো। দুনিয়ায় যে ভালমানুষ, সবাই তার ওপর জুলুম করে। কাউকে বিশ্বাস নেই! আমাকে দুর্বল পেয়ে,—আমার মেয়েকে–উঃ নির্লজ্জ! না না, সন্দেহ করবার আর স্থান নেই বাপের চিঠি। আমি আর ওর মুখ দেখতে চাই না। আর যদি কখনও আমার বাড়িতে মাথা গলায় উত্তেজনার প্রবল ঝোঁকে দাঁড়াইয়া উঠিতেই মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইতেছিলেন, একলাফে কিশোরই গিয়া তাঁহাকে

ধরিয়া ফেলিল। সাবধানে তাঁহাকে আবার চেয়ারে বসাইয়া দিয়া, অনুপমের দিকে ফিরিয়া বলিল, অনুপমবাবু, আমার বিরুদ্ধে আপনার কী অভিযোগ, এইবার খুলে বলুন দেখি।

অনুপম রূঢ়ভাবে বলিল, অভিযোগ আমার নয়—তোমার বাবার; কিন্তু তোমার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করবার প্রবৃত্তি আমার নেই–তুমি যেতে পার। বলিয়া অঙ্গুলিনির্দেশে দরজা দেখাইয়া দিল।

কিশোরের চোখে-মুখে আগুন জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু সে কঠিন বলে নিজেকে সংবরণ করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, অনুপমবাবু, তোমার অনেক অত্যাচার আমি সহ্য করেছি, কিন্তু যতই সহ্য করছি, অত্যাচার ততই বেড়ে চলেছে। কলেজের প্রিন্সিপ্যালকে তুমি আমার নামে বেনামী চিঠি দিয়েছিলে, আজ আমার আত্মীয়তুল্য বন্ধুদের আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলেছ। এই সব মিথ্যা কলঙ্ক রটানোর শাস্তি এখনই আমি তোমাকে দিতুম—যদি না এ ঘরে দুটি মহিলা এবং একটি পীড়িত লোক থাকতেন। কিন্তু আমি খোলসা করে জানতে চাই, কী তোমার অভিযোগ এবং কিসের জোরে তুমি আমার মিথ্যা কুৎসা প্রচার করে বেড়াচ্ছ? এর নিষ্পত্তি আজই আমি করব।

পরিপূর্ণ অবজ্ঞায় মুখ ফিরাইয়া অনুপম দীনবন্ধুকে বলিল, কৈফিয়ত আমি দিই না! তবে আপনি যদি জানতে চান, তাহলে দেখাতে পারি, কিসের জোরে আমি এই সত্য কথা প্রচার করছি। বলিয়া চিঠিখানি দুই আঙুলে তুলিয়া ধরিল।

দীনবন্ধুবাবু বলিলেন, বটে? কি ওটা দেখি।

চিঠিখানি দুই-তিনবার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দীনবন্ধুবাবু মুখ তুলিলেন, কঠোরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি এ চিঠি পেলে কোথায়?

চিঠি পাওয়ার ইতিহাস বলিতে গেলে অনেক কথাই বলিতে হয়। বিনয়বাবু যে একজন কন্যাদায়গ্রস্ত ধূর্ত শিকারী ও তাঁহার কন্যা অন্যের প্রেমাকাঙিক্ষণী উন্নতিশীলা কুমারী, ট্রেনভাড়া দিয়া অযাচিতভাবে এই সংবাদ পশুপতিবাবুকে জানাইতে যাইবার নিঃস্বার্থ পরোপকার-স্পৃহা এবং তৎপরে পশুপতিবাবুর ভাবগতিক দেখিয়া সর্বসাধারণের কল্যাণের জন্য তাঁহার নিকট হইতে এই চিঠি আদায়ের ইতিবৃত্ত খুলিয়া বলিবার এ স্থান নহে। তাই উদ্ধতভাবে অনুপম বলিল, যেখানে পাই, সে খবরে আপনার দরকার নেই।

দরকার আছে। এ চিঠি যে তুমি জাল করে আননি, তা আমরা কী করে জানব?

অনুপম থতমত খাইয়া গেল, জাল করে এনেছি? আমি? আমার স্বার্থ কি?

ক্রুদ্ধস্বরে দীনবন্ধু বলিলেন, তোমার কি স্বার্থ, তা আমরা সবাই জানি। তুমি কি চরিত্রের লোক, তাও আমার অজ্ঞাত নেই। আমি বলছি, এ চিঠি জাল, তুমি তৈয়ারি করেছ। নইলে কিশোরের বাবা তোমাকে চিঠি লিখবেন কোন্ পরিচয়ে জিজ্ঞাসা করি? তাঁর সঙ্গে তোমার আলাপ আছে?

দীনবন্ধুবাবুর সুতীব্র প্রশ্নে অনুপম হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল, লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, কি, জাল করেছি আপনি বলেন? আপনার এতদুর স্পর্ধা?—আচ্ছা বেশ,—ও নিজে বলুক, ওর বাপের লেখা নয়, দেখি ওর কত বড় সাহস। তারপর আমি দেখে নেব।

কিশোর গর্জন করিয়া উঠিল, চুলোয় যাক চিঠি, আমি দেখতে চাই না। তারপর সুহাসিনীর মুখে গিয়া দাঁড়াইয়া গলা নামাইয়া বলিল, আমি শুধু জানতে চাই, তুমি আমায় বিশ্বাস কর কি না। আর যে যা বলুক, ভাবুক, আসে যায় না।

দুই করতলে মুখ ঢাকিয়া সুহাস বসিয়া রহিল, সাড়া দিল না। তাহার মনে হইতে লাগিল, এইবার তাহার দম বন্ধ হইয়া যাইবে, আর বুঝি সে নিশ্বাস লইতে পারিবে না।

কিশোর বলিল, সুহাস, যেখানে বিশ্বাস নেই, সেখানে কোন সম্বন্ধই টিকতে পারে না। যদি আমার চরিত্রে তোমার বিশ্বাস না থাকে, বলে দাও, আর আমি কখনো তোমার ছায়া মাড়াব না।

প্রাণপণ চেষ্টায় সুহাসিনী মুখ তুলিল। হয়তো সকল যুক্তিতর্ক লঙ্ঘন করিয়া কোন আশ্বাসের কথা বলিতে চাহিল। কিন্তু তাহার নীরস কণ্ঠ হইতে এই সন্দেহসঙ্কুল উক্তি বাহির হইয়া আসিল, ও চিঠি কি আপনার বাবার লেখা?

ক্ষণকাল নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কিশোর দীনবন্ধুবাবুর কাছে ফিরিয়া গেল। চিঠিখানা লইয়া তাহার উপর একবার চোখ বুলাইয়া মুখ তুলিতেই দেখিল, সুহাসিনী

একদৃষ্টে তাহার পানে চাহিয়া আছে—সমস্ত প্রাণ যেন তাহার চোখের উপর আসিয়া উদগ্রীব আশায় কাঁপিতেছে। কিশোরের বুকের ভিতরটা একবার মুচড়াইয়া উঠিল। কিন্তু সে চিঠিখানা ফিরাইয়া দিয়া আস্তে আস্তে বলিল, হ্যাঁ, চিঠি আমার বাবার লেখাই বটে।

দীর্ঘ কম্পিত নিশ্বাস টানিয়া সুহাসিনী আবার দুহাতে মুখ ঢাকিল।

অনুপম মুখখানা অত্যন্ত বিকৃত করিয়া দীনবন্ধুকে বলিল, হল তো? জাল করেছি। এবার কি বলবেন শুনি? বোধহয় বলবেন, বাপ মিথ্যেবাদী আর ছেলেটি একটি যুধিষ্ঠির।

কথাগুলি কিশোরের কানেও গেল না। সে সুহাসিনীর আনত মস্তকের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া ধীরে ধীরে বলিল, তোমার যখন আমার উপর বিশ্বাস নেই, তখন আমারো তোমার ওপর কোন দাবি রহিল না। বাবার চিঠি আমি মিথ্যে বলতে পারব না, সুতরাং যত লাঞ্ছনাই তোমরা আমাকে দাও সবই আমার প্রাপ্য। অস্বীকার করবার আমার আর পথ নেই। একটু চুপ করিয়া পুনরায় কহিল, মানুষকে চিনতে সময় লাগে; হয়তো কোন দিন মনে হতে পারে আমাকে ভুল বুঝেছ। কিন্তু সেটা অনিশ্চিত, উপস্থিতটাই সত্য। যাক, চললুম। আমার দুর্ভাগ্য, গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত কেবল অনর্থেরই সৃষ্টি করে গেলুম। বলিয়া হেঁটমুখে অন্ধকারপ্রায় ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সে চলিয়া গেলে ঘর কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। তারপর সুহাসিনী হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া যে দ্বার দিয়া কিশোর চলিয়া গেল, সেই দিকে ডান হাতখানা বাড়াইয়া যেন

চিৎকার করিয়া কি বলিতে গেল, কিন্তু তাহার অবরুদ্ধ কণ্ঠে একটা কথাও ফুটিল না। অধ্যক্ত একটা কাতরোক্তি করিয়া সে সংজ্ঞা হারাইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

করবী ছুটির আসিয়া যখন তাহার লুণ্ঠিত মাথাটা কোলে তুলিয়া লইয়া বসিল, তখন তাহারও দুই চক্ষু বাহিয়া প্রবল অশুর ধারা নামিয়াছে।

17

বড়দিনের ছুটির আর বিলম্ব নাই। স্কুল কলেজের ছাত্রদের মধ্যে এবং দোকানদার মহলে বেশ একটু চাঞ্চল্যের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

শীত-প্রভাতের কাঁচা সোনালী রৌদ্র কলের চিমনির ধুমকুণ্ডলী কাটাইয়া কলিকাতা শহরকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছে। পথের ধারের নির্জীব গাছগুলার পাতায় একটা শিশির-সজল চাকচিক্য দেখা যাইতেছে। বাতাসে বেশ একটু কামড় আছে। বেলা যত বাড়িতেছে, রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়ার দ্রুত যাতায়াত ও পথিকের সংখ্যা ততই বাড়িয়া চলিয়াছে। নানারঙের শাল র্যাপার ও মাঝে মাঝে। দু-একখানা বেগুনি রঙের বালাপোশ পথচারীদের অঙ্গে থাকিয়া রবিকরোজ্জ্বল দৃশ্যটাকে বেশ বর্ণবহুল করিয়া তুলিয়াছে।

ছাদের অনুচ্চ আলিসার ধারে দাঁড়াইয়া চুল শুকাইতে শুকাইতে বিমলা বাহিরের দিকে তাকাইয়া ছিল। কিশোর ভোরবেলাই বাহির হইয়া গিয়াছে, তখনও ফিরে নাই। আজ সে কলেজে যাইবে না, তাই রান্নারও বিশেষ তাড়া নাই।

পাশের বাড়িখানার দিকে দৃষ্টি পড়িতে বিমলা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। প্রায় চার মাস হইল বিনয়বাবুরা বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। কোথায় গিয়াছেন, তাহা বোধ করি দীনবন্ধুবাবুকে জিজ্ঞাসা করিলে জানা যাইতে পারি কিন্তু বিমলা কি কিশোর কেহই জিজ্ঞাসা করে নাই। তবে একেবারে বাস তুলিয়া দিয়া যে যান নাই, তাহা প্রশ্ন না

করিয়াও জানা যায়। বেশীর ভাগ আসবাবপত্রই বাড়িতে পড়িয়া আছে। শুধু কয়েকটা বিছানা ও বাক্স লইয়া বাড়িতে তালা লাগাইয়া। তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন।

এই শূন্য বাড়িটার সঙ্গে একটা মর্মান্তিক বেদনার স্মৃতি বিমলার মনে জড়াইয়া গিয়াছিল। কিশোরের মনের ভাব কী তাহা বিমলা জানিত না, কিন্তু তাহা অনুমান করিয়া লওয়া কঠিন নহে। কিশোরের অন্তররাজ্যে যখন এই বিষম ওলট-পালট ঘটিয়া গেল, তখনও সে বাহিরে কিছুই প্রকাশ করিতে পারে নাই, কেবল বিমলার পুনঃপুনঃ প্রশ্নের উত্তরে ম্লান হাসিয়া বলিয়াছিল, থাক বৌদি, ও কথায় আর কাজ নেই। ওদের সঙ্গে আমাদের সব সম্বন্ধ চুকে গেছে। তাহার এই ব্যথিত নীরবতার হেতু বিমলা বুঝিয়াছিল এবং কেন যে উহাদের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ নিঃশেষে চুকিয়া গেল, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতেও বিলম্ব হয় নাই।

তাই, যে সমস্যাটাকে একদিন বিমলা হঠকারিতার দ্বারাই নিষ্পন্ন করিয়া দিয়াছিল, তাহা আবার দ্বিগুণ জটিল হইয়া দেখা দিল। তাহাকে লইয়া বাপের সহিত কিশোরের বিচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে, ইহা না হয় সে সত্যের মুখ চাহিয়া, ন্যায়ের দিক দিয়া সহ্য করিয়াছে। কিন্তু এমনই করিয়া বন্ধু বান্ধব আত্মীয়-স্বজন সকলের সঙ্গেই যদি কিশোরের ছাড়াছাড়ি হইতে থাকে, তবে শেষ পর্যন্ত সে দাঁড়াইবে কাহাকে ভর করিয়া? কিশোরের সমস্ত ভবিষ্যৎ আশা-আকাঙক্ষা যদি বিমলার সংসর্গ-দোষেই। এমনভাবে ব্যর্থ হইয়া যায়, তবে শুধু ন্যায়-ধর্মে দোহাই দিয়া বিমলা কোন মুখে কিশোরের গলায় পাথর হইয়া ঝুলিয়া থাকিবে? সংসারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করিয়া তুলিয়া কিশোরের এমন মূল্যবান জীবন নষ্ট করিয়া দিবার অধিকার তাহার আছে কি?

সেদিন বিমলা কিশোরকে গিয়া বলিয়াছিল, ঠাকুরপো, আমাকে কাশী পাঠিয়ে দাও, এখানে আমার মন টিকছে না। মাসে মাসে কিছু টাকা পাঠিয়ে দিও, তাহলেই আমার চলে যাবে। কিশোর জবাব দিয়াছিল, তা হয় না, বৌদি। তোমার মনের কথা আমি বুঝেছি, কিন্তু আজ যদি তুমি আমায় ছেড়ে চলে যাও, তাহলে মিথ্যাকে স্বীকার করে নেওয়া হবে।কাশীতে থাকতে চাও, বেশ চল, আমিও তোমার সঙ্গে থাকব।

কথাটা এইখানেই শেষ হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু তাই বলিয়া দুঃখের মাত্রা এক বিন্দুও লাঘব হয় নাই।

বিমলার যখনই ঐ জানালা-দরজা বন্ধ বাড়িটার প্রতি নজর পড়িত, তখনই অপরিসীম ব্যথার সহিত মনে হইত, কেন মানুষ মানুষকে এত ভুল বোঝে? এত বন্ধুত্ব, এত প্রণয় তাহার মধ্যেও কি সত্যকার পরিচয় হয় না? মানুষের মুখের দিকে চাহিয়া তাহার প্রকৃত স্বরূপ চিনিয়া লওয়া কি অসম্ভব? সুহাসকে সে তো চিনিয়াছিল, তবে সুহাস তাহাকে চিনিল না কেন? আর সকলের উপর সুহাস যাহাকে এত ভালবাসিয়াছিল, তাহাকে এমন করিয়া অবিশ্বাস করিল কি করিয়া?

কিশোরের নিগ্রহের পালা যে শেষ হয় নাই, তাহার ইঙ্গিতও বিমলা মাঝে মাঝে পাইত। কলেজ হইতে ফিরিবার পর এক-একদিন তাহার ক্লিষ্ট নির্যাতন-চিহ্নিত মুখের প্রতি চাহিয়া বিমলা নিরুদ্ধ যন্ত্রণায় ছটফট করিতে থাকিত। কিন্তু আঘাতের স্পষ্ট চিহ্ন মুখের উপর জাজ্বল্যমান দেখিয়াও, কে আঘাত করিল, কেন আঘাত করিল, জিজ্ঞাসা করিতে

পারিত না। দুইজনের মাঝখানে অব্যক্ত ব্যথার ভার পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিত। যে বেদনার ভাগ লইবার কেহ নাই, সহানুভূতির দ্বারা সরল করিবারও উপায় নাই, তেমন দুর্বহ ব্যথা পৃথিবীতে বুঝি অল্পই আছে।

কিশোরের বাহ্য ব্যবহারে কোন পরিবর্তন লক্ষিত হইল না বটে, কিন্তু তাহার স্বচ্ছ আনন্দময় দর্পণের মত উজ্জ্বল প্রাণের উপর যেন একপুরু ধূলার পর্দা পড়িয়া গিয়াছিল, পূর্বের হাসি আমোদ কিছুই ছিল না। জোর করিয়া সমস্ত মন প্রাণ সে ল্যাবরেটরির কাজে ঢালিয়া দিয়াছিল। যতক্ষণ বাড়িতে থাকিত ল্যাবরেটরিতেই থাকিত, বিমলাও নির্বাক ছায়ার মত তাহার সঙ্গে সঙ্গে কাজ করিয়া যাইত। পূর্বের মত এই সংযুক্ত কর্মের সময়টি রহস্যালাপের দ্বারা সরস হইয়া উঠিত না। নেহাত যখন অসহ্য হইয়া পড়িত, তখন কিশোর বলিত, আর পারি না। চল বৌদি, ও ঘরে বসে নিশ্চিন্দি হয়ে দুটো গল্প করিগে।

পাশের ঘরে গিয়া উদ্যোগ-আয়োজন করিয়া প্রথমটা গল্প বেশ সতেজেই আরম্ভ হইত, কিন্তু ক্রমে ভগ্নোদ্যম হইয়া অবশেষে অর্ধপথে নীরব হইয়া যাইত। জোর করিয়া বাজে কথার জের টানিয়া চলা আর কিছুতেই সম্ভব হইত না।

এমনই করিয়া প্রায় নিঃসঙ্গভাবে এই দুইটি নরনারীর জীবন বহিয়া চলিয়াছিল। পরিচিতদের মধ্যে কেবল দীনবন্ধুবাবু আসিয়া মাঝে মাঝে খোঁজ-খবর লইয়া পূর্বসম্বন্ধ বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু এই দুটি আত্ম-সমাহিত ব্যক্তির গম্ভীর স্বাতন্ত্র ভেদ

করিতে পারিতেন না। ইহাদের দুর্জয় অভিমান যেন দুর্গদ্বার রোধ করিয়া তাঁহাকেও বাহিরে ফেলিয়া রাখিত।

সাড়ে নটার সময় বহিদ্বারে কিশোরের গলা শুনিয়া বিমলা শুষ্কপ্রায় এলো চুল জড়াইতে জড়াইতে তাড়াতাড়ি ছাদ হইতে নামিয়া আসিল।

কিশোর গায়ের শালখানা নামাইয়া রাখিয়া পকেট হইতে পুরু লম্বা গোছের একটা বন্ধ লেফাফা বাহির করিয়া বিমলার হাতে দিয়া বলিল, সব হয়ে গেল। নাও, এটাকে যত্ন করে রেখে দাও।

লেফাফা হাতে লইয়া বিমলা দেখিল, তাহার উপর বড় বড় অক্ষরে তাহার নাম লেখা রহিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল, কী এ?

ওতে তোমার পেটেন্টের কাগজপত্র আর বিক্রি কন্ট্রাক্টের দলিল আছে। উকিলবাড়ি থেকে এলুম। টাকাগুলো ব্যাঙ্কে জমা করে দিতে বলে এসেছি। অত টাকা ঘরে ফেলে রেখে কোন লাভ নেই, ব্যাঙ্কে থাকলে মোটা রকম সুদ পাবে।

বিমলা উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কত টাকায় বিক্রি হলে? কারা কিনলে?

চৌদ্দ হাজার টাকা নগদ আর শতকরা পঁচিশ টাকা রয়ালটি। সত্যি কথা বলতে কি, বৌদি, এত দাম যে পাওয়া যাবে, তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। বেঙ্গল কেমিক্যালকে দিলুম,

ওদের কাছ থেকেই। সবচেয়ে বেশী দর পাওয়া গেল। হাসিমুখে বলিল, আর আমার টাকার দুঃখ রইল না বৌদি, এবার। এই হতভাগা চাকরি ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে বসে বসে তোমার অন্ন ধ্বংস করব।

বিমলা নির্বাক হইয়া চাহিয়া রহিল। শেষে বলিল, টাকার দুঃখ তোমার রইল না, সে যেন বুঝলুম, কিন্তু আমার অন্ন ধ্বংস করবে তার মানে কি?

কিশোর হাসিতে হাসিতে বলিল, পেটেন্ট তোমার নামে নিয়েছি কিনা, আর টাকাটাও ব্যাঙ্কে তোমার নামেই জমা হবে।

কেন?

কেন, তোমার জিনিস—তোমার টাকা, তোমার নামে থাকবে না তো কার নামে থাকবে?

ভীতভাবে বিমলা বলিল, এ কী করলে, ঠাকুরপো! এ কেন করতে গেলে?

কেন, অন্যায়টা কী করেছি?

অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া বিমলা বলিল, তোমার টাকা আমার নামে থাকলে কোন ক্ষতি নেই,—সে থাক। কিন্তু ঠাকুরপো, যে জিনিস এত পরিশ্রম করে আবিষ্কার করলে, তার সঙ্গে নিজের নামটা সংযুক্ত করে রাখতেও কি তোমার ইচ্ছে হল না?

আবিষ্কার যদি আমি করতুম, তাহলে আলবত সে ইচ্ছে হত। কিন্তু আবিষ্কার তত আমি করিনি বৌদি, তুমি করেছ। আমি তো শুধু কলের মত কাজ করে গেছি, নিজের বৈজ্ঞানিক শিক্ষাকে বুদ্ধির যন্ত্রে ফেলে মজুরের মত চাকা ঘুরিয়েছি। আসল যা প্রাণ–প্রেরণা, অধ্যবসায়—সবই তো তোমার। পাছে কেউ ভুল করে, কিংবা আমিই কোনদিন বুদ্ধির দোষে ওটাকে নিজের আবিষ্কার বলে মনে করে বসি, তাই ওর নাম কি দিয়েছি জানো, বৌদি?

বিমলা ক্ষীণস্বরে বলিল, কি?

বিমলা-সুধা। ঠিক হয়নি? তুমি মাথা নাড়বে জানি, কিন্তু এ আমি জোর করে বলতে পারি বৌদি, ওর যদি সত্যিকার কোন গুণ না-ও থাকে, তবুও শুধু তোমার নামের পুণ্যে বাংলাদেশের রুগ্ন শিশুদের কাছে অমৃততুল্য হয়ে উঠবে।

ক্ষুব্ধস্বরে বিমলা বলিয়া উঠিল, না না ঠাকুরপো, এ তুমি ভাল করনি। টাকা তুমি যাকে ইচ্ছে দিতে পার কিন্তু ভালবাসার খাতিরেও নিজের ন্যায্য খ্যাতি বিলিয়ে দেবার অধিকার তোমার নেই। না, আমাকেও না। এ তুমি ভারি অন্যায় করেছ ভাই।

কিশোর মৃদুস্বরে বলিল, আমি খ্যাতির কাঙাল নই, বৌদি!

ব্যাকুল হইয়া বিমলা বলিল, কিন্তু আমি যে তোমার খ্যাতির কাঙাল। আমি যে চাই সকলে জানুক দেখুক যে, তুমি ছোট নও, সামান্য নওযারা দূরে সরে গিয়ে তোমার বিচার করতে চায়, তাদের চেয়ে তুমি অনেক উঁচু। তুমি যে আমার কত বড় গর্ব, কত বড় অহঙ্কার, তা আমি তাদের কি করে দেখাব, ঠাকুরপো? আমার সেই অহঙ্কারে তুমি বাদ সাধলে? বলিতে বলিতে তাহার স্বর কান্নার। ভারে ভাঙিয়া পড়িল।

কিশোরও মনে মনে বিচলিত হইল, কিন্তু মুখে হাসিয়া বলিল, আচ্ছা মেনে নিচ্ছি বৌদি, অপরাধ পরাধ হয়েছে, বারদিগর আর এমন হবে না। তোমার অহঙ্কারের কথাটা ভেবে দেখিনি। এবার থেকে নিজের নামই জাহির করব।

চোখ মুছিয়া বিমলা বলিল, পরের কথা পরে হবে। এখন একে শোধরাবার কোন উপায় নেই?

কিশোর মাথা নাড়িল, না, যা হবার হয়ে গেছে। কিন্তু ও কথা এখন থাক।

থাক কেন?

আর একটা ভারি দরকারী কথা কদিন থেকে তোমায় বলব মনে করছি, কিন্তু হয়ে ওঠেনি। সামনেই ছুটি, চল কিছুদিন কোথাও ঘুরে আসা যাক। কলকাতা আর ভাল লাগছে না।

কোথাও যাবে?

কোথাও তো বেশী দিন থাকা চলবে না, মাত্র দশ বারো দিনের ছুটি।–শুধু ঘুরে বেড়ানো, তা কাশী থেকে আগ্রা হয়ে বৃন্দাবন বেড়িয়ে ফিরে আসা যাক—কি বল? তোমার তীর্থদর্শন আর আমার তাজ-দর্শন দুই হবে।

একটু ভাবিয়া বলিল, বেশ, চল।

কিশোর খুশি হইয়া বলিল, তাহলে হাজারখানেক টাকা ও-থেকে রাখি, কেমন? ব্যাঙ্কে জমা দেবার পর আবার বার করা মুশকিল হবে। তোমার হাতে বোধ হয় কিছুই নেই?

বিমলা বলিল, সামান্যই আছে, তাতে চলবে না। কিন্তু হাজার টাকার দরকার নেই, পাঁচশ হলেই যথেষ্ট হবে।

কিশোর হাসিয়া বলিল, বেশ, তোমার টাকা, তুমি যদি পাঁচশর বেশী খরচ করতে না চাও, তাহলে তাই সই।

বিমলাও হাসিল, বলিল, তা তো বটেই। নিজের টাকা বলেই তো আমার অত দরদ, নইলে তোমার টাকায় কি আমার মায়া আছে?

চাবি দিয়া আলমারি খুলিয়া দলিলের লেফাফাখানা সযত্নে রাখিয়া দিয়া বিমলা বলিল, আর আমি দাঁড়াব না, এখনও রান্না চড়াইনি। তোমাকে তো আবার খেয়ে বেরুতে হবে?

হ্যাঁ।

18

পাঞ্জাব মেল হাওড়া ছাড়িবার কয়েক মিনিট পূর্বে কিশোর বিমলাকে লইয়া স্টেশনে উপস্থিত হইয়া দেখিল প্ল্যাটফর্মের উপর বিরাট জনতা,দেশী ও বিলাতী বহুবিধ ভদ্রশ্রেণীর যাত্রীর ভিড়ে কোথাও তিল ফেলিবার স্থান নাই। কিশোর আগে হইতে দুইখানি প্রথম শ্রেণীর বার্থ রিজার্ভ করিয়া রাখিয়াছিল, তাই গাড়িতে জায়গা পাওয়া সম্বন্ধে তাহার কোন দুভাবনা ছিল না। প্রত্যেক গাড়ির সম্মুখস্থ অলিকায় নিজের নাম খুঁজিতে খুঁজিতে শেষে নির্দিষ্ট গাড়ির সম্মুখে উপস্থিত হইল। বিমলাকে গাড়িতে তুলিয়া দিয়া নিজে উঠিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় গাড়ির ভিতর হইতে একজনের পরিচিত সকৌতুক কণ্ঠস্বরে সে চমকিয়া উঠিল, এ কি কিশোরবাবু, আপনি কোথায় চলেছেন?

কিশোর মুখ তুলিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল,সম্মুখের বেঞ্চির গদির উপর বসিয়া যে মেয়েটি হাসিমুখে তাহার পানে তাকাইয়া আছে সে যে করবী হইতে পারে, তাহা যেন কিশোর সহসা বিশ্বাস করিতেই পারিল না।

করবী হাসিয়া বলিল, স্তম্ভিত হয়ে গেলেন যে! চিনতে পারছেন তো?

কিশোর হাঁ-না কোন কথাই বলিতে পারিল না। যে দিন সন্ধ্যাবেলা বিনয়বাবুর বাড়িতে সেই কাণ্ডটা ঘটিয়া গেল, সেদিন করবী ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল; উপস্থিত না থাকিলেও সে ব্যাপার তাহার কর্ণগোচর হইতে বিলম্ব হইত না। কিশোর বুঝিয়াছিল, ইহার পর

করবীদের সহিত তাহার নব-পিত বন্ধুত্বের সূত্র একেবারে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে; তাহাদের সঙ্গে আবার দেখা হইবার সম্ভাবনাও সে কল্পনা করে নাই, এবং যদি দৈবাৎ দেখা হয় তাহা হইলে দুই পক্ষই যে দূর হইতে অপরিচিতের মত সরিয়া যাইবে, ইহাই সে স্বাভাবিক বলিয়া মনে করিয়া রাখিয়াছিল। অনুপম করবীর পিসতুত ভাই, তাহার উপস্থাপিত অভিযোগ যে করবী শেষ পর্যন্ত সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া কিশোরের সংসর্গ বর্জন করিবে, ইহাই তো সঙ্গত।

কিন্তু এ কি অচিন্তনীয় ব্যাপার! করবীর এই একান্ত বন্ধুভাবে সম্ভাষণের সহিত নিজের অন্তরঙ্গ বদ্ধমূল ধারণার আপোস করিতেই কিশোরের খানিকটা সময় কাটিয়া গেল। তারপর নিজের বিচ্ছিন্ন চেতনাকে সংহত করিয়া সে ভাবিয়া দেখিল, করবী ছেলেমানুষ, হয়তো সব দিক না ভাবিয়াই তাহার সম্বন্ধে এতটা সহৃদয়তা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে; তাহার অভিভাবকরা জানিতে পারিলে নিশ্চয় অসন্তুষ্ট হইবেন। এবং একথা ভাবাও তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব নহে যে, কিশোরই গায়ে পড়িয়া তাঁহাদের সহিত পুনশ্চ ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের চেষ্টা করিতেছে।

কিশোরের একবার ইচ্ছা হইল, এ গাড়ি ছাড়িয়া অন্য কোন খালি গাড়ি খুঁজিয়া লইয়া তাহাতে গিয়া উঠে; কিন্তু এখন সে পথও বন্ধ, কুলিরা ইতিমধ্যে মোটঘাট লইয়া এই গাড়িতে রাখিয়াছে, বৌদিদিও গাড়িতে উঠিয়া পড়িয়াছেন। এরূপ অবস্থায় আবার মোটঘাট তুলিয়া লইয়া অন্যত্র যাইবার চেষ্টাও যে অত্যন্ত বিশ্রী দেখাইবে, তাহা বুঝিয়া কিশোর সেই গাড়িতেই উঠিয়া পড়িল এবং সংযতভাবে করবীকে একটা নমস্কার করিয়া বলিল, আমরা কাশী যাচ্ছি।

করবী করতালি দিয়া সোল্লাসে বলিয়া উঠিল, আমরাও কাশী যাচ্ছি, বেশ হল, একসঙ্গে যাব। ইনি আপনার বৌদিদি তোক দেখেই চিনতে পেরেছি। আসুন বৌদি, এখানে এসে বসুন। আপনাদের সঙ্গে ট্রেনে এমনভাবে দেখা হবে তা ভাবিওনিভারি আশ্চর্য নয়? আচ্ছ, আপনারা কাশী যাচ্ছেন, আগে আমাদের খবর দেননি কেন? জানা থাকলে কত সুবিধা হত।

কিশোর নির্বাক হইয়া রহিল। শেষে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার সঙ্গে তো কাউকে দেখছি না, আপনি কি–?

করবী হাসিয়া বলিল, না, একলা যাচ্ছি না, বাবা সঙ্গে আছেন। মা আজ দুমাস হল কাশীতেই রয়েছেন কিনা—তাঁকেই আনতে যাচ্ছি। মার শরীর বড় খারাপ হয়ে পড়েছিল, তাই মামা এসে তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমার মামার বাড়ি কাশীতে, আপনি জানতেন না বুঝি?

কিশোর মাথা নাড়িয়া নিঃশব্দে বেঞ্চির এক কোণে গিয়া বসিল। কুলিগুলা মজুরির জন্য দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাদের ভাড়া চুকাইয়া দিতে দিতে ক্ষুব্ধমনে ভাবিতে লাগিল, এ কোন্ দৈবী দুষ্টবুদ্ধি সারা রাত্রির জন্য তাহাকে এই অনীতি সাহচর্যের মধ্যে ফেলিয়া দিল?

বিমলা এতক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিল, করবী উঠিয়া আসিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে নিজের কাছে লইয়া গিয়া বসাইল। বলিল, কিশোরবাবু তো পরিচয় করিয়ে দিলেন না, নিজেই নিজের পরিচয় দিই। আমি করবী–বোধ হয় ওঁর কাছে নাম শুনে থাকবেন।

বিমলা হাসিয়া বলিল, শুধু নাম নয়, অনেক প্রশংসা শুনেছি।

সুস্মিতমুখে কিশোরের দিকে একটা কটাক্ষপাত করিয়া করবী বলিল, সত্যি? এ তো আমার ভারি সৌভাগ্যের কথা। আমি জানতুম, উনি কেবল মুখের ওপর কমপ্লিমেন্ট দিতে পারেন। যাহোক, আড়ালেও আমার সুখ্যাতি করেছেন, এ আমার পক্ষে কম গৌরব নয়! বলিয়া হাসিতে লাগিল।

গাড়ি ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িতেই প্রমদাবাবু হন্তদন্ত হইয়া কোথা হইতে আসিয়া গাড়িতে চড়িয়া পড়িলেন এবং পরক্ষণেই নানাবিধ চিকার ও হুড়াহুড়ি সহযোগে গাড়ি ধীরে ধীরে আলোকদীপ্ত প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

অপরিচিত একটি স্ত্রীলোকের সহিত মুখোমুখি বসিয়া করবী কথা কহিতেছে দেখিয়া প্রমদাবাবু প্রথমটা বিস্মিত হইয়া তাকাইয়া রহিলেন, তারপর কিশোরের দিকে ফিরিয়া তাহাকে চিনিতে পারিয়া মহানন্দে বলিয়া উঠিলেন, আরে কিশোরবাবু যে। কিশোরের পাশে গিয়া বসিয়া বলিলেন, যাক, বাঁচা গেল। কে সি চক্রবর্তী আর মিসেস হালদারের নামে রিজার্ভ কার্ড দেখে ভয় হচ্ছিল, বুঝি একজোড়া বাঙালী মেমসাহেব বড়দিন করতে

চলেছে সারাটা পথ জ্বালাতে জ্বালাতে যাবে। তারপর, এখন যাওয়া হচ্ছে কদূর? মোগলসরাই পর্যন্ত রিজার্ভ করেছেন দেখছি কাশী চলেছেন নাকি?

কিশোর বলিল, হাঁ—আপাতত কাশী যাচ্ছি।

প্রমদাবাবু বলিলেন, তার মানে বেড়াতে চলেছেন। বেশ বেশ, বড়দিনের ছুটিতে একটা কিছু করা চাই তো।এই দেখুন না, আমি তেঁতো মানুষ, কলকাতা ছেড়ে এক পা যেতে মন সরে না, আমাকেও বেরিয়ে পড়তে হয়েছে। বুড়ো বয়সে শ্বশুরবাড়ি চলেছি।

করবী বলিল, বাবা, ইনি কিশোরবাবুর বৌদিদি। ইনি বলছেন, কিশোরবাবু এর কাছে আমার খুব প্রশংসা করেছেন। কিশোরবাবু ভারি ভাল লোক, নয়?

প্রমদাবাবু বলিলেন, তোমার প্রশংসা করলেই যদি ভাল লোক হওয়া যায়, তাহলে ভাল লোক হওয়া সহজ বলতে হবে। কিন্তু আমি এত সহজে কিশোরবাবুকে ভাল লোক বলতে রাজী নই। উনি আসব বলে কথা দিয়ে সেই একবার বই আমাদের বাড়িতে আর আসেননি। বিমলাকে নির্দেশ করিয়া বলিলেন, মা লক্ষ্মীকেও সঙ্গে আনবার কথা ছিল, তাও আনলেন না। আমি পুলিসের লোক, এই সব নানা রকম প্রমাণ থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারছি, উনি একজন নিতান্ত বদলোক। এমন কি ওঁকে বোমাবাজ বিপ্লবী বলেও সন্দেহ করা যেতে পারে।

প্রমদাবাবুর কথায় সকলে একসঙ্গে হাসিয়া উঠিল। কিশোরের বুক হইতে একটা ভারি বোঝ নামিয়া গিয়া মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। এমন প্রফুল্লতা সে বহুদিন অনুভব করে নাই। তাহার অকৃত অপ্রাধের জন্য সমস্ত পৃথিবী হইতে যেন সে একঘরে হইয়াছিল; সংসার তাহার প্রতি অন্যায় বিচার করিয়া তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছে; এই অভিমানে সে নিজেই পৃথক হইয়া দূরে সরিয়া গিয়াছিল। আজ প্রমদাবাবু হাত ধরিয়া যেন তাহাকে সেই পরিচিত সংসারের মধ্যে টানিয়া আনিলেন। তিনি যেন স্পষ্ট করিয়া বলিলেন, তোমার নামে কে কী কুৎসা রটনা করিয়াছে, তাহা আমরা জানিতে চাহি না। তোমার বিরুদ্ধে প্রমাণ যতই গুরু হোক, আমরা জানি তুমি নিদোষ, তোমার দ্বারা এত বড় অপরাধ কখনও সম্ভব হইতে পারে না। তোমাকে বিশ্বাস করি—ভালবাসি। তুমি আমাদের একজন।

কৃতজ্ঞতার এক অপূর্ব আবেগে কিশোরের কণ্ঠ পর্যন্ত বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিল, সে বলিল, আমায় মাপ করুন, আমার অন্যায় হয়ে গেছে। একটা কাজে এত ব্যস্ত ছিলাম যে, সময় করে উঠতে পারিনি। সত্যি কিনা বৌদিদিকে জিজ্ঞাসা করুন।

ইহার পর তাহাদের মধ্যে কথাবার্তায় আর কোন সঙ্কোচ রহিল না। ট্রেন রাত্রির বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিল; দীর্ঘ ব্যবধানে এক-একবার ক্ষণকালের জন্য গতি সংহত করে, আমার সগর্জনে ঊর্ধ্বশ্বাসে বাহির হইয়া পড়ে। স্থিতিকে স্থায়ী হইতে দিবে না, এই যেন তাহার পণ।

আর, সেই দীপালোকিত ক্ষুদ্র দারুকক্ষটির মধ্যে এই চারিটি প্রাণী যেন সংসার হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া কোন এক ইন্দ্রিয়াতীত মন্ত্রকুহকে পরস্পর অত্যন্ত কাছে আসিয়া পড়িলেন। মনের আড়াল যখন একবার ঘুচিয়া যায়, তখন বুঝি এমনই হয়। যে কথা অন্য সময় অতি অন্তরঙ্গের কাছেও প্রকাশ পাইত না, তাহা সহজে স্বচ্ছন্দে বাহির হইয়া আসিল। কৃত্রিম ব্যবধান যেখানে নাই, সেখানে কথারও অন্ত থাকে না। আনন্দের, দুঃখের, আকাঙ্ক্ষার কত কাহিনীই যে বিনিময় হইল তাহার ইয়ত্তা নাই।

শুধু একটা প্রসঙ্গ সকলেই সাবধানে এড়াইয়া গেলেন, সুহাসিনী সম্বন্ধে কোন কথা হইল না।

গল্প-গুজবে যখন অনেক রাত্রি হইয়া গেল, তখন প্রমদাবাবু এক রকম জোর করিয়াই উঠিয়া পড়িলেন এবং বিছানাপত্র পাতিয়া শয়নের যোগাড় করিতে লাগিলেন।

কিশোর তাড়াতাড়ি উঠিয়া প্রমদাবাবুর হোড়-অল খুলিয়া তোশক, বালিশ, লেপ ইত্যাদি বাহির করিয়া দিল। কিছুক্ষণ বাগবিতণ্ডার পর স্থির হইল, বিমলা করবী দুই পাশের বেঞ্চিতে শয়ন করিবে, প্রমদাবাবু ও কিশোর মেঝের স্বল্পপরিসর স্থানে বিছানা পাতিয়া শুইবেন। পথের জন্য বিমলা সামান্য একটা বিছানা জড়াইয়া লইয়াছিল, তাহাতে নিজের জন্য একটা মোটা ভুটিয়া কম্বল এবং কিশোরের জন্য লেপ বালিশ তোশক ছিল। কিশোর সেটা খুলিয়া বিছানা পাতিতে লাগিয়া গেল। প্রমদাবাবুকে বলিল, আপনি বসুন, আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।

প্রথমে দুই বেঞ্চির উপর দুটা হোশক পাট করিয়া পাতিয়া তাহার উপর বালাপোশ বিছাইয়া বালিশের জন্য প্রমদাবাবুর বিছানার স্তূপ খুঁজিতে খুঁজিতে দুটি ছোট ছোট অতি সুন্দর চিকনের কাজকরা বালিশ বাহির হইয়া পড়িল। কিশোর সহাস্যমুখে করবীকে জিজ্ঞাসা করিল, এ দুটি বুঝি আপনার?

করবী বিব্রত হইয়া বলিল, যাঁ। কিন্তু আপনি ছেড়ে দিন, আমরা বিছানা পেতে নিচ্ছি।

কিশোর বলিল, আমাকে কি এতই অপদার্থ মনে করেন, বিছানা পাতবারও ক্ষমতা নেই?

বিমলা মুখ টিপিয়া হাসিয়া করবীকে বলিল, ওঁকে কিছু বোলো না, ঝি-চাকরের কাজ করতে উনি বড্ড ভালবাসেন।

কৃত্রিম কোপে চোখ পাকাইয়া কিশোর বলিল, ঝি-চাকরের কাজ—আচ্ছা বেশ-শয্যা প্রস্তুত শেষ করিয়া বলিল, এবার শুয়ে দেখুন, ঝি-চাকরের চেয়ে ভাল হয়েছে কিনা।

প্রমদাবাবু শুইয়া পড়িলেন, আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, আঃ দিব্যি হয়েছে! এবার আলোর উপর পদার্টা টেনে দিয়ে যে যার ঘুমিয়ে পড়ো।

বিমলা নিজের নির্দিষ্ট বেঞ্চিতে আসিয়া বসিয়া মদৃস্বরে বলিল, ঠাকুরপো, কম্বলটা আমায় দাও, নইলে সারারাত গা কুটকুট করবে, ঘুমোত পারবে না।

কিশোর মাথা নাড়িয়া বলিল, নাঃ, এতে আমার কোন কষ্ট হবে না।

বিমলা বলিল, আমি বলছি লক্ষ্মীটি, তুমি লেপ নাও। কম্বল আমার অভ্যেস আছে, তুমি লেপ না হলে ঘুমুতে পার না।

কিশোর বলিল, কম্বলটি নিজের জন্যে নেওয়া হয়েছিল, আমি তা বুঝতে পারিনি। তা তোমার বুঝি গা কুটকুট করতে নেই?

বিমলা বিরক্ত হইয়া বলিল, তখনই আমার বোঝা উচিত ছিল যে, কম্বল নিজে নিয়ে লেপটি আমার ঘাড়ে চাপাবে। এমন একগুঁয়ে মানুষও যদি কোথাও দেখা যায়।

করবীও শুইয়া পড়িয়াছিল; লেপের ভিতর হইতে এতক্ষণ দুজনের তর্কাতর্কি শুনিতেছিল, এবার ঘাড় তুলিয়া বলিল, কিশোরবাবু, আপনার মাথায় বালিশ দেখছি না?

কিশোর বলিল, নিষ্প্রয়োজন। বালিশ না থাকলেও আমার নিদ্রার ব্যাঘাত হয় না। বাহুই আমার শ্রেষ্ঠ উপাধান।

বিমলা ক্ষুব্ধস্বরে বলিল, আর বড়াই করতে হবে না। এই দেখ না, নিজের বালিশটি আমাকে দান করা হয়েছে। আমার বালিশের দরকার হয় না, তাই ওঁর জন্যে একটা বালিশ নিয়েছিলুম।

কিশোর আলো দুটি ঢাকা দিয়া কম্বলের মধ্যে প্রবেশ করিতে করিতে বলিল, বৌদি, এত রাত্তিরে যদি তর্ক আরম্ভ কর তাহলে ঘুম চটে যাবে। আর নয়, এবার চটপট ঘুমিয়ে পড়া যাক।

আবরিত বাতির ক্ষীণ প্রভায় কক্ষটি চমৎকার ছায়াময় হইয়াছিল; তাহার ভিতর হইতে ঈষৎ লজ্জিতকণ্ঠে করবী বলিল, কিন্তু আমার তো দুটো বালিশ রয়েছে, আপনি একটা নিন না, কিশোরবাবু।

না, না, তার দরকার নেই।

করবী ঝুপ করিয়া একটা বালিশ কিশোরের মাথার কাছে ফেলিয়া দিয়া বলিল, এই নিন।

কিশোর নরম বালিশটা নাড়িয়া-চাড়িয়া সযত্নে মাথার তলায় দিয়া একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, অন্যায় করলেন। ভেবেছিলুম যখন তীর্থযাত্রা করেছি, তখন পথেই কৃসাধন শুধু করে দেবতা আর আপনারা হতে দিলেন না।

কিছুক্ষণ আর কেহ কোন কথা কহিল না। প্রমদাবাবুর নাসানিঃসৃত শব্দ ঘোষণা করিতে লাগিল যে, তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইয়াছে। গাড়ি অন্ধকারের বুক চিরিয়া উল্কার বেগে ছুটিয়াছে, বন্ধ কাচের শার্সির ভিতর দিয়া বাহিরের দৃশ্য কিছু দেখা যায় না। ভিতরে কক্ষটি স্বপ্নদৃষ্ট মায়া-লোকের মত অস্পষ্ট মোলায়েম হইয়া আছে।

অনেকক্ষণ পরে করবী মৃদুস্বরে বলিল, মনে হচ্ছে, আমরা যেন কোন নিরুদ্দেশের যাত্রী। এমনি ভাবে গাড়ি যদি চিরকাল চলতে থাকত, কি সুন্দর হত?

কেহ তাহার কথায় উত্তর দিল না, কিন্তু কিশোর ও বিমলার মনে সে কথার প্রতিধ্বনি জাগিয়া উঠিল! জীবনটা যদি এমনই নিশ্চিন্ত নিরবচ্ছিন্ন একটি যাত্রা হইত! এমনই নিরুদ্বেগ ছায়াময় রাজ্যের ভিতর দিয়া, সহযাত্রীদের সঙ্গে নিবিড় স্নেহবন্ধনে বদ্ধ হইয়া এই যাত্রাপথ যদি কখনও শেষ না হইত!

19

পরদিন সকালে চা জলযোগ ইত্যাদি সমাপ্ত হইবার পর সকলে অলসভাবে বসিয়া মোগলসরাই স্টেশনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। মোগলসরাই পৌঁছিতে আর বিলম্ব নাই। স্থির ছিল, প্রমদাবাবুরা কাশী পর্যন্ত ট্রেনে না গিয়া এইখানেই নামিয়া যাইবেন এবং মোটরে কাশী পৌঁছিবেন। আগে হইতে যানবাহনের বন্দোবস্তও করিয়া রাখা হইয়াছিল।

করবী ও বিমলা গাড়ির একটি কোণে বসিয়া ছিল, কখনও নিম্নস্বরে গল্প করিতেছিল, কখনও বা বাহিরের শীত-প্রভাতের শিশির ঝলমল দৃশ্য নীরবে দেখিতেছিল। করবী তাহার স্বভাবসুলভ ছেলেমানুষী ও অকপট সরলতার দ্বারা সহজেই বিমলার হৃদয় জয় করিয়া লইয়াছিল; তাহাদের পরিচয় এই অল্পক্ষণের মধ্যেই এমন একটা স্তরে গিয়া পৌঁছিয়াছিল—যেখানে পাশাপাশি বসিয়াও নিরবচ্ছিন্ন বাক্যালাপের প্রয়োজন হয় না।

গাড়ি উধ্বশ্বাসে একটা কঙ্করময় স্টেশনকে দলিত বিধ্বস্ত করিয়া চলিয়া গেল। প্রমদাবাবু পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিয়া বললেন, আর কুড়ি মিনিট। ঠিক টাইমে যাচ্ছে।

কিশোর উঠিয়া পড়িল; রাত্রির ব্যবহৃত বিছানাপত্র তখনও ইতস্তত ছড়ানো ছিল, গোছগাছ করা হয় নাই। কিশোর সেগুলিকেও গুছাইয়া লইবার উপক্রম করিতেই প্রমদাবাবু বলিলেন, থাক না হে, অত ব্যস্ত হবার প্রয়োজন কি? পাশের গাড়িতে আমার আদালী আছে, গাড়ি থামলে সে-ই ঠিকঠাক করে নেবে অখন।

কিশোর বলিল, তা হোক। তাড়াতাড়িতে সে হয়তো পেরে উঠবে না, আমিই ঠিক করে নিচ্ছি।

করবী বিমলার গা টিপিয়া বলিল, আপনি ঠিক বলেছিলেন বৌদি। বিমলা হাসিয়া ঘাড় নাড়িল।

কিশোর তাহাদের কথা শুনিয়াও শুনিল না, গম্ভীর মুখে কাজ করিতে লাগিল। সকলে সকৌতুকে দেখিতে লাগিলেন।

প্রমদাবাবু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাল কথা, তোমারা কাশীতে উঠছ কোথায় শুনলুম না তো! কোন আত্মীয় আছেন বুঝি?

কিশোর মুখ তুলিয়া একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, না, আত্মীয় কেউ নেই। কোথায় উঠব এখনও কিছু ঠিক করিনি। যেখানে হোক ওঠা যাবে, দিন তিন-চার বৈ তো নয়। শুনেছি, এ দিকের ধর্মশালাগুলো বেশ ভাল।

প্রমদাবাবু চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিলেন, বল কি হে! সঙ্গে স্ত্রীলোক রয়েছেন, ধর্মশালায় উঠবে কি? আমি ভেবেছিলুম তোমার বুঝি একটা আস্তানা আছে—তাই এতক্ষণ খোঁজ করিনি। বেশ যা হোক।

উৎসুক গলা বাড়াইয়া করবী বলিয়া উঠিল, বাবা, তাহলে–

প্রমদাবাবু বলিলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে আর বলতে। এক জায়গাতেই সকলে মিলে ওঠা যাবে। কিন্তু কি ছেলেমানুষী বল দেখি। ভাগ্যিস জিজ্ঞাসা করেছিলুম, নইলে তো ধর্মশালাতেই গিয়ে উঠতে।

কিশোর অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া বলিল, না না, সে আপনাদের বড় কষ্ট হবে। আমরা যেখানে হোক—

প্রমদাবাবু বলিলেন, বিলক্ষণ! কষ্ট কিসের? আমার শালাদের প্রকাণ্ড বাড়ি, দুজন অতিথি বেশী হলে তাদের কোনও কষ্ট হবে না। তা ছাড়া করবীর মা যদি শোনেন যে, তোমাদের ধর্মশালায় পাঠিয়ে দিয়ে আমরা বাড়ি এসেছি, তাহলে আমাদেরও হয়তো সেই ব্যবস্থা করতে বলবেন। তাঁর ভায়েদের বাড়ি-বুঝছ না? বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

করবী বলিল, কিশোরবাবু, কোন আপত্তি শোনা হবে না। আপনাদের যেতে হবে।

কিশোর বিমলার দিকে চাহিয়া বলিল, বৌদি, কিন্তু এটা কি উচিত হবে?

করবী বিমলার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, আপনি কিন্তু অমত করতে পারবেন না, তা বলে দিচ্ছি।

বিমলা সহাস্যে বলিল, অমত করব কেন–বেশ তে। এ তো বরং ভালই হল। আর অসুবিধে যদি হয়, সে তো আমাদের হবে না, তোমাদেরই হবে। তা সে অসুবিধে যখন তোমরা স্বীকার করে নিচ্ছ, তখন আর আমাদের আপত্তি কি?

নিজের জন্য যতটা নয়, বিমলার কথা ভাবিয়াই কিশোর করবীদের বাড়ি আতিথ্য স্বীকার করিতে অনিচ্ছা জানাইয়াছিল। বিমলা শুদ্ধাচারে থাকে, তাহার জপতপ স্নানাহারের নানা হাঙ্গামা আছে, পরের বাড়িতে উঠিয়া হয়তো এ সকলের কোন সুব্যবস্থা হইবে না; হয়তো তাঁহারা সাহেব লোক, একঘড়া গঙ্গাজলও তাঁহাদের বাড়িতে পাওয়া যাইবে না; বিমলা হাসিমুখে সমস্ত অসুবিধা ভোগ করিলেও ভিতরে ভিতরে কষ্ট পাইবে, এই সব নানা কথা ভাবিয়া কিশোরের মন কিছুতেই এ প্রস্তাবে সায় দিতেছিল না। কিন্তু বিমলা যখন কোন অনিচ্ছাই প্রকাশ করিল না, বরং সহজেই রাজী হইয়া গেল তখন কিশোরের নিজের পক্ষ হইতে একটা অজ্ঞাতনামা আপত্তি মাথা তুলিবার চেষ্টা করিল। প্রমদাবাবু ও তাঁহার পরিবারবর্গের সংসর্গ অপ্রীতিকর নহে, এ কথা বলাই বাহুল্য; কিন্তু তবু অন্ধকার রাত্রিতে অজানা পথে চলিতে চলিতে গভীর খাদের কিনারায় আসিয়া পড়িলে অজ্ঞাত আশঙ্কায় যেমন ঘাড়ের রোঁয়া খাড়া হইয়া উঠে, তেমনই একটা নামহীন দুর্দৈবের পূর্বাভাস কিশোরের মনটাকে যেন শঙ্কায় কণ্টকিত করিয়া তুলিল এবং মনে হইল ইহাদের সঙ্গ ছাড়িয়া পলাইতে পারিলেই যেন সব দিক দিয়া ভাল হয়।

অথচ এরূপ সহৃদয় নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়া শহরের পান্থ-নিবাসে আশ্রয় লওয়ার মত অশিষ্টতা অতি অল্পই আছে; তাই কুণ্ঠিতভাবে রাজী হওয়া ছাড়া তাহার গতি রহিল না। প্রমদাবাবু ও করবী অকপটভাবে খুশি হইয়াছেন বুঝিয়াও সে মনের মধ্যে প্রসন্নতা লাভ

করিতে পারিল না। বাকী পথটা একটা অস্বাচ্ছন্দ্যের ভিতর দিয়া প্রায় নীরবেই কাটিয়া গেল।

যথাসময়ে মোগলসরাই স্টেশনে নামিয়া সকলে মোটর-যোগে কাশী পৌঁছিলেন। কাশীতে করবীর মামার বাড়ি দশাশ্বমেধ ঘাটের নিকটেই। তাঁহারা মোটেই সাহেব নহেন, বরঞ্চ কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় হিন্দু দেখিয়া কিশোর বিমলার বিষয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল। করবীর মা আগন্তুকদের পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। বিমলাকে হাত ধরিয়া বাড়ির মধ্যে লইয়া গিয়া ভ্রাতৃবধুদের সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিলেন। বেলা হইয়াছিল, অল্প দুই-চারিটা কথাবার্তার পর বিমলা গামছা কাঁধে ফেলিয়া স্নানাগারে প্রবেশ করিল এবং অল্পক্ষণ পরেই স্নান সারিয়া পূজার ঘরে ঢুকিল।

পূজা শেষ করিয়া যখন সে বাহির হইল, বেলা একটা বাজিয়া গিয়াছে। বাড়ির মেয়েরা সকলেই তাহার জন্য অভুক্ত রহিয়াছেন দেখিয়া সে লজ্জিত হইয়া বলিল, কেন আমার জন্য আপনারা কষ্ট করলেন? আমি তো বিশ্বনাথ দর্শন না করে মুখে জল দিতে পারব না। আমারই অন্যায় হয়েছে, আগে বলা উচিত ছিল। কিন্তু আপনারা আর দেরি করবেন না, খেয়ে-দেয়ে নিন। আর যদি সুবিধা হয়, একজন লোক আমার সঙ্গে দিয়ে আমাকে বিশ্বনাথ মন্দিরে যাবার ব্যবস্থা করে দিন। ঠাকুরপোকে সঙ্গে নিতে পারতুম, কিন্তু সমস্ত রাত গাড়িতে এসে তিনি ক্লান্ত হয়েছেন।

করবী বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, আর আপনার শরীরে বুঝি ক্লান্তি নেই? কাল গাড়িতে ওঠার পর থেকে আজ এই বেলা পর্যন্ত আপনাকে মুখে এক ফোঁটা জল দিতে দেখলুম না! ক্ষিদের কথা ছেড়ে দিই, কিন্তু তেষ্টাও কি আপনার পায় না, বৌদি?

বাড়িতে অন্য কোন বিধবা ছিলেন না, তাই বিমলার জন্য আলাদা হবিষ্য রাঁধিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। করবীর বড় মামী বলিলেন, আপনার রান্নার উযুগ সব আমি করে রেখেছি, শুধু আমাদের হাতে খাবেন কিনা তাই রান্না চড়াতে পারিনি।

বিমলা হাসিয়া বলিল, সে কি কথা, খাব বৈকি।

বড় মামী বলিলেন, তাহলে আপনার রান্না আমিই চড়িয়ে দিই; বিশ্বনাথ তো কাছেই, আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসতে পারবেন। করবী, দুবেকে ডেকে বলে দে তো মা, মোটরকারে করে এঁকে যেন বিশ্বনাথ দর্শন করিয়ে আনে। আর সুরেনের তো স্কুল নেই, সে সঙ্গে যাক—

করবী বলিল, কিন্তু খেয়ে-দেয়ে গেলেই তো ভাল হত।

বিমলা জিভ কাটিয়া বলিল, তা কি হয় ভাই, কাশীতে এসে বিশ্বনাথের মাথায় জল না দিয়ে কি খেতে আছে।

করবী বলিল, কেন খেতে নেই? আমি তো এসেই চাহালুয়া খেয়েছি।

বিমলা হাসিয়া উঠিল, শোন কথা। তুমি আর আমি কি সমান? তা ছাড়া উপোস করতে আমাদের কষ্ট হয় না—

করবী রাগিয়া উঠিয়া কী একটা প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিল, তাহার বড় মামী বাধা দিয়া বলিলেন, তর্ক করিসনি, করবী। দ্যাখ সুরেন কোথায়, সে আবার এখনই হয়তো কোথাও বেরিয়ে যাবে। আর গাড়ি সামনে আনতে বলে দে।

করবী চলিয়া গেলে বিমলা মৃদু হাসিয়া বলিল, একেবারে ছেলেমানুষ।

গাড়ি অন্দরের দরজায় আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহাতে উঠিতে উঠিতে বিমলা বাড়ির বধুদের অনুনয় করিয়া বলিল, দোহাই, আপনারা আমার জন্যে যেন আর না খেয়ে বসে থাকবেন না—তাতে কেবল আমার অপরাধ বাড়বে। বরং খাওয়া-দাওয়া শেষ করে আমার জন্যে দুটো আলোচাল ফুটিয়ে রাখবেন; আমার ফিরতে আজ তিনটে বাজবে।

বিমলা চলিয়া গেল। এই অপরূপ সুন্দরী বিধবাকে দেখিয়া বাড়ির মেয়েরা সকলেই বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন; কিন্তু এত অল্পবয়সে তাহার এই কঠিন নিষ্ঠা ও ব্রহ্মচর্য দেখিয়া তাঁহাদের মনে হইল, যেন হিন্দু-বিধবার অবশ্যপালনীয় বিধি-বিধানের সীমা কঠোর তপস্যার বলে সে বহুদূর অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। সম্ভ্রম ও শ্রদ্ধার সহিত ব্যথায় তাঁহাদের মন পূর্ণ হইয়া গেল।

সেদিন বিকালবেলাটা ক্লান্তিবিনোদনেই কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার পর বাড়ির পুরুষরা বৈঠকখানায় আসর জমাইয়া তুলিলেন। করবীর অনেকগুলি মামা। যিনি জ্যেষ্ঠ, তিনি প্রায় প্রমদাবাবুর সমবয়স্ক বহুদিন পরে শালা ও ভগিনীপতির সাক্ষাতে হাসি-তামাশা ও বাক্যবাণের অবাধ বিনিময় চলিতে লাগিল। বাহিরের লোক কিশোর ছাড়া আর কেহ ছিল না, তাই করবীও এক সময় তাঁহাদের মধ্যে আসিয়া বসিল। মামার বাড়ির পদাপ্রথা করবী মানিত না; মামারা যদিও ইহা পছন্দ করিতেন না , তথাপি আদরিণী ভাগিনেয়ীকে কিছু না বলিয়া ভগিনীপতির উপর ঝাল ঝাড়িতেন। শ্বশুরবাড়িতে প্রমদাবাবুর সাহেব ডাকনাম শ্লেষ হইতে উদ্ভূত হইয়া ক্রমে স্থায়ী হইয়া পড়িয়াছিল।

বৈঠকের লক্ষ্যহীন আলোচনা প্রসঙ্গ হইতে প্রসঙ্গান্তরে সঞ্চারিত হইয়া ক্রমে একটা জটিল আইনের প্রশ্নে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। কিশোর নীরবে বসিয়া শুনিতেছিল। করবী কিছুক্ষণ মন দিয়া শুনিবার চেষ্টা করিয়া শেষে কিশোরের দিকে একটু সরিয়া আসিয়া চুপিচুপি বলিল, কিশোরবাবু, কাল খাওয়া-দাওয়া করে সারনাথ দেখতে যাব ঠিক হয়েছে। আমি, আপনি আর বৌদি আর কেউ নয়।

কিশোর স্মিতমুখে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, আচ্ছা।

করবী আর কিছু না বলিয়া এক সময় পা টিপিয়া টিপিয়া উঠিয়া গেল। তাহার আগমন ও প্রস্থানে বৈঠকের আলোচনা তিলমাত্র ক্ষুণ্ণ হইল না বটে, কিন্তু কিশোরের গা ঘেঁষিয়া বসিয়া চুপিচুপি কথা কহিয়া উঠিয়া যাইবার দৃশ্যটা কাহারও দৃষ্টি এড়াইল না।

রাত্রিতে আহারাদির পর করবীর জ্যেষ্ঠ মাতুল প্রমদাবাবুকে নিভৃতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, সাহেব, মেয়ের বিয়ের কী করছ?

কিছুই তো এখনও করিনি।

তা তো দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তু করার সময় যে পেরিয়ে যাচ্ছে। করবীর বয়স কত হল—সতেরো? বাঙালীর ঘরের মেয়ে, আর বেশী দিন ঘরে রাখা তো চলবে না। মেয়ের জন্য পাত্র দেখতে আরম্ভ করো।

সে হবে এখন, এত তাড়াতাড়ি কিসের?

দেখো, ঐ কথাগুলো আমার ভাল লাগে না। মেয়ের সতেরো বছর বয়স হল, এখনও তাড়াতাড়ি কিসের? অন্য বিষয়ে সাহেবিয়ানা করো ক্ষতি নেই, কিন্তু এ দিকে যা রয় সয় তাই ভাল। তুমি না পার, আমিই পাত্র দেখছি।

আরে অত চটছ কেন? মনের মত পাত্রও তো পাওয়া চাই।

অপাত্রে মেয়ে দিতে তো বলছি না। কিন্তু মনের মত পাত্রও জগতে দুর্লভ নয়—খুঁজলে পাওয়া যায়।

প্রমদাবাবু চুপ করিয়া রহিলেন। বড় মামা কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, আচ্ছা, এই কিশোর ছোকরার সঙ্গে তোমাদের কদ্দিনের আলাপ?

বেশী দিন নয়,—মাস চার-পাঁচ।

ওর সঙ্গে আজ কথা কইছিলুম—বেশ ছেলে, তোমাদের পালটি ঘর। ওর কথা কখনও ভেবে দেখেছ?

দেখেছি। সব দিক দিয়েই সুপাত্র। কিন্তু করবীর মনের ভাব না বুঝে তো স্থির করা যায় না।

সাহেব, সে আমি জানি। মেয়েকে যখন ইংরাজী স্কুলে পড়িয়ে উচ্চ শিক্ষা দিয়েছ, তখন তার অমতে কিছু হবে না। কিন্তু একদিন দেখেই আমার যা ধারণা হয়েছে, তাতে করবীর বিশেষ অমত হবে বলে বোধ হয় না, বরং খুব বেশী রকম মত হবে বলেই আন্দাজ হচ্ছে। তুমি তো অনেক দিন ধরেই দেখছ, তোমার কিছু সন্দেহ হয় না?

ভাই, এ সব আঁচ-আন্দাজের কথা নয়, পরিষ্কারভাবে জানা দরকার। বুঝছ না, আমাদের আন্দাজ ভুলও হতে পারে।

বেশ, সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করেই দেখো না?

তা জিজ্ঞাসা করতে পারি, কিন্তু তাতে অনিষ্ট হতে পারে। এখন কিছু না বলাই ভাল, সময় উপস্থিত হলে আমাদের কিছু জিজ্ঞাসা করবার দরকার হবে না।

দেখো, আমি সেকেলে লোক, এই সব মেলামেশা পছন্দ করি না। আমার মনে হয়, ও জিনিসটাকে বিনা বাধায় অগ্রসর হতে দিলেই অনিষ্টের সম্ভাবনা। আমার এ একটুও ভাল বোধ হচ্ছে না। শেষকালে হয়তো এমন জট পাকিয়ে যাবে যে, জট ছাড়াতেই প্রাণান্ত হয়ে পড়বে।

অতঃপর আর কোন কথা হইল না। রাত্রিতে শয়নকালে প্রমদাবাবু অন্যান্য কথার পর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিশোর সম্বন্ধে করবীর মনে কিছু আছে তোমার মনে হয়? করবীর মা বলিলেন—হয়। করবী আগে অনেক ছেলেমানুষী করেছে, কিন্তু এবার বোধ হয় সত্যি সত্যি

সুহাসিনীর বিষয়ে সব কথাই তো জানে?

জানে। তার মুখেই তো আমরা শুনেছি।

হুঁ, বলিয়া প্রমদাবাবু পাশ ফিরিয়া শুইবার উপক্রম করিলেন। নিদ্রা সহসা আসিল না, ঘুরিয়া-ফিরিয়া শ্যালকের সুস্পষ্ট আশঙ্কার কথাই তাঁহার মনে জাগিতে লাগিল। কিশোরের সহিত অবাধে করবীকে মিশিতে দিয়া ভুল করিয়াছেন কিনা, ভাবিতে ভাবিতে অনেক রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

২০

পরদিন খাওয়া-দাওয়ার পর বাহির হইতে বেলা বারোটা বাজিয়া গেল।

বিমলা, করবী ও কিশোর এই তিনজনেরই যাওয়া স্থির ছিল, কিন্তু যাত্রা করিবার সময় সুরেন আসিয়া গাড়িতে চাপিয়া বসিল। তাহার বয়স তেরো-চৌদ্দ বছর, এই একদিনেই সে বিমলার বিশেষ অনুগত হইয়া পড়িয়াছে।

করবী তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, তুই আবার কোথায় যাবি? তুই তো অনেকবার দেখেছিস।

সুরেন বয়সে এবং অন্তরে ছেলেমানুষ হইলেও কথাবার্তায় বেশ পরিপক, সে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, দেখলেই বা! আবার বুঝি দেখতে নেই?

করবী অধীর হইয়া বলিল, না না, তুই ব্যাডমিন্টন খেলগে যা না বাপু!

সুরেনও গরম হইয়া বলিল, ব্যাডমিন্টন তুই খেলগে যা, ও তো মেয়েমানুষের খেলা। আমি আজকাল টেনিস খেলি—জানিস?

করবী চোখ পাকাইয়া বলিল, অ্যাঁ—আমাকে তুই বলা! আমি না তোর দিদি! দাঁড়া তো বলিয়া কানের দিকে হাত বাড়াইল।

সুরেন দুই হাতে নিজের কান চাপিয়া ধরিয়া তর্জন করিয়া কহিল, খবরদার করি-দি, কানে হাত দিলে ভাল হবে না বলে দিচ্ছি—দেখুন তো, বৌদি

বিমলা তাহাকে নিজের কাছে টানিয়া লইয়া বলিল, আহা চলুক না ও, আমাদের দেখাতে-শোনাতে পারবে।

সুরেন উৎসাহিত হইয়া বলিল, া আলবত। করি-দি সারনাথের জানে কী? কলা। মিউজিয়মে যে অ্যাস্তবড় হাঁড়ি আছে, দেখেছিস? কত দিনের পুরানো বল দেখি?

তোর আত্তবড় হাঁড়ি আমি দেখতে চাই না।

দুই ভাইবোনে সারাটা পথ ঝগড়া করিতে করিতে চলিল।

সারনাথের ধ্বংসস্তুপে পৌঁছিয়া সকলে মোটর হইতে নামিল। আর একখানা শুন্য ট্যাক্সি মোড়ের উপর দাঁড়াইয়া ছিল; এ সময়ে প্রত্যহই দুই-চারিজন দর্শক মৃগদাবের লুপ্ত গৌরবের চিহ্নগুলি পরিদর্শন করিতে আসিতেন। নিকটেই মিউজিয়ম—তাহাতে খননোদ্ধৃত মূর্তি প্রভৃতি রক্ষিত ছিল। অদূরে একটি বৌদ্ধ মঠ, তাহাতে কতকগুলি মুণ্ডিতশির শ্রমণ বাস করিতেছিলেন। তাঁহারা অধিকাংশই সিংহলী বা ব্রহ্মদেশীয়; বাঙালী বৌদ্ধ সন্ন্যাসীও দুই-একজন ছিলেন।

সম্মুখেই মহাচৈত্যের বিরাট দেহ আকাশে মাথা তুলিয়া আছে। উৎসাহী সুরেনের পশ্চাদ্বর্তী হইয়া সকলে প্রথমে সেই দিকে চলিল। কোথায় চৈনিক পরিব্রাজক পাথরের উপর সোনা বসাইয়া গিয়াছে, হাজার বছরেও তাহাও মুছিয়া যায় নাই; কোনখানটা মেরামত করিতে গিয়া ইংরাজ গভর্নমেন্ট চৈত্যের শিল্প-শোভা কুশ্রী করিয়া তুলিয়াছে; কোন লৌহশৃঙ্খল অবলম্বনে চৈত্যের উপরে উঠিয়া দীপালী সাজাইবার নিয়ম ছিল, এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে সকলে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। দর্শন শেষ হইলে সঙ্ঘারামের খনিত ভূমির উপরে সকলে উপস্থিত হইল। স্থানটা বহু বিস্তৃত, কোথাও প্রকাণ্ড দরদালানের স্তম্ভের পাঠিকাগুলি রহিয়াছে, আর সবই নষ্ট হইয়া গিয়াছে; কোথাও সারি সারি ক্ষুদ্র কুঠুরির ছাদহীন নগ্ন দেওয়ালগুলি সেকালের ছাত্রদের কঠোর কৃসাধনের পরিচয় দিতেছে; কোথাও বা সঙ্কীর্ণ গুপ্ত সুড়ঙ্গ এখনও অটুট অবস্থায় বর্তমান রহিয়াছে। সমস্ত মিলিয়া এমন একটি আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছে যে, দেখিতে দেখিতে অতীতের অসংলগ্ন স্বপ্নে মন তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া যায়।

বিমলা সুরেনের মুখে এই সব স্মৃতি-চিহ্নের সত্য-অসত্য ইতিহাস শুনিতে শুনিতে একেবারে তন্ময় হইয়া গিয়াছিল। কিশোর বুকের মধ্যে কেমন একটা বেদনা অনুভব করিতেছিল; যেন তাহার নিজেরই অতীত জীবনের ইতিহাস এইখানে ছিন্ন হইয়া কালের চরণতলে দলিত পিষ্ট হইয়া পড়িয়া আছে, ইহার মর্মকাহিনী চিরদিন এমনই অনাদৃত অপঠিত রহিয়া যাইবে। করবীও ইহাদের দুজনের দেখাদেখি গম্ভীর হইয়া থাকিবার চেষ্টা করিতেছিল বটে, কিন্তু তাহার মনটা এই সব মৃত অতীতের স্মৃতির সঙ্গে ঠিক সুর মিলাইতে পারিতেছিল না। তাহার সতেরো বছর বয়স, আজ না জানি কি কারণে তাহার বুকের ভিতরটা দুলিয়া দুলিয়া উঠিতেছিল, চোখে যেন কিসের ঘোর লাগিয়াছিল। তাহার

সমস্ত দেহটা সুরবাঁধা সেতারের মত বিনা কারণেই রণিয়া রণিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। শুষ্ক নীরস অতীতের কথায় তাহার প্রয়োজন ছিল না। তাহার কি আসে যায় কবে গুপ্ত-সাম্রাজ্যের কোন রানী সঙেঘর জন্য কোন অলিন্দ নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা জানিয়া?

এইভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে করবী ও কিশোর অজ্ঞাতসারে আলাদা হইয়া বিমলা ও সুরেনের নিকট হইতে দূরে পড়িয়া গিয়াছিল, হঠাৎ কিশোর একবার চারিদিকে তাকাইয়া বলিল, বৌদি কোন দিকে গেলেন?

করবী বলিল, সুরেন বোধ হয় কোথাও বসে তাঁকে বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলতে শুরু করে দিয়েছে। চলুন, ঐ স্তম্ভটা দেখে আসি। স্তম্ভের দিকে যাইতে যাইতে করবী আঙুল দেখাইয়া বলিল, দেখুন, আমাদের মত আরও কারা বেড়াতে এসেছে।

কিশোর চাহিয়া দেখিল, একজন পুরুষ ও একটি স্ত্রীলোক দূরে দাঁড়াইয়া একজন ভিক্ষুর সহিত কথা কহিতেছেন। ভিক্ষু অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া তাঁহাদের এটা-ওটা দেখাইয়া কী কথা বলিতেছেন, শুনা গেল না। কিশোর নিরুৎসুকভাবে বলিল, বাঙালী মনে হচ্ছে।

করবী কৌতূহলভরে সেই দিকে তাকাইতে তাকাইতে চলিল।

আধঘণ্টা পরে স্তম্ভ দেখিয়া ফিরিবার সময় হঠাৎ কোন্ দিক দিয়া যেন কী হইয়া গেল। মেয়েমানুষের মনের কথা, যাহা সহজে প্রকাশ হইবার নয়,অচিন্তিতপূর্ব অবস্থার মধ্যে

পড়িয়া তাহা দমকা হাওয়ায় বদ্ধ জানালার মত খুলিয়া একেবারে উদঘাটিত হইয়া গেল। কোথাও এতটুকু আড়াল বা আবরণ রহিল না।

প্রাচীন ইষ্টকের দেওয়াল দিয়া ঘেরা চৌবাচ্চার মত একটা স্থানে এক খণ্ড প্রস্তরলিপি দেখিয়া কিশোর সেটা পাঠ করিবার উদ্দেশ্যে নামিয়া পড়িয়াছিল। চারিধারের দেওয়াল হইতে স্থানটা। পাঁচ-ছয় ফুট নীচু, নামিবারও কোন পথ ছিল না, কিশোর উপর হইতে লাফাইয়া পড়িয়াছিল। করবী সেখানে নামিবার কোন সহজ উপায় না দেখিয়া উপরেই দাঁড়াইয়া ছিল।

নিবিষ্টমনে শিলালিপির পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করিতে করিতে কিশোর এক সময় চোখ তুলিয়া দেখিল,করবী হঠাৎ কি মনে করিয়া পাঁচিলের মত দেওয়ালের উপর দিয়া পার হইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু কয়েক পদ গিয়া আর যাইতে পারিতেছে না, মাঝখানে দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে। তাহার পা দুটা থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। দেওয়ালটা মাত্র হাতখানেক চওড়া, তাহার দুই দিকেই একমানুষ প্রমাণ গর্ত, কিশোর ভীতভাবে চিৎকার করিয়া উঠিল, সাবধান!

কিন্তু সাবধান হইবার মত অবস্থা করবীর ছিল না, সাকাসে তারের উপর খেলা দেখাইতে দেখাইতে মেয়েরা যেমন দুলিতে থাকে, সেও তেমনই একবার এদিক একবার ওদিক দুলিতেছিল। তাহার মুখ কাগজের মত সাদা হইয়া গিয়াছিল। কিশোরের দিকে না চাহিয়াই সে ক্ষীণস্বরে বলিয়া উঠিল, আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না।

করবী যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, ছুটিয়া তাহার নীচে গিয়া দাঁড়াইয়া কিশোর বলিল, বসে পড়ো। ঐখানে বসে পড়ো। আমি তোমাকে তুলে আনছি!

কিশোরের কথামত বসিতে গিয়া করবী আর তাল সামলাইতে পারিল না, অস্ফুট চিৎকার করিয়া যেদিকে কিশোর ছিল, সেই দিকে ঢলিয়া পড়িল।

তাহার পতনোম্মুখ দেহ কিশোর অর্ধপথে ধরিয়া ফেলিল বটে, কিন্তু করবীর হাই হীল জুতাসুদ্ধ পা দুটা সজোরে মাটিতে ঠকিয়া গেল। পতনের সঙ্গে সঙ্গে সে প্রাণপণে কিশোরের গলা জড়াইয়া ধরিয়াছিল, মাথাটাও কিশোরের বুকের উপর পড়িয়াছিল। সেই ভাবেই দুইজন ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিল। করবীর হৃৎপিণ্ডের দ্রুত স্পন্দন হাতুড়ির মত কিশোরের বুকে আঘাত করিতে লাগিল।

পাঁচ সেকেণ্ড এইভাবে থাকিবার পর কিশোর চমকিয়া করবীকে ছাড়িয়া দিল। কি সর্বনাশ! এই অবস্থায় যদি কেহ তাহাদের দেখিয়া ফেলে।

করবী কিন্তু তাহাকে ছাড়িল না, বাহুবন্ধন হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতেই সে ভীত শিশুর মত। আরও জোরে তাহার গলা আঁকড়াইয়া ধরিল। চক্ষু মুদিতই ছিল, কেবল তাহার বুক হইতে একটি কম্পিত নিশ্বাস বাহির হইল মাত্র।

কিশোর ত্রস্ত ও বিব্রত হইয়া বলিল, কোথাও লাগেনি তো?

করবী সাড়া দিল না। দুশ্চিন্তায় কিশোরের গলা শুকাইয়া গেল—তবে কি করবী মূর্ছা গেল নাকি?

সে ভীতকণ্ঠে ডাকিল, করবী!

করবী একবার চোখ খুলিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া আবার তৎক্ষণাৎ চোখ বন্ধ করিয়া ফেলিল।

যাক, তবু ভাল, মূর্ছা নহে, কিশোর অস্বস্তিপূর্ণ দেহে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া শেষে আর কিছু ভাবিয়া না পাইয়া পুনরায় বলিল, তোমার কোথাও লাগেনি তো?

করবী মাথা নাড়িয়া জানাইল, না।

কিশোর সঙ্কুচিত স্বরে বলিল, তাহলে—তাহলে এখান থেকে বেরুবার চেষ্টা করলে হত না?

করবীর মুখে আবার রক্তসঞ্চার হইয়াছিল, সে ঠোঁট টিপিয়া চুপি চুপি বলিল, কেন, আমি তো বেশ আছি। তোমার কি আমাকে বড্ড ভারি বোধ হচ্ছে।

দারুণ শীতেও কিশোরের কপাল ঘামিয়া উঠিল। করবী আঘাত পায় নাই, মূছাও যায় নাই—অথচ তাহার বুকের উপর মাথা রাখিয়া পড়িয়া আছে। অনেক সময় ভয় পাইলে

স্ত্রীলোকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিথিল হইয়া যায়, দাঁড়াইতে পারে না—ইহা সম্ভবপর বটে, কিন্তু তাহার মুখে এ কি রকম কথা! কিশোরের মনে ভীষণ একটা সন্দেহ মাথা তুলিতে লাগিল। তবে কি–

না, না, এ সম্ভব নহে, তাহারই বুঝিবার ভুল। সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, কিন্তু কেউ যদি আমাদের এভাবে দেখতে পায়—মনে করবে–

মনে করুক গে—

কিশোর পাথরের মত শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আর সন্দেহ করিবার তিলমাত্র স্থান নাই। করবীর কণ্ঠস্বর, তাহার সিন্দুরবর্ণ মুখ, মুদিত চক্ষু কেবল একটি কথার সাক্ষ্য দিতেছে। কিশোরের মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। এ কী হইল। ইহা সে কখনও ভাবিতে পারে নাই। কিন্তু করবীর এ ভাব তো আকস্মিক নহে, ইহার পশ্চাতে বহুদিনের রুদ্ধ নিগৃহীত আবেগ সঞ্চিত হইয়া আছে। আজ নাড়া পাইয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে মাত্র। কিন্তু কেন এমন হইল।

হাওড়া স্টেশনে করবীর সহিত প্রথম চোখাচোখির সময় ইহারই পূর্বাভাস বুঝি সে পাইয়াছিল। কেন, তখন সে সাবধান হয় নাই? কেন করবীর সহিত অসদ্ব্যবহার করিয়া অন্য গাড়িতে গিয়া উঠে নাই? এখন এই অপরিসীম লজ্জার বোঝা লইয়া সে কী করিবে? করবীর এ অনাহুত ভালবাসা কেমন করিয়া প্রত্যাখ্যান করিবে?

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

কিন্তু–

করবী যদি সত্যই তাহাকে ভালবাসে, তবে কেন সে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবে? করবীকে ভালবাসিবে না কেন? সে তো মুক্ত, তাহার কোন বন্ধন নাই। সারাজীবন কেন সে উদাসীর মত। কাটাইয়া দিবে? কবীকে বিবাহ করিয়া সে কি সুখী হইতে পারে না? করবীর মত মেয়ে এ সংসারে কয়টা পাওয়া যায়? করবীকে বিবাহ করিয়া তাহার বুকের শূন্য গহ্বর কি ভরিয়া উঠিবে না?

কিশোরের বক্ষ ভেদ করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। অন্তর্যামীর কাছে তো ছলনা চলে না। নহিলে, এই যে একটি পূর্ণযৌবনা নারী তাহার বুকের উপর পড়িয়া যথাসাধ্য সরল ভাষায় তাহাকে প্রেম নিবেদন করিতেছে, ইহা তাহার অন্তরে অনুরূপ ভাবের সৃষ্টি করিতে পারিল না কেন? করবী যে পাষাণমূর্তি নয়, বেপমানা স্পন্দমানা নারীমূর্তি,– একথা, তাহার মন তো দূরের কথা, শরীরের তপ্ত রক্তস্রোতেও স্বীকার করিতে পারিল না কেন? না,–করবীকে দিবার মত তাহার কিছু নাই। আর একজন তাহার হৃদয় বলিয়া যাহা কিছু ছিল, তাহা লুটিয়া-পুটিয়া নিঃশেষ করিয়া লইয়া দূরে সরিয়া গিয়াছে। শূন্য হৃদয় লইয়া করবীর প্রেম সে গ্রহণ করিতে পারিবে না। দুদিন পরে এই নিঃস্ব অন্তঃসারশূন্যতা যখন প্রকাশ হইয়া পড়িবে, তখনকার ভয়াবহ জীবনযাত্রার কথা কল্পনা করিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। না, করবীকে সে ঠকাইতে পারিবে না।

কিন্তু তবু করবীর প্রতি স্নেহে করুণায় তাহার বুক ভরিয়া উঠিল। তাহার উপরে, কি দুর্বিষহ লজ্জা যে এখনই করবীকে মাটির সহিত মিশাইয়া দিবে তাহা ভাবিয়া সে নিজেও

লজ্জায় মরিয়া গেল। কী করিবে, কেমন করিয়া এই দুর্নিবার লজ্জার হাত হইতে করবীকে রক্ষা করিবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না।

কিছুক্ষণ পরে নিজেকে যথাসম্ভব সংযত করিয়া সে করবীর চুলের উপর মৃদু অঙ্গুলিস্পর্শে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, করবী, তুমি তো জান–

এই পর্যন্ত বলিয়া কিশোর হঠাৎ থামিয়া গেল। সুর্য পশ্চিমদিকে ঢলিয়া পড়িয়াছিল, ঠিক এই সময় কাহার সুদীর্ঘ ছায়া তাহার পায়ের কাছে আসিয়া পড়িতেই কিশোর চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল। করবী চোখ বুজিয়া ছিল বলিয়া কিছু দেখিতে পাইল না। কিন্তু বৈকালী সূর্যের পশ্চাৎপটের সম্মুখে এক অতিপরিচিত নারীমূর্তি দেখিয়া কিশোরের মনে হইল, সে একটা অসম্ভব অবান্তর স্বপ্ন দেখিতেছে। ক্ষণকাল অভিভূতের মত থাকিয়া সে সবলে রূঢ়ভাবে নিজেকে করবীর বাহুমুক্ত করিয়া লইল।

কিন্তু উপর হইতে সেই ক্ষণিক-মূর্তি তখন অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে।

এই সময় দুর হইতে সুরেনের বালককণ্ঠের ডাক আসিল, করি-দিদি! কিশোরবাবু।

কিশোর নীরস নিস্তেজ স্বরে কহিল, চলুন। ওরা আমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে।

আর কোন কথা হইল না, কেহ কাহারও মুখের দিকে চাহিল না, নিঃশব্দে দুইজনে ফিরিয়া গিয়া বিমলা ও সুরেনের সহিত যোগ দিল।

বিমলা একবার দুইজনের মুখের দিকে চাহিয়াই বুঝিল,—কিছু একটা ঘটিয়াছে। কিন্তু কী ঘটিয়াছে তাহা এই দুটি শুষ্ক পাংশু পীড়িত মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিল না এবং অনুমান করিতে সাহসী হইল না।

অন্তরের দুঃসহ বেদনা চাপিয়া যাহাদের মুখে হাসিতে হয় তাহাদের মত হতভাগ্য অল্পই আছে। কিশোর ও করবী আরও দুই ঘণ্টা, যেন কিছুই ঘটে নাই এমনি অভিনয় করিয়া, সমস্ত দ্রষ্টব্য বস্তু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়া যখন বাড়ি ফিরিবার জন্য মোটরে উঠিল, তখন হৃদয়-ভারাক্রান্ত অবসাদে কিশোরের সর্বশরীর ভাঙিয়া পড়িতেছে এবং করবীর মনে হইতেছে আরও খানিকক্ষণ এইরূপ করিতে হইলে সে আর পারিবে না, তাহার স্নায়ুমণ্ডলী ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইবে। তাই বাড়ি যাইবার পথে এই বৃথাভিনয়ের চেষ্টা আর কাহারও দ্বারা সম্ভব হইল না। সন্ধ্যার অন্ধকারে চলন্ত গাড়ির মধ্যে সকলে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

সুরেনের অতিশয় ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছিল, সেও বাক্যব্যয় করিয়া শক্তিক্ষয় করিতে রাজী হইল না।

বাড়ি আসিয়া নামিবার উপক্রম করিতেই প্রমদাবাবুর ভৃত্য আসিয়া খবর দিল যে, বিনয়বাবু ও সুহাসিনী দেখা করিতে আসিয়াছেন।

করবী তাড়াতাড়ি নামিয়া গেল।

মোটর-ড্রাইভারকে গাড়ি গ্যারেজে তুলিতে নিষেধ করিয়া কিশোর দ্রুতপদে গিয়া প্রমদাবাবুর নিকট উপস্থিত হইল। ভাগ্যক্রমে প্রমদাবাবু একাকী ছিলেন, কিশোর কোন প্রকার ভণিতা না করিয়া বলিল, এখনই আমি বৌদিকে নিয়ে স্টেশনে রওনা হব। শুনেছি, আটটার সময় একটা পশ্চিমের ট্রেন আছে।–কিছু মনে করবেন না আপনারা তো সব জানেন।

তাহার ক্লান্তক্লিষ্ট মুখের দিকে চাহিয়া প্রমদাবাবু কী যেন বলিতে গেলেন, কিন্তু বলিবার পূর্বেই কিশোর নত হইয়া তাঁহার পদধূলি লইয়া বলিল, থাকতে অনুরোধ করে আমার লজ্জা আর বাড়াবেন না। আপনাদের সংসর্গে এলেই আমি অপরাধ করে ফেলি, এই আমার ভাগ্য। দয়া করে একটা চাকরকে বলে দিন, আমাদের জিনিসপত্রগুলো গাড়িতে তুলে দিক। বৌদি গাড়িতেই বসে আছেন।

21

সংক্রামক ব্যাধির বিষাক্ত আবহাওয়া ছাড়িয়া ভয়ার্ত মানুষ যেমন দিগ্বিদিক-জ্ঞানশুন্য হইয়া পলায়ন করে, বিনয়বাবুও তেমনি কন্যাকে লইয়া কলিকাতা হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন। কোন একটা নির্দিষ্ট গন্তব্য স্থান ভাবিয়া দেখিবার অবকাশ পান নাই, কেবল এই বাড়িটার দূষিত স্মৃতি হইতে সুহাসিনীকে দূরে লইয়া যাওয়া যে একান্ত প্রয়োজন, এ কথাটাই অঙ্কুশের মত তাঁহাকে বিদ্ধ করিয়া অনিশ্চিত ও নিরুদ্দেশের পথে ঠেলিয়া দিয়াছিল।

সুহাসিনীও বাধা দেয় নাই। তাহার পক্ষাঘাতগ্রস্ত মনে বাধা দিবার বা আপত্তি করিবার শক্তি ছিল। তা ছাড়া পাশের বাড়িটার দুঃসহ সামীপ্য তাহার অবসন্ন মনকে তুষানলের মত অহরহ দগ্ধ করিতেছিল। ওই বাড়িটার দিকে চোখ পড়িলেই তাহার বুকের ভিতর হু হু করিয়া উঠিত, অথচ চোখে না পড়িয়া উপায় নাই। তাই পিতার প্রস্তাবে সে আগ্রহের সঙ্গেই সম্মতি জানাইয়াছিল।

কিন্তু বিনয়বাবু যখন কলিকাতার বাস একেবারে তুলিয়া দিয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, তখন সুহাসিনী জোরের সহিত বলিল, না, তা হতে পারে না। বাড়ি ছাড়া হবে না। কাহারও অত্যাচারে দেশত্যাগী হইয়াছে, এ অপমানের গ্লানি এত বড় দুঃখের পরও সে কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবে না।

সুহাসিনীর মনের ভাব বিনয়বাবুকে বুঝিলেন কিনা বলা যায় না, কিন্তু তিনি আর কোন কথা। বলিলেন না। বাড়িওয়ালাকে ছয় মাসের অগ্রিম ভাড়া দিয়া দরজায় তালা লাগাইয়া একদিন অপরাহ্নে পিতাপুত্রী বাহির হইয়া পড়িলেন।

মধুপুর ও দেওঘরে কিছুদিন কাটিল। কিন্তু সাঁওতাল পরগণার জলহাওয়ায় সুহাসিনীর শরীর আরও ক্ষীণ ও দুর্বল হইতেছে দেখিয়া ভীত বিনয়বাবু সাঁওতাল পরগণা ত্যাগ করিয়া বেহার-প্রান্তে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার নিজের শরীরও ক্রমশ অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িতেছিল। সংসারের ভাবনা ভাবা যাঁহার কখনও অভ্যাস ছিল না, বৃদ্ধবয়সে এই দুশ্চিন্তা, উৎকণ্ঠা ও দুঃখের গুরুভার তাঁহার দেহ-মনকে যেন জাঁতায় পিষিয়া গুঁড়া করিয়া দিতে লাগিল। তাঁহার পুরাতন হাঁপানির রোগ পুনঃপুনঃ দেখা দিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু তিনি নিজের দেহকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া একমাত্র সুহাসিনীর কথা ভাবিয়া তাহাকে কি করিয়া একটু সুস্থ দেখিবেন, এই চিন্তাতেই মগ্ন হইয়া রহিলেন।

এইরূপ উদ্দেশ্যহীনভাবে নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়া মাস তিন-চার কাটিয়া গেল। দশ-পনেরো দিনের বেশী কোথাও মন টিকে না, তাই নূতন নূতন স্থানের সন্ধানে ইহারা প্রায় ঊর্ধ্বশ্বাসে সমস্ত ভারতটা নিঃশেষ করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু যে বস্তুর সন্ধানে ফিরিতেছিলেন, সেই শান্তির দর্শন পাওয়া তো দূরের কথা, এই অবিশ্রাম যাযাবর বৃত্তি তাঁহাদের মনকে আরও অস্থির উদ্ভ্রান্ত করিয়া তুলিল। সুহাসিনীর মুখে আবার হাসি ফুটিল বটে, কিন্তু সে হাসি এতই নিস্তেজ ও ম্রিয়মাণ যে তাহা দেখিয়া বিনয়বাবুর চোখ ফাটিয়া জল আসিয়া পড়িত। সুহাসিনী যে তাঁহাকে খুশি করিবার জন্যই হাসিবার চেষ্টা করিতেছে এ কথা সরলচিত্ত বিনয়বাবুর কাছে গোপন থাকিত না।

www.bengaliebook.com
সূচিপত্র

মানুষের সঙ্গ ছাড়িয়া যাহারা দূরে থাকিতে ইচ্ছা করে, তাহাদের পক্ষে বিদেশে অজ্ঞাতবাস হয়তো শান্তিদায়ক হইতে পারে, কিন্তু নিজের মনের নিকট হইতে যাহারা পালাইতে চাহে, তাহাদের পক্ষে নিঃসঙ্গতা যে কিরূপ ভয়াবহ অবস্থা তাহা যাহারা ভোগ করিয়াছে তাহারাই জানে।

শারদীয়া পূজা কখন আসিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল, সুদূর প্রবাসে বিনয়বাবু ও সুহাসিনী তাহা ভাল করিয়া জানিতেও পারিলেন না। হেমন্ত শেষ হইয়া শীত আসিল। তখন একদিন সুহাসিনী হঠাৎ বলিল, চল বাবা, দেশে ফিরি।

বিনয়বাবু ব্যাকুলভাবে কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, যাবি মা? তবে তাই চল,—এ আর ভাল লাগছে না।

পিতার শীর্ণ মুখের এই আর্ত আগ্রহ দেখিয়া সুহাসিনী কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল, ঘুরে ঘুরে তোমার শরীরে যে কিছু নেই বাবা, চল বাড়ি যাই।

বিনয়বাবু নিজেকে সংবরণ করিয়া বলিলেন, না না, আমার শরীরের জন্য তো ভাবনা নয়, তোকে সারাতে পারলুম না, এই দুঃখ। ভেবেছিলুম, নানা দেশ দেখে বেড়ালে তোর শরীরটাও ভাল হবে—

চোখ মুছিয়া সুহাসিনী বলিল, না, বাবা, আর পালিয়ে বেড়াব না। বাড়ি গেলে তোমারও শরীর ভাল হবে, আমিও ভাল থাকব। সেখানে করবী আছে—দীনবন্ধুকাকা আছেন—

দীনবন্ধুর কথায় বিনয়বাবু বলিলেন, ভাল কথা, কাল দীনবন্ধুর একখানা চিঠি পেয়েছি। চিঠিখানা অনেক জায়গা ঘুরে কাল এসে পৌঁছেছে।

কী লিখেছেন কাকাবাবু?

লিখেছে বড়দিনের ছুটিতে সে কাশী আসবে, আমরাও যদি যাই তাহলে দেখা হতে পারে।

তবে তাই চল বাবা, কাশী হয়ে বাড়ি যাওয়া যাক। আজ তো ডিসেম্বর মাসের তেইশে।

সেইদিন যাত্রা করিয়া দুইজনে যথাসময়ে কাশী পৌঁছিলেন। কাশীতে পরিচিত লোকের অভাব ছিল না—একজন বন্ধুর বাড়িতে গিয়া উঠিলেন। দীনবন্ধুরও সেইখানেই উঠিবার কথা, কিন্তু

জানিতে পারা গেল যে অকস্মাৎ স্ত্রী পীড়িত হইয়া পড়ায় তিনি আসিতে পারিলেন না।

বন্ধুর উপরোধে বিনয়বাবুকে দু-তিন দিন কাশীতে থাকিয়া যাইতে হইল। কাশী ছাড়িবার আগের দিন দুপুরবেলা তিনি সুহাসিনীকে লইয়া সারনাথ দেখিতে গেলেন। সেখানে যাহা ঘটিল পূর্ব অধ্যায়ে তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

কিশোর ও করবীকে ঐরূপ অবস্থায় দেখিবার পর সুহাসিনী যখন টলিতে টলিতে বিনয়বাবুর কাছে ফিরিয়া গিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার মুখ দেখিয়া বিনয়বাবু ভয় পাইয়া গেলেন। কিন্তু কোন কথা উত্থাপন করিবার পূর্বেই সুহাসিনী ক্লিষ্টস্বরে বলিল, বাবা, ভারি শরীর খারাপ বোধ হচ্ছে—ফিরে চল।

সমস্ত পথটা বিনয়বাবু উদ্বিগ্নভাবে প্রশ্ন করিতে করিতে ও দুর্বল সুহাসিনীকে এইখানে টানিয়া আনার জন্য পরিতাপ করিতে করিতে গেলেন। সুহাসিনী কিন্তু কাঠের মত শক্ত হইয়া বসিয়া রহিল, পিতার সব কথা তাহার কানেও গেল না। আজ এই অজ্ঞাত স্থানে কিশোর ও করবীর সঙ্গে এমনভাবে দেখা হইবে তাহা কে ভাবিয়াছিল? তাহারা দুজনে যে ভাবে দাঁড়াইয়াছিল, তাহার একটি মাত্র অর্থ হয়, দ্বিতীয় অর্থের অবকাশ নাই। কিন্তু সাধারণের সহজগম্য প্রকাশ্য স্থানে এরূপ কদর্য নির্লজ্জতা কিশোরের পক্ষে স্বাভাবিক হইতে পারে, করবী তাহাতে যোগ দিল কী করিয়া? ঘৃণায় সুহাসিনীর শরীর কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। ব্যভিচারীরা কি স্থান অস্থান বিচার করে না? তাহাদের প্রবৃত্তি কি এতই প্রবল যে, দুর্নীতির আচরণ সাধারণ লোকলজ্জাও তাহার স্বচ্ছন্দে বিসর্জন দিতে পারে?

কিন্তু করবী? করবীকে সে ছেলেবেলা হইতে জানে। বিলাতী স্কুলে পড়ার ফলে সে একটু চটুলস্বভাব ও ফাজিল হইয়া পড়িয়াছে বটে, কিন্তু মন্দ সে তো নহে। তবে কি তাহার

সরল প্রকৃতির সুযোগ বুঝিয়া এক বিবেকহীন লম্পট তাহার সর্বনাশ সাধনের চেষ্টা করিতেছে? করবী ও কিশোরের বাহুবদ্ধ যুগ্মমূর্তির চিত্র তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। উঃ, কি নির্ভরশীলতাই করবীর আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আর কিশোরের মুখে কোন ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল। নিষ্ঠুর শিকারী এমনই কপট উৎকণ্ঠার ভাব দেখাইয়া বুঝি নির্বোধ নারীকে নিজের ফাঁদে টানিয়া আনে।

এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে সুহাসিনী বাসায় গিয়া পৌঁছিল এবং একেবারে নিজের ঘরে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িল। চোখ বুজিয়া সে মন হইতে এই চিন্তাটাকে তাড়াইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু রক্তপায়ী জোঁকের মত তাহারই মর্মরুধিরে স্ফীত হইয়া চিন্তাটা তাহার মনে জুড়িয়া রহিল; যন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে সে ভাবিতে লাগিল,কেন এমন হয়? যাহার সহিত চিরদিনের জন্য ছাড়াছাড়ি হইয়া গিয়াছে, যাহাকে সে দুর্নীতিপরায়ণ চরিত্রহীন বলিয়া জানে, তাহাকে অন্য স্ত্রীলোকের সহিত দেখিয়া তাহার অন্তদাহ আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিতেছে কেন? যে লম্পট, সে যদি স্ত্রীলোকের সর্বনাশ করে তাহাতে বিস্ময়ের কী আছে? এবং তাহারই বা কী আসে যায়? এমন তো পৃথিবীতে কত হইতেছে। তবে কি শুধু করবীর অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়াই তাহার এই অন্তদাহ?

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে সে সঙ্কল্প করিয়া শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। করবীকে সাবধান করা দরকার। মুখে চোখে জল দিয়া বেশভূষার সামান্য পরিবর্তন করিয়া বিনয়বাবুর কাছে গিয়া বলিল, চল বাবা, করবীর মামার বাড়ি বেড়িয়ে আসি! কাল তো আর দেখা করবার সময় হবে না। হয়তো করবীরাও এসে থাকবে।

সুহাসিনীর শরীর লক্ষ্য করিয়া বিনয়বাবু দু-একবার আপত্তি করিলেন, কিন্তু তাহার আগ্রহাতিশয্য দেখিয়া শেষে গাড়ি ডাকাইয়া দুইজনে বাহির হইয়া পড়িলেন। করবীর মামার ঠিকানা পূর্ব হইতেই জানা ছিল, সেখানে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন, করবী ও প্রমদাবাবু সম্প্রতি আসিয়াছেন। প্রমদাবাবু বাড়ি আছেন বটে কিন্তু করবী সারনাথ দেখিতে গিয়াছে, তখনও ফিরে নাই। বিস্মিত আনন্দিত বিনয়বাবু বৈঠকখানায় প্রমদাবাবুর সহিত কথাবাতা কহিতে লাগিলেন, সুহাসিনী অন্দরমহলে গেল। করবীর মা তাহাকে হাত ধরিয়া নিজের কাছে বসাইয়া কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। করবীর মামীদের সঙ্গে সুহাসিনীর পরিচয় ছিল না, তাঁহাদের সঙ্গেও আলাপ হইল। করবীর মা সুহাসিনীর মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া গভীর সমবেদনার সহিত বলিলেন, শরীরে যে তোর কিছুই নেই, সুহাস। এত দেশ বেড়ালি, তবু শরীর সারল না?

মলিন হাসিয়া সুহাসিনী শুধু ঘাড় নাড়িল। করবীর মা ভিতরের সব কথাই জানিতেন, তাই কেবল একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। তাঁহার মন উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। কিশোর ও বিমলা যে এখানে আছে, তাহা সুহাসিনী জানে না; তাহারা ফিরিলে অন্তত বিমলার সহিত সুহাসিনীর সাক্ষাৎ অনিবার্য। তখন কী ঘটিবে, এই ভাবিয়া তাঁহার মন সঙ্কোচে ও আশঙ্কায় পূর্ণ হইয়া উঠিল।

বাহিরে মোটরের শব্দ হইল, পরক্ষণেই করবী দ্রুতপদে ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। অনেক দিন পরে দুই সখীতে দেখা কিন্তু কেহই সহজভাবে সম্ভাষণ করিতে পারিল না, কোথায় যেন বাধিয়া গেল। অপ্রতিভ ও ঈষৎ সঙ্কুচিতভাবে দুজনে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া

রহিল, তারপর করবী জোর করিয়া হাসিয়া সুহাসিনীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, হাসিদি,কদ্দিন পরে তোমাকে দেখলুম ভাই! মনে হচ্ছে যেন পাঁচ বছর।

সুহাসিনী অল্প হাসিল, কিন্তু করবীর কথাগুলা যে সহজ এবং স্বচ্ছন্দ নয়, বরং জোর করিয়া সহৃদয়তা দেখাইবার চেষ্টা, তাহা বুঝিতে তাহার বাকি রহিল না। ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ করিয়া সুহাসিনীর বুকের ভিতরটা টনটন করিয়া উঠিল। তবু সে যথাসাধ্য স্বাভাবিক সুরে বলিল, সারনাথ দেখতে গিয়েছিলি, আগে দেখিসিনি বুঝি? কেমন দেখলি?

বেশ ভাল। চল এখন আমার ঘরে। বলিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে নিজের ঘরে লইয়া চলিল।

নিজের ঘরে লইয়া গিয়া সুহাসিনীকে খাটের উপর বসাইয়া করবী অনেকক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। শেষে একটা বুকভাঙা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, ধন্যি মেয়ে তুমি! এসো, একটু পায়ের ধুলো নি। বলিয়া সত্য সত্যই হাত বাড়াইয়া সুহাসিনীর পায়ে হাত দিয়া মাথায় ঠেকাইল।

বিস্মিত হইয়া সুহাসিনী বলিল, ও আবার কী! ও কী করছিস?

করবী পূর্বের মত আবার জোর করিয়া হাসিতে লাগিল, বলিল, কিছু না। তোমার পায়ে ধুলো নিলে পুণ্যি হয়, তাই একটু নিলুম। বোসো, এই কাপড়-চোপড়গুলো ছেড়ে ফেলি ভাই।

করবী কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিল, সুহাসিনী চুপ করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। অন্তরের সত্যকার কথাটা গোপন রাখিবার জন্যই করবী এত বাজে বকিতেছে, তাহাতে সংশয় নাই, কিন্তু তবুও সুহাসিনীর মনে একটা খটকা বাজিতে লাগিল। সে যাহা সন্দেহ করিয়াছে তাহা নহে, করবী যেন অন্য কিছু লুকাইবার চেষ্টা করিতেছে!

নিঃসংশয় হইবার উদ্দেশ্যে সুহাসিনী এক সময় জিজ্ঞাসা করিল, একলা সারনাথে গিয়েছিলি, না সঙ্গে আর কেউ ছিল?

করবীর মুখখানা হঠাৎ জবাফুলের মত লাল হইয়া উঠিল। সে একটা গরম জামা পরিয়া তাহার বুকের বোম লাগাইতেছিল, মুখ না তুলিয়াই বলিল, এ দিকের শীত কী বিশ্রী দেখেছিস ভাই, যেন হাড় পর্যন্ত কালিয়ে দেয়। কলকাতায় শীত অন্য রকম-বেশ মোলায়েম। তুই যাই বলিস, আমার কিন্তু এত শীত ভাল লাগে না। ভাল জামাকাপড় পরবার জো নেই; দেখ না, এই মোটা গরম জামাটা গায়ে দিলেও শীত ভাঙে নাবলিতে বলিতে সে যেন সুহাসিনীর প্রশ্নটা শুনিতেই পায় নাই এমনিভাবে তাহার পাশে আসিয়া বসিল।

সুহাসিনী স্থির দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, কী হয়েছে তোর?

কী হবে আবার! কিছু না করবী তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া লইয়া অন্য একটা প্রসঙ্গ উত্থাপনের চেষ্টা করিল। কিন্তু সুহাসিনী হাত দিয়া তাহার মুখ নিজের দিকে ফিরাইয়া বলিল, কিছু না তবে অমন করছিস কেন? আমার পানে চোখ তুলে তাকা দেখি।

করবী চোখ তুলিয়া তাকাইল বটে, কিন্তু সুহাসিনীর চোখের সহিত বেশীক্ষণ চোখ মিলাইয়া রাখিতে পারিল না। চোখ আপনি নত হইয়া পড়িল। পরমুহূর্তেই সে হঠাৎ সুহাসের কোলের উপর মুখ খুঁজিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। আত্মনিগ্রহ এবং পরকে প্রতারণা একসঙ্গে আর তাহার দ্বারা সম্ভব হইল না।

সুহাস দুই হাতে তাহার মুখ তুলিয়া ধরিয়া বলিল, কী হয়েছে আমায় বল।

উঠিয়া করবী ঘনঘন চোখ মুছিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে একটু শান্ত হইয়া ভারী গলায় বলিল, হসিদি, পুরুষের হাতে তুমিও কম লাঞ্ছনা সহ্য করনি, কিন্তু আমার লজ্জা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। ভিক্ষে চাইবার দুর্মতি তো তোমার কখনও হয়নি!

সুহাসিনীর মুখ সাদা হইয়া হইয়া গেল, সে দুই হাতে করবীর হাত শক্ত করিয়া ধরিয়া বলিল, কী বলছিস, স্পষ্ট করে বল।

করবী তিক্ত হাসিয়া বলিল, একজনের কাছে যেচে ভালবাসা চাইতে গিয়েছিলুম। সে তার উপযুক্ত জবাব দিয়েছে, ভিক্ষে যে চাইলেই পাওয়া যায় না, তা বুঝিয়ে দিয়েছে। হাসিদি, আজ আমার গলায় দড়ি দিয়ে মরতে ইচ্ছে করছে, কেন আমার এ দুর্বুদ্ধি হল? আমি

যেচে নিজেকে তার পায়ে ফেলে দিলুম আর সে আমাকে নিলে না! আমার দিকে ভাল করে চেয়ে দেখতে হাসিদি, সত্যিই কি আমি ফেলে দেবার মত? কিছু কি আমার নেই? অশ্রুসিক্ত মুখখানা করবী সুহাসিনীর মুখের কাছে তুলিয়া ধরিল।

সুহাসিনীর মাথা ঘুরিতে লাগিল, চোখে ভাল দেখিতে পাইল না। কিশোর করবীর ভালবাসা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। এই লজ্জাই করবী এতক্ষণ লুকাইবার চেষ্টা করিতেছিল। তবে সারনাথের সেই যুগ্মমূর্তির সে যে অর্থ করিয়াছিল, তাহা ভুল! কিশোর করবীকে প্রলুব্ধ করে নাই! কিন্তু তবু সংশয় দূর হইল না, সে ব্যাকুলস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, কে—কে সে, করবী,—যে তোকে নিলে না?

করবী বলিল, মরে গেলেও তার নাম বলতে পারব না। তুমি কখনও জানতে চেয়ো না, হাসিদি! আমার ওপর যদি তোমার এতটুকু দয়া থাকে, ঐ লজ্জা থেকে আমাকে রেহাই দিও।

কিন্তু রেহাই পাওয়া করবীর ভাগ্যে ছিল না। এই সময় সুরেন দ্বার ঠেলিয়া বলিতে বলিতে ঘরে ঢুকিল, করি-দি, কিশোরবাবু চলে গেলেন, বৌদিদিও চলে গেলেন। এখান থেকে সটান আগ্রা যাবেন। কিশোরবাবু বললেন—ওঃ— আর একজন অপরিচিত স্ত্রীলোক করবীর নিকট বসিয়া আছে দেখিয়া সুরেন থামিয়া গেল। অপ্রস্তুতভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে ঘর হইতে বাহির হইয়া দরজা ভেজাইয়া দিল।

একবার নিমেষের জন্য সুহাসিনীর সঙ্গে করবীর চোখাচোখি হইল। তারপর করবী বিছানার উপর শুইয়া পড়িয়া বালিশের মধ্যে মুখ খুঁজিয়া অসহ্য রোদনোচ্ছ্বাস দমন করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতে লাগিল।

মৃন্ময়মূর্তির মত সুহাসিনী বসিয়া রহিল। আর একদিনের কথা তাহার স্মরণ হইল, যেদিন কলিকাতায় ড্রয়িংরুমে মূর্ছা ভাঙিয়া সে দেখিয়াছিল করবী তাহার মাথা কোলে লইয়া বসিয়া আছে। অবস্থার আজ সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইয়াছে। কিন্তু সুহাসিনী একটা হাত নাড়িয়াও সেদিনকার ঋণ শোধ দিতে পারিল না। তাহার মুখ হইতে সান্ত্বনা বা সহানুভূতির বাণী যে বিদ্রূপের চাবুকের মত করবীর গায়ে বাজিবে, তাহা বুঝিয়া সে নির্বাক বেদনায় পাংশু রক্তহীন মুখে বসিয়া রহিল। কেবল তাহার দুই চক্ষু বাহিয়া নিঃশব্দে অশ্রুর ধারা ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

২২

শুক্তির অন্তরস্থিত মুক্তার লোভে সমুদ্রে ডুব দিয়া যাহারা শুন্য ঝিনুকটা হাতে করিয়া কুলে ফিরিয়া আসে, অনুপমচন্দ্রের অবস্থাটা প্রায় তাহাদের মত হইয়াছিল। কিশোরকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বিজিত ভূমি দখল করিতে গিয়া সে দেখিল, দখল করিবার মত কিছুই নাই,—যাহা ছিল, যুদ্ধের অগ্নিকাণ্ডে পুড়িয়া জ্বলিয়া নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে।

অনুপম ভাবিয়াছিল, ধাক্কা খাইয়া সুহাসিনীর মন তাহার দিকেই ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু তাহা যখন হইল না, বরঞ্চ বিপরীত ফলই দেখা গেল, তাহার প্রতি সুহাসিনীর চিত্তের বিরূপতা আরও গভীর ও অন্তর্মুখী হইয়া অস্থিমজ্জায় আশ্রয় লইল, তখন ব্যর্থ ও ক্রোধান্ধ অনুপমও তাহাকে যেন কোন প্রকারে পাইবার জন্য মনে মনে জিদ ধরিয়া বসিল! যতই মনে হইতে লাগিল, সুহাসিনীর মন সে কোন দিন পাইবে না, পাইবার আকাঙক্ষা ততই তাহার উগ্র ও দুর্নিবার হইয়া উঠিতে লাগিল।

এ দিকে অনুপমের জননী হেমাঙ্গিনী কিন্তু উল্টা সুর ধরিলেন। এতদিন তিনি অনুপমের সঙ্গে সুহাসিনীর বিবাহ ঘটাইবার জন্য উদগ্রীব ছিলেন, সে জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু যে মেয়ে। আর একজনকে ভালবাসে বলিয়া জানাজানি হইয়া গিয়াছে এবং যাহাকে লইয়া এত বড় একটা প্রকাশ্য সামাজিক কেলেঙ্কারি ঘটিয়া গেল, তাহাকে পুত্রবধুরূপে কোন বর্ষীয়সী রমণীই কামনা করেন না—তা সে অন্য দিক দিয়া যতই লোভনীয় হউক। অন্য পুরুষের হৃদয়হীন বিশ্বাঘাতকতার কথা চিন্তা করিয়া যে কুমারী দিন দিন শীর্ণ হইয়া যাইতেছে, জানিয়া শুনিয়া তাহাকে বধুরূপে ঘরে আনিবার মত উদারতা

হেমাঙ্গিনীর ছিল না। তিনি একদিন এই কথাটাই ইঙ্গিতে অনুপমকে বুঝাইবার। চেষ্টা করিলেন। কিন্তু অনুপমচন্দ্র মাতার ইঙ্গিত সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া নিজের পথে চলিতে লাগিল। তখন হেমাঙ্গিনী তাহাকে স্পষ্ট করিয়া, ধমক দিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে পরের পরিত্যক্তা কন্যার পশ্চাতে ধাবমান হওয়ার মত নির্লজ্জ নির্বুদ্ধিতা অতি অল্পই আছে; ভাবিয়া দেখিতে গেলে সুহাসিনীকে পুনর্ভু বলিলেও অন্যায় বলা হয় না এবং এত সত্ত্বেও সে যদি তাহাকে বিবাহ করিতে চায়, তাহা হইলে অন্তত তিনি কখনই এরূপ বধুকে ঘরে স্থান দিতে পারিবেন না, অনুপম যেন অন্য ব্যবস্থা করে।

অনুপম তাহার পুরুষ-স্বভাব মাতাকে অত্যন্ত ভয় করিত, তাই ভিতরে গর্জন করিতে থাকিলেও মুখে কোন কথা না বলিয়া মাতার অনুশাসন একপ্রকার স্বীকার করিয়া লইল।

তারপর বিনয়বাবু কন্যাকে লইয়া কলিকাতা ছাড়িয়া গেলেন, কিছুকাল আর তাঁহাদের কোন উদ্দেশই পাওয়া গেল না।

চারিমাস পরে হঠাৎ একদিন অনুপম সংবাদ পাইল, বিনয়বাবু সকন্যা দেশে ফিরিয়াছেন। সে তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের সঙ্গে দেখা করিতে ছুটিল।

মাত্র আগের দিন বিনয়বাবু আসিয়া পৌঁছিয়াছেন; বাসার আসবাবপত্র তখনও ভাল করিয়া গোছানো হয় নাই। অনুপম ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করিয়া দেখিল, দীনবন্ধুবাবুও রহিয়াছেন।

বিনয়বাবু শীর্ণ অসুস্থ মুখে হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, এসো, অনুপম।

অদূরে আর একটা চেয়ারে সুহাসিনী বসিয়া ছিল, সে নড়িয়া চড়িয়া বসিল। দীনবন্ধু কটমট করিয়া একবার অনুপমের দিকে চাহিয়া কুঞ্চিত করিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

ঘরের আবহাওয়া অনুকূল নহে বুঝিয়া অনুপম যতদূর সম্ভব সপ্রতিভভাবে আসন গ্রহণ করিয়া কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। একবার সুহাসিনীকেও বোধ করি স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সুহাসের দিকে চাহিয়া প্রশ্নটা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। মামুলিভাবে কিছুক্ষণ কথাবার্তা চলিল। ও পক্ষ হইতে বিনয়বাবুই কেবল কথা কহিলেন, ঘরের আর দুইজন মুখ টিপিয়া বসিয়া রহিলেন।

এলোমেলোভাবে প্রায় মিনিট পনেরো আলাপ চলিবার পর বিনয়বাবু ক্লান্ত হইয়া থামিয়া গেলেন। তখন অনুপম একলাই বাক্যালাপের চেষ্টাকে প্রাণপণে ঠেলিয়া লইয়া চলিল, কিন্তু পাঁচজনের সম্মিলিত উদ্যমে যাহা স্বচ্ছন্দে চলে, একাকী তাহাকে টানিয়া লইয়া যাওয়া সহজ নহে। অনিচ্ছুক তিনজন শ্রোতাকে অনুপম তাহার জীবনে গত চারমাসে যাহা ঘটিয়াছে তাহার অধিকাংশই একটানাভাবে বলিয়া গেল। কিন্তু কোন দিক হইতে লেশমাত্র উৎসাহ বা অনুমোদন না পাইয়া শেষ পর্যন্ত দম ফুরাইয়া-যাওয়া কলের ইঞ্জিনের মত তাহাকে চুপ করিতে হইল।

দীনবন্ধু ও সুহাসিনীর যত্নকৃত কঠিন নীরবতা অনুপমকে ভিতরে ভিতরে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল, কিন্তু এমন একটা আলোচনার বিষয়ও সে খুঁজিয়া পাইতেছিল না যাহার মধ্যে এই দুইজনকে আকর্ষণ করিয়া আনা যাইতে পারে। মিনিট দুই-তিন চুপ করিয়া জানালার বাহিরে তাকাইয়া থাকিবার পর হঠাৎ একটা নূতন প্রসঙ্গের সূত্র পাইয়া সে বলিয়া উঠিল, পাশের বাড়ির দরজায় তালা লাগানো দেখছি। মহাপ্রভু গেলেন কোথায়? বাসা ছেড়ে দিয়েছেন না কি?

বলিয়া ফেলিয়াই অনুপমকে অনুতাপ করিতে হইল। এ প্রসঙ্গ এরূপ সময় উত্থাপন করা যে ঘোরতর নির্বুদ্ধিতার কাজ হইয়াছে, কিশোর বা তৎসম্পর্কীয় কোন কথা না বলাই যে সবদিক দিয়া শোভন ও নিরাপদ হইত, তাহা সে অন্তরে অন্তরে অনুভব করিল। কিন্তু অনুভব করিলেও কথাটা। ফিরাইয়া লইবার তখন আর উপায় ছিল না। সুহাসের মুখ ধীরে ধীরে লাল হইয়া উঠিতেছিল। দীনবন্ধুবাবু গভীরতর ভ্রুকুটি করিয়া নিজের মোটা লাঠিটার মুঠের দিকে চাহিয়া ছিলেন, বিনয়বাবুর শীর্ণ মুখখানা যেন আরও পীড়িত হইয়া উঠিয়াছিল। তবু অনুপম চুপ করিয়া যাইতে পারিল না, সে মরিয়াভাবে ভূলের পথেই অগ্রসর হইয়া চলিল। পিছু হটিবার স্থান যেখানে সঙ্কীর্ণ, সেখানে একজাতীয় লোক বিপদ জানিয়াও গোঁ-ভরে সম্মুখদিকে চলে, স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। অনুপমও কাহারও নিকট হইতে কোন উত্তর না পাইয়া মুখখানাকে হাসি-হাসি করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, পালিয়েছে নাকি? যাক, তবু ভাল, ভদ্রলোকের পাড়ায় যে ওসব চলে না সেটা বুঝতে পেরেছে। কিন্তু গেল কোথায়?

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে সুহাস হঠাৎ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কোন কথা না বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

অনুপমের মুখখানা নিজের অজ্ঞাতসারে কালো হইয়া উঠিয়াছিল, সুহাস চলিয়া যাইবার পর কিছুক্ষণ হিংসাপূর্ণ দৃষ্টিতে সেই দিকে তাকাইয়া থাকিয়া সে দীনবন্ধুবাবুর দিকে ফিরিল, মনের সমস্ত বিষ তাঁহার মাথায় উদগিরণ করিয়া দিয়া বলিল, আপনার সঙ্গে তো ভারি প্রণয় ছিল, রাত নেই দিন নেই যাতায়াত করতেন। আপনি জানেন, ভাজটিকে নিয়ে গেল কোথায়? বস্তি-টস্তিতে গিয়ে উঠেছে না কি?

এবার দীনবন্ধুবাবু একেবারে অগ্নিকাণ্ডের মত জ্বলিয়া উঠলেন, চোপরাও বেয়াদব নচ্ছার কোথাকার! জুতিয়ে মুখ ছিড়ে দেব।–বেরোও—বেরোও তুমি এখনি এ বাড়ি থেকে, নইলে দারোয়ান ডেকে ঘাড় ধরে বার করে দেব। বলিয়া তিনি হাতের স্থূল যষ্টিটা সজোরে মাটিতে ঠুকিতে লাগিলেন।

অনুপম চেয়ার হইতে ছিটকাইয়া উঠিয়া চিৎকার করিয়া বলিল, কি! আমাকে আপনি বেরিয়ে যেতে বলেন। আপনি কে আর ইউ? এই বাড়ি আপনার নয়, বিনয়বাবুর, সে কথা মনে রাখবেন।

দীনবন্ধু লাঠি ঠুকিতে ঠুকিতে বলিলেন, এ বাড়ি আমার, এখানে আমি যা বলব তাই হবে। তুমি এই দণ্ডে এখান থেকে বেরোও, ছোকরা। ফের যদি কখনও মাথা গলাবার চেষ্টা করেছ, তাহলে তোমাকে চাবকে লাল করে দেব। যাও।

বিনয়বাবু অসহায়ভাবে চেয়ারে হেলান দিয়া পড়িয়াছিলেন, ক্ষীণকণ্ঠে কেবল বলিলেন, দীনবন্ধু! দীনবন্ধু!

দীনবন্ধু ধমক দিয়া বলিলেন, আপনি চুপ করুন। এই শয়তানটাই যত নষ্টের গোড়া। শুরু থেকে ষড়যন্ত্র পাকিয়ে পাকিয়ে আজ আপনাদের এমন অবস্থা করেছে–damned villain। আপনার যদি এতটুকু মনের জোর থাকত অনেক আগেই এটাকে দূর করে দিতেন। কিন্তু তা যখন আপনি পারবেন না, তখন আমাকেই এ কাজ করতে হবে।যাও, বিদেয় হও এখন। বলিয়া অনুপমকে লাঠি দিয়া দরজা নির্দেশ করিয়া দিলেন।

অনুপম তথাপি কী একটা বলিবার উদ্যোগ করিতেছে দেখিয়া তিনি একেবারে হুঙ্কার ছাড়িলেন, যাবে না? ভাল কথার কেউ নয় বটে। দারোয়ান! ইধার আও।

দাঁতে দাঁত ঘষিয়া অনুপম বলিল, আচ্ছা—এ অপমান আমি ভুলব না—আমিও দেখে নেব– বলিতে বলিতে ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেল।

দীনবন্ধু বলিলেন, আজ আমার প্রাণটা ঠাণ্ডা হল। সেই দিন থেকে আমি আক্রোশ পুষে রেখেছিলুম—যেদিন ও কতকগুলো মিথ্যে কথা বলে সুহাস-মায়ীর মন ভেঙে দিয়েছিল।

বিনয়বাবু মাথা তুলিয়া বলিলেন, মিথ্যে কথা, দীনবন্ধু? তুমি বলতে চাও মিথ্যে কথা?

হ্যাঁ, মিথ্যে কথা, ওর এক বর্ণ সত্যি নয়। আর মিথ্যে কথা বলে এতখানি অনিষ্ট বোধ হয় আজ পর্যন্ত কেউ করেনি।

কিন্তু তার বাপের চিঠি–

বাপের ছেড়ে তিপন্ন পুরুষের চিঠি যদি থাকত, তবুও কথা মিথ্যে হত। কিন্তু সে ভেবে আর কী হবে বলুন, এখন তো আর কোন উপায় নেই।

বিনয়বাবু একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। ঘরের ভিতরটা অন্ধকার হইয়া আসিতেছিল, কিছুক্ষণ দুজনে মৌন হইয়া রহিলেন।

শেষে আর একটা শ্রান্তিভারাক্রান্ত নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিনয়বাবু বলিলেন, দেখ দীনবন্ধু, আমি বোধ হয় আর বেশী দিন বাঁচব না। আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে, ভিতরে ভিতরে বুঝতে পারছি। কিন্তু সে জন্য তো ভাবি না, শুধু এই ভয় হয়, মেয়েটার কোন বিধিব্যবস্থা না করেই যদি মরে যাই। তুমি দেখো, দীনবন্ধু। জান তো, তুমি ছাড়া আমার আপনার বলবার কেউ নেই।

মৃদু তিরস্কারের সুরে দীনবন্ধু বলিলেন, এ সব আপনি কী যা তা বলছেন! শরীরটা একটু খারাপ যাচ্ছে, তারপর মানসিক ক্লেশেরও অভাব নেই, তাই যত সব বাজে কথা মনে আসছে। ও চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলুন—এখনও দীর্ঘ জীবন আমাদের সামনে পড়ে রয়েছে—আমি তো ও-সব ভাবনা এখনও মনে আনতে পারি না, আর আপনি আমার

চেয়ে কতই বা বড় হবেন? বড় জোর দু-তিন বছরের! এরি মধ্যে ও-সব দুশ্চিন্তা কেন? শুধু রেলে ঘুরে ঘুরে শরীরটা কাহিল হয়ে পড়েছে বৈ তো নয়, দুদিন পরে আবার দেখবেন সব ঠিক হয়ে গেছে।

বিনয়বাবু আস্তে আস্তে বলিলেন, তাই হবে বোধ হয়। ঘুরে বেড়ানোও তত কম হয়নি। তার ওপর সুহাসের জন্য মনটা সর্বদাই–

মৃত্যুর কথা ভাবলেই মৃত্যুকে কাছে ডেকে আনা হয়। ও সব কথা যাক। আজ সন্ধ্যা হয়ে গেছে, আজ আর কাজ নেই, কাল থেকে আবার আমাদের পুরনো ঈভনিং ওয়াক আরম্ভ করা যাবে। এখন বরঞ্চ আপনি কিছুক্ষণ বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম করে নিন গে। বলিয়া দীনবন্ধু সুহাসকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সুহাস আসিলে বিনয়বাবু তাহার সঙ্গে দোতলায় নিজের শয়নকক্ষে উঠিয়া গেলেন।

দীনবন্ধু আরও কিছুক্ষণ চিন্তিতভাবে অন্ধকার ঘরের মধ্যে বসিয়া রহিলেন, তারপর লাঠিটা তুলিয়া লইয়া উঠিবার উপক্রম করিতেই মৃদু কণ্ঠের কাকাবাবু শুনিয়া চকিতে ফিরিয়া দেখিলেন, সুহাসিনী কখন নিঃশব্দে তাঁহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

সুহাস-মায়ী! কী মা!

সুহাসিনী তাঁহার চেয়ারের পিঠ ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, অন্ধকারে তাহার মুখ ভাল দেখা গেল না। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সে অতি ক্ষীণকণ্ঠে যেন কথাগুলা গুনিয়া গুনিয়া বলিল, কাকাবাবু, আপনার কি মনে হয় আমি ভুল করেছি?

প্রথমে দীনবন্ধু প্রশ্নটা ঠিক ধরিতে পারিলেন না, তারপর বুঝিতে পারিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, হ্যাঁ মা, ভুল করেছ। বড় ভুল করেছ।

সুহাসের নিকট হইতে অস্ফুট শব্দ আসিল, কিন্তু—

দীনবন্ধু বলিলেন, ওর মধ্যে কিন্তু নেই, সুহাস। ভালবাসা আর বিশ্বাস—এ দুটো জিনিস আলাদা করা যায় না। তুমি আলাদা করবার চেষ্টা করেছিলে, তাই আজ এত কষ্ট পাচ্ছ। ভেবে দেখ, আমরা তো আদালত নই যে সাক্ষীসাবুদ নিয়ে তবে যাকে ভালবাসি তাকে বিশ্বাস করব। আর, ওর বিরুদ্ধে তুমি যে প্রমাণ পেয়েছিলে, আমিও তো তাই পেয়েছিলুম। কিন্তু আমি সে কথা বিশ্বাস করতে পারলুম না কেন?

সুহাসিনী রুদ্ধনিশ্বাসে নীরব হইয়া রহিল।

দীনবন্ধু বলিতে লাগিলেন, আমি জানি, কিশোর কখনও ও কাজ করতে পারে না, তাই হাজার প্রমাণেও আমাকে টলাতে পারেনি। মা, তুমি ছেলেমানুষ, কিন্তু আমার পঞ্চাশ বছর বয়স হয়েছে, জীবনের অভিজ্ঞতাও কম সঞ্চয় করিনি। আমি জানি মানুষের চেয়েও তার বিরুদ্ধে প্রমাণকে যারা বিশ্বাস করে, শেষ পর্যন্ত তাদের ঠকতে হয়। কিশোরকে

আমি চিনি, তাই যদি তাকে স্বচক্ষে ব্যভিচার করতে দেখি, তবু আমি আমার চোখকেই অবিশ্বাস করব, তাকে অবিশ্বাস করতে পারব না।

কিন্তু কাকা—

দীনবন্ধু উঠিয়া দাঁড়াইলেন, থাক সুহাস, আর নয়। বিশ্বাস কাউকে জোর করে করানো যায় না, আমিও সে চেষ্টা করব না; আমি শুধু নিজের বিশ্বাসের কথা তোমায় বললুম। কিশোরকে আমি ভালবাসি, তাই আমি তাকে বিশ্বাস করি। আর ঐ মেয়েটি—বিমলা, ওকেও আমি ভালবাসতে। শিখেছি। আমি জানি ওদের ভিতরের সম্বন্ধ ভাইবোনের মত পবিত্র। না, তার চেয়েও বেশী, কারণ। ওদের মধ্যে সত্যিকারের কোন সম্বন্ধ নেই। যে যাই বলুক, ওদের বিষয়ে কোন কুৎসাই আমি কোন দিন বিশ্বাস করতে পারব না।

একটু চুপ করিয়া বলিলেন, ওদের ওপর আমার কতখানি আস্থা তা তোমাকে বোঝানো শক্ত। আমার যদি নিজের মেয়ে থাকত, আমি তাকে কিশোরের হাতে দিয়ে নিজেকে ভাগ্যবান মনে। করতুম। এই বলিয়া তিনি আস্তে আস্তে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

দীনবন্ধুবাবুর শেষ কথাগুলির মধ্যে যে কতখানি অভিমান নিহিত ছিল তাহা সুহাসিনী বুঝিল। তাহার বুক ছিড়িয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইল। দুহাতে মুখখানা চাপিয়া ধরিয়া সে দীনবন্ধুবাবুর পরিত্যক্ত চেয়ারে বসিয়া পড়িল।

কাশীতে করবীর সহিত দেখা হইবার পর তাহার নিম্নাভিমুখী মন ধাক্কা খাইয়া ভিন্ন খাতে বহিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু সন্দেহের বিষ এমনই মারাত্মক বস্তু যে, একবার কোনক্রমে মনকে আশ্রয়। করিলে সেখান হইতে তাহাকে তাড়ানো অতিবড় চিত্তবলশালী লোকের পক্ষেও দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। তাই দীনবন্ধুবাবুর কুণ্ঠাহীন বিচারহীন বিশ্বাসের কথা শুনিয়াও তাহার মন শান্তি পাইল না, বরঞ্চ অনিশ্চয়তার যন্ত্রণায় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

2 3

ইংরাজী নববর্ষের প্রথম দিন সকালে কিশোর বিমলাকে লইয়া কলিকাতায় ফিরিল।

গাড়িতে সারারাত্রি বসিয়া আসিতে হইয়াছে। হাওড়া স্টেশনেও দারুণ ভিড়; মানুষ ও মোটঘাট ঠেলিয়া বাহিরে আসিতেই দীনবন্ধুবাবুর সহিত দেখা হইয়া গেল। তিনি ট্রেন ধরিবার জন্য লাঠিটা কাঁধে ফেলিয়া দ্রুতপদে ছুটিতেছিলেন, কিশোরকে দেখিতে পাইয়া দূর হইতে চিৎকার করিয়া বলিলেন, কি হে, খবর সব ভাল তো? বর্ধমান যাচ্ছি, আর সময় নেই, টিকিট কিনতে হবে—তোমাদের ওদিকটাতে গোলমাল বেধেছে, সাবধানে থেকো–

কিশোর চেঁচাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিসের গোলমাল?

কাগজে পড়নি?—দাঙ্গা–সাবধানে থেকো, আমি চললুম, সময় নেই–কাল সকালেই ফিরব বলিতে বলিতে তিনি প্রবহমান জনতার মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন।

কিশোর ব্যাপারটা ভাল রকম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না, গত কয়েকদিন খবরের কাগজ পড়িবার মত মনের অবস্থা তাহার ছিল না। সে চিন্তিতমুখে ট্যাক্সিতে উঠিল। পথে হ্যারিসন রোডের মোড়ের উপর একখানা বাঙলা দৈনিক কিনিয়া লইয়া তাহার উপর দৃষ্টিপাত করিতে বড় বড় অক্ষরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিবরণ চোখে পড়িল। গত তিন দিন ধরিয়া এই নৃশংস আত্মঘাতী অনুষ্ঠান। চলিতেছে, মেছুয়াবাজার ও আমহার্স্ট স্ট্রীটের

চৌমাথাকে কেন্দ্র করিয়া শহরের ঐ প্রান্তটাতেই ইহা। ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কেল্লা হইতে মিলিটারি আসিয়া মেশিনগান ইত্যাদির সাহায্যে মোড়ে মোড়ে পাহারা দিতেছে বটে, কিন্তু খুন-জখম তাহাতে কিছুমাত্র কমে নাই। কাগজে উভয় সম্প্রদায়ের হতাহত ব্যক্তির দীর্ঘ তালিকা বাহির হইয়াছে।

বিমলা গলা বাড়াইয়া কাগজখানা দেখিতেছিল, সে শিহরিয়া উঠিয়া বলিল, ঠাকুরপো, এ জিনিস তো বাঙলা দেশে কখনও ছিল না।

কিশোর মাথা নাড়িয়া বলিল, ইংরেজ বাহাদুর স্বায়ত্ত শাসনের যে প্রথম কিস্তি আমাদের দিয়েছেন, এটা তারই অনিবার্য ফল।

বাড়ি পৌঁছিয়া তাহারা দেখিল, পাড়াটা একেবারে নিস্তব্ধ। বেলা প্রায় আটটা বাজে, কিন্তু এখনও রাস্তায় জনমানব নাই। কিশোরের বাসার সম্মুখে কিছুদূরে একটা চায়ের দোকান ছিল—প্রত্যহ সন্ধ্যায় সকালে সেখানে বহুলোকের সমাগম হইত—সেটার দরজায় তালা লাগানো। আশেপাশের বাড়িগুলা যতদূর দেখা গেল, সব দরজা জানালা বন্ধ। একটা আশঙ্কাপূর্ণ থমথমে ভাব যেন চতুর্দিকে। আচ্ছন্ন করিয়া আছে।

ক্রমে বেলা যতই বাড়িতে লাগিল, নিকটে দূরে চারিদিক হইতে একটা সোরগোল ততই স্পষ্টতর হইয়া উঠিতে লাগিল। মাঝে মাঝে এক এক দল উন্মত্তপ্রায় লোক চিৎকার করিতে করিতে লাঠি ও অন্যান্য অস্ত্র লইয়া রাস্তার একদিক হইতে অন্যদিকে ছুটিয়া গিয়া—বোধ করি গোরার তাড়া খাইয়া যে পথে আসিয়াছিল সেই পথে আবার ফিরিয়া

পলাইতেছে। অনতিদূরে ফুটপাথের উপর একটা স্থানে খানিকটা রক্ত জমিয়া শুকাইয়া ছিল; বোধ হয় আগের দিন কোন হতভাগ্য ছুরির আঘাতে। ঐখানে পড়িয়া প্রাণ হারাইয়াছে। জনহীন পথের উপর ঐ দাগটি যেন ধরিত্রীর বুকের উপর একটা দগদগে ক্ষতের মত দেখাইতেছে। কিশোর দোতলার জানালায় স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে। চাহিয়া রহিল।

বিমলা এক হাতে একখানা আসন ও অন্য হাতে রেকাবিতে করিয়া খানিকটা গরম হালুয়া আনিয়া কিশোরের সম্মুখে রাখিয়া বলিল, তোমাকে আজ যে কী খেতে দেব তা জানি না। ঝিও আসেনি।

কিশোর জিজ্ঞাসা করিল, ঘরে কি কিছু নেই?

শধু চাল আর ডাল।

ওতেই হবে।–যে রকম কাণ্ড দেখছি, বাজার-হাট কিছুই বসবে না। তা ছাড়া বাড়ি থেকে বার হওয়াও তো অসম্ভব।

না, না, বাড়ি থেকে বার হবে আবার কী। কোন রকমে প্রাণে প্রাণে এসে পৌঁছতে পেরেছি, এই ঢের। খাও—জল আনি।

কিশোর খাইতে বসিল। জলের গেলাস আনিয়া তাহার সম্মুখে রাখিয়া বিমলাও মাটিতে বসিল। আস্তে আস্তে বলিল, ওঁরাও এসেছেন।

কারা?–কিশোর চমকিয়া মুখ তুলিল।

বিমলা আঙুল দিয়া পাশের বাড়ির দিকে দেখাইয়া বলিল, ওপরের ঘরের জানালা একটা ভোলা ছিল, তাই জানতে পারলুম। কিন্তু সাড়াশব্দ কিছু পেলুম না।

কিশোর কোন কথা বলিল না, মুখ খুঁজিয়া আহার করিতে লাগিল। বিমলা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কতকটা নিজমনেই বলিল, কেমন আছে সব কে জানে।

দ্বিপ্রহর নামমাত্র আহার করিয়া কিশোর নিজের ল্যাবরেটরি ঘরটার ধুলা ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতেছিল; কিন্তু কাজে তাহার মন বসিতেছিল না, পাশের বাড়িতে উহারা ফিরিয়া আসিয়াছে এই কথাটাই বার বার মনে পড়িয়া তাহাকে উন্মনা করিয়া দিতেছিল। এমন সময় বিমলা প্রবেশ করিয়া বলিল, ঠাকুরপো, বিনয়বাবুর বোধ হয় খুব অসুখ।

কিশোর একবার চকিতের জন্য মুখ ফিরাইয়া আবার ঝাড়ন দিয়া একটি কাচের যন্ত্র ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিল, কী করে জানলে?

নীচের ঘরে সুহাস দারোয়ানটাকে ওষুধ আনতে দিচ্ছিল—শুনতে পেলুম। কিন্তু দারোয়ানটা কিছুতেই যেতে চাচ্ছে না। সব কথা তো ভাল শোনা গেল না, শুধু সুহাস

মিনতি করে বলছিল–একবারটি যাও, তোমায় দশ টাকা বকশিশ দেব, ওষুধ না এলে বাবুকে বাঁচানো যাবে না। দারোয়ানটা কেবলই নেহি মাইজী নেহি মাইজী বলছিল–

বাড়িতে কি আর কেউ নেই?

কী জানি, আর তো কারুর গলা পেলুম না।

কিছুক্ষণ কিশোর স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর হঠাৎ হাতের ঝাড়নটা ফেলিয়া দিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। উৎকণ্ঠিত বিমলা বলিল, ও কি, কোথায় চললে, ঠাকুরপো?

দেখি যদি কিছু করতে পারি— বলিয়া কিশোর নামিয়া গেল।

সদর-দরজা খুলিয়া বাহির হইতে যাইবে, এমন সময় বিমলা পশ্চাৎ হইতে বলিল, একটু দাঁড়াও ঠাকুরপো, আমিও যাচ্ছি।

সে সময় রাস্তা খালি ছিল, দুজনে বিনয়বাবুর বাড়ির সম্মুখে গিয়া কড়া নাড়িতেই দরজা খুলিয়া গেল। দারোয়ানটার পাশ কাটাইয়া বিমলা আগে প্রবেশ করিল, কিশোর তাহার পশ্চাতে ঢুকিল।

সুহাসিনী কালিমালিপ্ত মুখে নির্জীবের মত ঘরের মধ্যে একাকিনী দাঁড়াইয়া কী ভাবিতেছিল, দুজনকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া যেন ভূত দেখার মত চমকিয়া উঠিল। বিমলা দ্রুতপদে তাহার দিকেই গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কী হয়েছে, সুহাস? বাবার অসুখ করেছে?

বুদ্ধিভ্রষ্টের মত সুহাস নিঃশব্দে ঘাড় নাড়িল।

বিমলা বলিল, কোথায় আছেন তিনি?—ওপরে?

সুহাস হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া নিকটের চেয়ারটার উপর বসিয়া পড়িল। বিমলা তাহার পাশে বসিয়া সান্ত্বনা দিয়া বলিল, কেঁদো না। কী হয়েছে আগে আমাদের ভাল করে বলো।

সুহাস চক্ষু মার্জনা করিয়া ভগ্নকণ্ঠে বলিল, কাল থেকে বাবার হাঁপানির ব্যথা উঠেছে, কিছুতেই কমছে না। ডাক্তারের কাছে খবর পাঠাতে পারছি না। আমি একলা, বাড়িতে দুটো চাকর ছাড়া আর কেউ নেই। যে ওষুধটা খেলে বাবার হাঁপানির ব্যথা কমে, সেটাও কাল রাত্তিরে ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু কেউ ডাক্তারখানা থেকে ওষুধ আনতে রাজী হচ্ছে না— সুহসিনী আঁচলে চোখ মুছিল।

কিশোর দরজার কাছেই দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল, নিমেষের জন্য বিমলার সহিত তাহার দৃষ্টি বিনিময় হইল। বিমলা তাড়াতাড়ি সুহাসের দিকে ফিরিয়া বলিল, কিন্তু ওষুধ না আনলেই

যখন নয়, তখন দারোয়ান যাবে না কেন? মরণবাঁচনের কথা—আর ডাক্তারখানাও তত বেশী দূর নয়

সুহাসিনী মাথা নাড়িয়া বলিল, ওরা যেতে চাচ্ছে না বলছে বাড়ি থেকে বেরুলেই ওদের ছুরি মারবে।

বিমলা আর কিছু বলিতে পারিল না; নিজে প্রাণ দিয়া পরের প্রাণ বাঁচাইতে যদি কেহ রাজী না হয়, তাহাকে কী বলা যাইতে পারে!

কিশোর এতক্ষণে কথা কহিল, বলিল, ওষুধের নামটা কী?

সুহাসিনী অদূরে টী-পাইয়ের ওপর একটা খালি শিশি দেখাইয়া বিড়বিড় স্বরে কহিল, ওর গায়ে লেখা আছে, পেটেন্ট ওষুধ।

কিশোর শিশিটা তুলিয়া লইয়া বিমলাকে বলিল, বৌদি, তুমি বোসো আমি এখনই আসছি।

বিবর্ণ মুখে বিমলা বলিয়া উঠিল, তুমি কোথায় যাচ্ছ, ঠাকুরপো—

এখনই ফিরব। কাছেই ডিপেন্সারি—কোন ভয় নেই। বলিয়া কিশোর নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

দুজনে চিত্রার্পিতের মত কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। তারপর সুহাসিনী জলে মজ্জমান ব্যক্তির মত সজোরে বিমলার একটা হাত চাপিয়া ধরিল। এইভাবে প্রায় রুদ্ধ নিশ্বাসে তাহারা ঘরের মধ্যে বসিয়া রহিল।

বাহির হইতে কখনও অখণ্ড নিস্তব্ধতা, কখনও বা বহুকণ্ঠের দূরাগত চিৎকার আসিতে লাগিল। অসীম উৎকণ্ঠার মধ্যে পনেরো মিনিট কাটিয়া গেল।

একবার সুহাসিনী কম্পিত অধরে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার ভয় করছে না?

বিমলা দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া বলিল, আমার ভয় করছে বৈকি, সুহাস। গেলে যে আমারই যাবে, আর তো কারুর যাবে না।

তাহার কণ্ঠস্বর অতিশয় কঠিন শুনাইল। সুহাসিনী নতমুখে বসিয়া রহিল, আর কোন কথা বলিল না।

হঠাৎ বাহিরের দরজার উপর একটা গুরুভার পতনের শব্দে চমকিয়া দুজনে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল; তারপর বিমলা ছুটিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া ধরিল, সুহাসিনীও তাহার পশ্চাতে গিয়া দাঁড়াইল।

বদ্ধ দরজায় ঠেস দিয়া কিশোর বসিয়া ছিল, দরজা খুলিতেই ঢলিয়া চৌকাঠের উপর পড়িয়া গেল। জামার বুকে রক্ত, মুখে রক্ত, মাথার চুলে রক্ত মাখামাখি কিশোরকে চক্ষু

বুজিয়া পড়িয়া যাইতে দেখিয়া বিমলা কাঁদিয়া উঠিল, আমার এই সর্বনাশ করতেই কি তুমি বেরিয়েছিলে, ঠাকুরপো?

বিমলার কণ্ঠস্বরে কিশোর চোখ মেলিয়া চাহিল, কিছুক্ষণ শুন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া, ওষুধ এনেছি বলিয়া শিশিসুদ্ধ একটা কম্পমান হাত তুলিয়া ধরিল।

দুটি নারী তখন বহুকষ্টে বুকভাঙা শক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহার অবসন্ন দেহটা টানিয়া আনিয়া একটা চেয়ারে বসাইয়া দিল। জামা খুলিয়া, মাথা-মুখ ধুইয়া দিবার পর দেখা গেল, মাথায় চোট লাগিয়াছে, ঠিক মূর্ধার উপর প্রায় তিন ইঞ্চি স্থান কাটিয়া হাড় পর্যন্ত দেখা যাইতেছে। হাড়টা ভাঙিয়াছে কিনা বুঝা গেল না, কিন্তু রক্তস্রাব তখনও বন্ধ হয় নাই। বিমলা আঁচল ছিড়িয়া ক্ষতস্থানটা বাঁধিয়া দিবার পর কিশোরের আচ্ছন্ন ভাব একটু কমিয়াছিল, সে সোজা হইয়া বসিবার চেষ্টা করিয়া অস্পষ্টস্বরে বলিল, পেছন থেকে মাথায় লাঠি মারলে যাবার সময় কিছু হয়নি, কিন্তু ফিরে আসবার সময়–ডিসপেন্সারি থেকে বেরুতেই–মারলে। হঠাৎ—পড়ে গেলুম—তারপর এই পথটা ছুটে আসতে হাঁপিয়ে পড়লুম, নইলে লাগেনি বোধ হয় বেশী–

ঘরের এককোণে দেয়ালে কপাল ঠেকাইয়া সুহাসিনী কাঠের মত শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহার দেহটা বারবার শিহরিয়া উঠিল। বিমলা চোখ মুছিতে মুছিতে কেবল ভগবানকে মনে মনে ডাকিতে লাগিল,–ঠাকুর, বুক চিরে রক্ত দেব, ভাল করে দাও।

কিশোর ক্লান্তভাবে ঘাড়টা নত করিয়া বলিল, মনে হচ্ছে একটু শুতে পেলে ভাল হত—

সুহাসিনী চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল। একবার বুঝি একটু ইতস্তত করিল, তারপর বিমলাকে বলিল, আপনি ওঁকে নিয়ে ওপরে আসুন—দারোয়ান আর বদরী সাহায্য করবে। আমি বিছানা ঠিক করে রাখছি।

সুহাসিনীর ঘরে বিছানার উপর শোয়াইয়া দিতেই একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া কিশোর বলিল, আঃ, এখন বেশ স্বস্তি পাচ্ছি। শিয়রের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই দেখিল, খাটের বাজু দুহাতে শক্ত করিয়া ধরিয়া সুহাসিনী দাঁড়াইয়া আছে। কিশোর ম্লান হাসিয়া বলিল, আপনাদের কষ্ট আর অসুবিধাই ঘটালুম।

সুহাসিনীর নিমীলিত চক্ষু দিয়া ধারার ন্যায় অশ্রু নামিয়া বুকের কাপড় ভিজাইয়া দিতে লাগিল, কিন্তু কিশোর তাহা দেখিতে পাইল না।

বৌদি।

ভাই! নিজের আঁচল দিয়া কিশোরের কপাল ও ঘাড় হইতে রক্তের দাগ মুছিয়া লইয়া তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া বিমলা বলিল, কী বলছ, ঠাকুরপো?

মাথার হাড়টা বোধ হয় ফ্রাকচার হয়নি।

ঠাকুর করুন, তাই যেন হয়।

বিনয়বাবুকে ওষুধ দেওয়া হয়েছে? কেমন আছেন তিনি?

ভাল আছেন—এখন ঘুমুচ্ছেন।

আমারও যেন ঘুম পাচ্ছে—

বিমলার বুকের ভিতরটা আবার ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। আর একদিন স্বামীর মাথা কোলে লইয়া সে এমনই ভাবে মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। সেদিন তিনিও এমনি ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। ভগবান! সেই পরীক্ষা কি আবার নূতন করিয়া পাঠাইয়া দিলে?

ব্যাকুলভাবে সুহাসের দিকে চাহিয়া সে বলিল, একটা ডাক্তার—একটা ডাক্তারও কি পাওয়া যায় না, সুহাস?

কিশোর বলিল, ডাক্তারের দরকার নেই, বৌদি। বেশী রক্ত বার হয়েছে বলে একটু অবসন্ন বোধ হচ্ছে, ঘুমুলেই সেটা কেটে যাবে। ডাক্তারের চেয়ে তোমার পায়ের ধুলো একটু মাথায় দাও—ঢের বেশী কাজ হবে–

নিমীলিত নেত্রে কিশোর একটু হাসিল।

সত্যি বলছ ঠাকুরপো, কোন ভয় নেই? পোড়া মেয়েমানুষ—কিছুই যে বুঝতে পারি না, ভাই! কিন্তু তুমি ঠিক বুঝতে পারছ, কোন ভয় নেই?

বুঝতে পারছি—কোন ভয় নেই।

অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া বিমলা তাহার কপালে বুকে হাত বুলাইয়া দিয়া বলিল, আচ্ছা, তবে ঘুমোও। আমরা কাছেই রইলুম।

তোমরা বরং বিনয়বাবুর কাছে যাও—

কিছুক্ষণ পরে কিশোরের নিশ্বাসের শব্দে বিমলা বুঝিল সে ঘুমাইয়াছে, তখন তাহার বুক পর্যন্ত ঢাকা দিয়া আস্তে আস্তে ঘরের বাহিরে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল।

শীতের বেলা তখন পড়িয়া আসিতেছে। অস্তমান সুর্যের দিকে তাকাইয়া জোড় করে বিমলা বোধ করি প্রাণের অব্যক্ত আকাঙক্ষাই দিনদেবকে নিবেদন করিতেছিল, হঠাৎ মুখ নামাইয়া দেখিল, সুহাসিনী একেবারে তাহার পায়ের কাছে আসিয়া বসিয়া পর্ড়িয়াছে।

সুহাস!

বৌদি! বলিয়া সুহাসিনী তাহার পায়ের উপর মাথা রাখিয়া ফুপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ছি ছি সুহাস, ওঠো।

অবরুদ্ধ অশ্রুবিকৃত স্বরে সুহাস বলিল, বৌদি, আমাকে কি তোমরা ক্ষমা করতে পারবে? আমার পাপেই আজ–আর বলিতে পারিল না, তাহার দেহ অদমনীয় বাষ্পোচ্ছ্বাসে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল।

বিমলা জোর করিয়া তাহাকে তুলিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, সুহাস, দোষ তুমি ওঁর কাছে। অনেক করেছ, তাই বুঝি ভগবান আজ এই শাস্তি পাঠিয়ে দিয়েছেন। দুঃখ তুমি কম পাওনি জানি, কিন্তু ভগবানের চোখে হয়তো এখনও তোমার প্রায়শ্চিত্ত শেষ হয়নি। শুধু তোমার নয়, আমাদের সকলেরই আজ পরীক্ষার দিন। ক্ষমা তোমাকে করব কী সুহাস, শুধু প্রার্থনা করি তোমার ভালবাসার জোরে ওঁকে যেন যমের মুখ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারি।

সুহাসের হাত ধরিয়া ঘরের দ্বারের কাছে আসিয়া বলিল, যাও, লজ্জা কোরো না, ওঁর কাছে গিয়ে বোসোগে, ঐখানেই তোমার স্থান। আমি তোমার বাবার কাছে গিয়ে বসছি। বলিয়া তাহাকে আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে ঠেলিয়া দিল।

এক ঘণ্টা পরে বিমলা বিনয়বাবুর ঘর হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, কিশোর তখনও তেমনিই পড়িয়া ঘুমাইতেছে এবং সুহাস খাটের পাশে হাঁটু গাড়িয়া কিশোরের একটা হাতের মধ্যে নিজের মুখখানা চাপিয়া চুপটি করিয়া বসিয়া আছে।

নিঃশব্দে পা টিপিয়া টিপিয়া বিমলা ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

.

পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

বিনয়বাবু মারা গিয়াছেন। সে ধাক্কা সামলাইয়া গেলেও তাঁহার শরীর ভিতরে ভিতরে একেবারে জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল; সুহাসিনীর বিবাহের মাস কয়েক পরে তিনি কয়েক দিন মাত্র অসুখে ভুগিয়া হঠাৎ পরলোকযাত্রা করিলেন। ইদানীং তাঁহার প্রাণে শান্তি ফিরিয়া আসিয়াছিল, বাঁচিয়া থাকিয়া জীবন উপভোগ করিবার ইচ্ছাও জাগিয়াছিল। কিন্তু যাঁহার অমোঘ আদেশের উপর আপীল চলে না, তিনি একদিন কাহাকেও কোন কৈফিয়ত না দিয়া বিনয়বাবুকে নিজের কাছে টানিয়া লইলেন। কন্যা, জামাতা, বন্ধুবান্ধবের অসীম স্নেহ ও শুশ্রুষা তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। প্রাণোপম সুহৃদের বিয়োগে দীনবন্ধুবাবু বড়ই বেদনা পাইলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে কিশোর বিমলার টাকায় কাশীপুরের দিকে নুতন বাড়ি কিনিয়া সপরিবারে সেখানে উঠিয়া গেল। অধ্যাপকের চাকরি সে পূর্বেই ছাড়িয়া দিয়াছিল, সেই অবধি বাড়িতে মস্ত বড় ল্যাবরেটরি স্থাপন করিয়া বৈজ্ঞানিক গবেষণায় কাল কাটাইতেছে।

রাত্রি সাড়ে দশটা বাজিয়া গিয়াছিল। মাথার উপর দুটা বড় বড় বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালিয়া কিশোর ল্যাবরেটরিতে বসিয়া একমনে কাজ করিতেছিল। সুহাসিনী ঘরময় ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। এবং এটা-ওটা নাড়াচাড়া করিতেছিল। একবার কয়েকটা কাচের ছিপিযুক্ত শিশি হইতে খানিকটা তরল পদার্থ একটা টেস্ট-টিউবে ঢালিল, তারপর কী ভাবিয়া সেটা রাখিয়া দিল। বুনসেন বানার জ্বালিয়া সেটা খুব কমাইয়া দিয়া আবার ঘরময় বেড়াইতে লাগিল। কিশোরের দিকে তাকাইয়া দেখিল সে গভীর মনঃসংযোগে কী লিখিতেছে।

তখন চুড়িগুলার শব্দ করিয়া, আঁচলে বাঁধা চাবির গোছাটা ঝনাৎ করিয়া টানিয়া আবার সশব্দে পিঠে ঠেলিয়া সে বলিল, আজ করবীর একখানা চিঠি এসেছে।

কিশোর চিন্তা-নিমগ্ন চক্ষু একবার তুলিয়া আবার লেখার উপর নিবদ্ধ করিল। সম্ভবত কথার অর্থ তাহার মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌছিল না। করবীর নামোল্লেখেও তাহার মনের চটকা ভাঙিল না।

সুহাস বলিল, করবী লিখেছে যে, সে বরের সঙ্গে বিলেত চলল—এখন কিছু কাল সেখানেই থাকবে।

এবার অন্যমনস্ক কিশোর চক্ষু তুলিয়া বলিল, ও!

সুহাস জোরে হাসিয়া উঠিল, বলিল, আমার একটা কথাও তোমার কানে যায়নি। কী বললুম বলো তো?

তখন সচেতন হইয়া কিশোরও হাসিয়া বলিল, সত্যিই শুনতে পাইনি। কী বলছিলে?

কিছু না। একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া সে আবার ঘরময় পায়চারি করিতে লাগিল।

আজ বহুদিন পরে করবীর পত্র পাইয়া তাহার মনটা অকারণে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, এখন আবার তেমনিই অকারণে তাহা শান্ত হইয়া গেল।

বুনসেন বার্নার উস্কাইয়া দিয়া সে টেস্টটিউবের তরল পদার্থটা গরম করিতে লাগিল, সেটা ফুটিয়া উঠিতেই আলোর সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, ওগো দেখ, কী সুন্দর রঙ!

কিশোর কাজ ফেলিয়া তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, হাসিয়া বলিল, এই হচ্ছে বুঝি! নিজেও কাজ করবে না, আমাকেও করতে দেবে না?

সুহাস বলিল, যথেষ্ট কাজ হয়েছে মশায়, রাত এগারোটা বাজে, এবার শুতে চলুন।

কিশোর জিজ্ঞাসা করিল, আমার অন্য অ্যাসিস্টান্টটি কোথায়?

দিদির আজ একাদশী, তিনি শুয়ে পড়েছেন। সত্যি চল, অনেক রাত হয়ে গেল—

কিন্তু–তুমি বরঞ্চ এগোও,আমি এই কাজটা সেরে নিয়েই—

সেটি হচ্ছে না মশায়। তোমাকে ছেড়ে দিলে তুমি সমস্ত রাতই কাজ করে কাটিয়ে দেবে–বলিয়া সুহাস তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল।

ঘরের আলো নিভাইয়া দুজনে উপরে উঠিয়া গেল। শয়নঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, নাইটল্যাম্প জ্বলিতেছে, কিন্তু খোক বিছানায় নাই।

দুজনের একবার চোখাচোখি হইল, তারপর আবার তাহারা ঘর হইতে বাহির হইল। তেতলায় একটিমাত্র ঘর—সেটিতে বিমলা শয়ন করে। পা টিপিয়া টিপিয়া তাহারা উপরে গিয়া ভেজানো দরজায় কান পাতিয়া শুনিল, অস্পষ্ট কথার গুঞ্জন আসিতেছে। তখন দ্বার ঠেলিয়া দুজনে ঘরে প্রবেশ করিল।

ঘরে কেবল পিলসুজের উপর তেলের প্রদীপ জ্বলিতেছে। তক্তপোশের উপর বিছানা পাতা, তাহাতে দুইটি মাথা অত্যন্ত কাছাকাছি দেখা যাইতেছে।

সুহাস বলিল, বিদ্যুৎ! তোমার চোখে কি ঘুম নেই?

বিদ্যুৎ চকিতে বড়মার গলা জড়াইয়া ধরিল, বলিল, ঐ সুহাস এল, বড়মা। এখুনি আমাকে নিয়ে যাবে।

বিমলা বলিল, সুহাস, ও আজ আমার কাছে শোবে।

সুহাস বলিল, শুলে তো কোন কথা ছিল না দিদি, কিন্তু বকিয়ে বকিয়ে যে তোমায় পাগল করে দিলে! নে বিদ্যুৎ, ওঠ–কাল আবার গল্প শুনিস।

বিদ্যুৎ কাঁদো কাঁদো হইয়া বলিল, বড়মা—

বিমলা বিদ্যুৎকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, না, আজ ও আমার কাছে থাক। তুই যা সুহাস, গল্প শেষ না হলে ছেলে ঘুমুবে না।

না, আজ একাদশী—কিছুতেই আমি তোমাকে বকতে দেব না। আর এগারোটা বাজতে চলল, ঘুমও কি ওর চোখে আসে না? বিদ্যুৎ, আয় শিগগির।

বিদ্যুৎ আরও জোরে বড়মার গলা জড়াইয়া ধরিল। বিমলা বলিল, বড় জ্বালাতন করিস তুই সুহাস, গল্প শেষ হলে যাবে কি করে শুনি? তোরা শুগে যা না বাপু!

তক্তপোশের পাশে বসিয়া কিশোর জিজ্ঞাসা করিল, কোন গল্প হচ্ছে? সেই যেটাতে খোকাবাবু কালো ঘোড়ায় চড়ে বাঘ শিকার করতে যাবেন—সেইটে?

বিমলার বুকের ভিতর হইতে মাথা তুলিয়া বিদ্যুৎ বলিল, না, সেটা নয়, তোমার বিয়ের গল্প।

কিশোর আঁতকাইয়া উঠিল, অ্যাঁ—সে আবার কী! সুহাসও তক্তপোশের অন্যদিকে বসিয়া সকৌতুকে বলিল, তবে আমিও একটু শুনি।

আর ভয় নাই দেখিয়া বিদ্যুৎ সোৎসাহে বিছানায় উঠিয়া বসিয়া বলিল, আচ্ছা বড়মা, এই বাড়িটা তুমি আমাকে দিয়ে দিয়েছ, না?

বিমলা বলিল, হ্যাঁ—তারপর শোন্—

আর বাবার ঘরে যে ঘড়িটা আছে-টিং—টিং-করে বাজে—সেটাও আমার-না?

হ্যাঁ—সেটাও তোর।

আর সুহাসের ঘরে যে গ্রামোফোন—সেটাও আমার?

সেটাও তোর—সব তোর।

বিদ্যুৎ নিশ্চিন্ত হইয়া শুইয়া বলিল, এবার বলো।

বিমলা তাহার ক্ষুদ্র দেহটি কাছে টানিয়া লইয়া আরম্ভ করিল, তারপর বুঝেছিস বিদ্যুৎ, আমিআর সুহাস তোর বাবাকে ধরাধরি করে নিয়ে এসে চেয়ারে বসিয়ে দিলুম। তোর বাবার গায়ে রক্ত, মাথায় রক্ত,—তাই দেখে তোর মা কাঁদতে লাগল, আমিও খুব কাঁদতে লাগলুম। তারপর তোর মার বিছানায় নিয়ে গিয়ে তোর বাবাকে শুইয়ে দিতেই তোর বাবা ঘুমিয়ে পড়ল। সমস্ত রাত সে ঘুম ভাঙল না, আর তোর মা সমস্ত রাত একলাটি জেগে বসে রইল—

লুকাইয়া চোখের জল মুছিয়া সুহাস আস্তে আস্তে উঠিয়া গিয়া সিঁড়ির মাথার কাছে দাঁড়াইল। খানিকক্ষণ পরে কিশোর তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইতেই সে সজলনয়নে একবার স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া নিজের মাথাটা তাহার বুকের উপর রাখিল, একটা উচ্ছ্বসিত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, উঃ, কী দিনই গিয়েছে—ভাবলে যেন জ্ঞান থাকে না।

কিশোর দুই বাহু দিয়া সজোরে তাহাকে একবার বুকে চাপিয়া ধরিল। তারপর দুইজনে হাত ধরাধরি করিয়া নীরবে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল।